

ISSN :: 2454-1508  Prefix: 10.69655

IIFS Impact Factor: 4.5 IJIN Impact Factor: 8.5

আত্মদীপ

আন্তর্জাতিক দ্বিমাসিক গবেষণামূলক পত্রিকা

পর্ব-২, বিশেষ সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ২০২৬



UTTARSURI
অসমীয়া সাহিত্যিক, অসমীয়া সাহিত্য



On 8 and 9 April 2025, a Two-day International Seminar titled "Horizons of Literary Creation: Dialogues on Theory and Practice" was organized by the Departments of English and Bengali of Samsi College, Malda, West Bengal in collaboration with Uttarsuri, Assam. The articles published in this special issue are selected papers that were presented at the seminar.



মুখ্য সম্পাদক
ড. বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য

সম্পাদক
ড. সেথ মোফাজ্জাল হোসেন

সহ-সম্পাদক
আজিজুল সেথ



আত্মদীপ

আন্তর্জাতিক পীয়ার-রিভিউড দ্বিমাসিক গবেষণামূলক পত্রিকা

পর্ব-২, বিশেষ সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি, ২০২৬

মুখ্য সম্পাদক
ড. বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য

সম্পাদক
ড. সেথ মোফাজ্জাল হোসেন

সহ-সম্পাদক
আজিজুল সেথ



প্রকাশক:
উত্তরসুরি, শ্রীভূমি, অসম

ATMADEEP

An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal

ISSN: 2454-1508

Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)

Volume-II, Special Issue, February, 2026

Published by:

Dr. Bishwajit Bhattacharjee

Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711

Website: <https://www.atmadeep.in/>

Article Submission Link: <https://www.uttarsuri.com/uttarsuri>

Email: editor@atmadeep.in

Editor-in-Chief

Dr. Bishwajit Bhattacharjee

Editor

Dr. Sk Mofazzal Hossain

Associate Editor

Azizul Sekh

Type Setting:

Amrika Das Purkayastha, Soumili Dhar

Printed at:

Scholar Publications

Sribhumi, Assam, India, 788710

Cover Page: Bishwajit Bhattacharjee

Price: Rs. 700.00

© Uttarsuri

The views and contents of this Journal are solely of the authors. This Journal is being sold on the condition and understanding that its contents are merely for information and reference and that neither the author nor the publishers, Printers or Sellers of this Journal are engaged in rendering legal, accounting or other professional service.

Atmadeep, is a Bi-monthly electronic & Print journal of open Access Category. The Readers do not need to pay/register themselves to read and download the articles in the journal. However, it is only for scholarly/academic purpose that is non-commercial. Users while using excerpts from Atmadeep, must cite the author, content and the journal by including the link of the content. Individuals/ Companies/ Organizations intending to use contents from Atmadeep, for commercial purpose must contact the Editor-in-Chief.



‘সাহিত্য সৃষ্টির নানা দিগন্ত: তত্ত্ব ও প্রয়োগের নিরিখে’
এই বিষয়ে ২০২৫ সালের ৮ ও ৯ এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গের
মালদাহস্থিত সামসি কলেজের ইংরেজি ও বাংলা বিভাগ
এবং অসমের উত্তরসূরি এর যৌথ উদ্যোগে একটি দ্বি-
দিবসীয় আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

এই বিশেষ সংখ্যায় যে লেখাগুলো প্রকাশিত হয়েছে তা
আলোচনাচক্রে উপস্থাপিত বাছাইকৃত লেখা।



SAMSI COLLEGE

ESTD - 1968

NAAC Accredited with "B" Grade (2nd Cycle)

Affiliated to the University of Gour Banga

P.O.: KANDARAN

DISTRICT : MALDA

WEST BENGAL

PIN : 732139

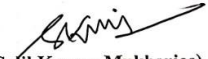
শুভেচ্ছা বার্তা



সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রসারে প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণের জন্য নিবন্ধিত সংস্থা উত্তরসূরি, শ্রীভূমি, আসাম-এর একটি বিশিষ্ট শাখা উত্তরসূরি পাবলিকেশন-কে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। মানব প্রগতির ভিত্তি যে সাহিত্য ও সংস্কৃতির নিরন্তর চর্চার মধ্যেই নিহিত—এই বিশ্বাসটি এমন নিবেদিত ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রচেষ্টার মাধ্যমে সার্থকভাবে প্রতিফলিত হয়।

ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোগ মন্ত্রকের অধীনে নিবন্ধিত (UDYAM-AS-18-0012611) উত্তরসূরি পাবলিকেশন প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই সাহিত্য ও সংস্কৃতিবিষয়ক জ্ঞানচর্চা, গবেষণা এবং প্রসারের ক্ষেত্রে যে আন্তরিক প্রতিশ্রুতি ও নিষ্ঠা প্রদর্শন করে আসছে, তার জন্য তারা নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য। বিশেষত ৮ ও ৯ এপ্রিল, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত দুই দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক সেমিনার “সাহিত্য সৃষ্টির নানা দিগন্ত: তত্ত্ব ও প্রয়োগের নিরিখে”—এ উপস্থাপিত গবেষণা প্রবন্ধসমূহ গ্রন্থাকারে প্রকাশের উদ্যোগ একান্তই প্রশংসনীয়। উক্ত সেমিনারটি সামসি কলেজের বাংলা ও ইংরেজি বিভাগ এবং উত্তরসূরি, আসাম-এর যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই প্রকাশনা শুধু মূল্যবান একাডেমিক গবেষণার সংরক্ষণই নিশ্চিত করবে না, বরং গবেষক, পণ্ডিত ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে এর বিস্তৃত প্রচার ও প্রাসঙ্গিকতাও বৃদ্ধি করবে।

সামসি কলেজের পক্ষ থেকে, এবং একই সঙ্গে সামসি কলেজ পরিবার ও গভর্নিং বডির পক্ষ থেকেও, এই মহৎ একাডেমিক উদ্যোগের জন্য উত্তরসূরি পাবলিকেশন-কে আমি আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, এ ধরনের সহযোগিতামূলক উদ্যোগ আন্তঃবিভাগীয় সংলাপকে সুদৃঢ় করবে, গবেষণামুখী একাডেমিক পরিবেশ গঠনে সহায়ক হবে এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতি অধ্যয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। উত্তরসূরি পাবলিকেশনের ভবিষ্যৎ সকল উদ্যোগে সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করছি এবং আগামী দিনগুলোতে আরও নিবিড় ও ফলপ্রসূ একাডেমিক সহযোগিতার প্রত্যাশায় রইলাম।


(Dr. Safil Kumar Mukherjee)
Principal
Samsi College, Samsi, Malda
Principal
SAMSI COLLEGE
P.O-Samsi, Dist-Malda

Editorial Board

Advisor



Dr. Tapadhir Bhattacharjee

Former Vice-Chancellor, Assam University, Silchar, Assam
President, Uttarsuri, Sribhumi, Assam
Mo: +919435566494



Dr. Nirmal Kumar Sarkar

Former Associate Professor, Karimganj College, Sribhumi, Assam
Vice-President, Uttarsuri, Sribhumi, Assam
Mo: +919435375599

Editor-in-Chief



Dr. Bishwajit Bhattacharjee

Associate Professor, Karimganj College
Sribhumi, Assam, 788710
Mo: +919435750458, +917002548380
Email: bishwajit@karimganjcollege.ac.in

Editor



Dr. Sk Mofazzal Hossain

Assistant Professor
Samsi College, Malda, West Bengal, India
Mo: +919614221481

Associate Editor



Azizul Sekh

Research Scholar, Dept. of Bengali, Tripura University, Tripura
Mo: +919126261414
Email: azizul.bengali@tripurauniv.ac.in

Editorial Board Member:



Dr. Debasish Bhattacharjee

Professor & Head, Dept. of Bengali
Assam University, Silchar
Email: debashish.bhattacharya@aus.ac.in



Dr. Rupasree Debnath

Assistant Professor, Department of Bengali
Gauhati University, Assam, India
Email: rupasree@gauhati.ac.in

**Dr. Malay Deb**

Assistant Professor, Dept. of Bengali
Tripura University, Tripura, India
Email: malaydeb@tripurauniv.ac.in

**Dr. Madhumita Sengupta**

Asst. Professor, Dept. of Bengali
Arya Vidyapeeth College, Guwahati, Assam, India
Email: madhumita.sengupta@avcollege.ac.in

**Dr. Debjani Bhowmick (Chakraborty)**

Associate Professor, Dept. of Bengali,
Sripat Singh College, Murshidabad, West Bengal, India
Email: dbhowmick@sripatsinghcollege.edu.in

**Romana Papri**

Lecturer, Department of Pali and Buddhist Studies
University of Dhaka, Bangladesh
Email: romanapapri@du.ac.bd

**Dr. Rajarshi Chakrabarty**

Assistant Professor, Dept. of History
University of Burdwan, West Bengal, India
Email: rchakrabarty@hist.buruniv.ac.in

**Dr. Mumit Al Rashid**

Associate Professor and chairman
Department of Persian Language and Literature
University of Dhaka, Bangladesh
Email: mumitarashid@du.ac.bd

**Dr. Barnali Bhowmick Ghosh**

Associate Professor and HOD
Department of Bengali
Bir Bikram Memorial College, Agartala, Tripura

**Neelanjana Chowdhury**

Assistant Professor
Department of Philosophy
Samsi College, Samsi, Malda, West Bengal
Email: neelanjana Chowdhuryeditor@gmail.com

১৮তম, ১৮শিও সংখ্যা

সূচিপত্র

- ১। আখ্যান বিহীন আখ্যান-এ কার্নিভালের ব্যঙ্গাত্মক হাসি- ‘মসোলিয়ম’
ড. সেখ মোফাজ্জাল হোসেন, ১-১৩
- ২। উত্তরবঙ্গের সমাজ ও বনব্যবস্থাপনার পারস্পরিক সম্পর্ক: একটি সমীক্ষা
সলিল কুমার মুখাজ্জী, ১৪-২০
- ৩। ‘অভিজ্ঞানশকুন্তলম্’-নাটকে পরিবেশভাবনা ও কালিদাস
নীলিমা সরকার, ২১-২৬
- ৪। বঞ্চনার ভিতর থেকে: দলিত সাহিত্য, তার ঐতিহাসিক শিকড় ও দলিত ভাবনার প্রসার
জয়িতা বসাক, ২৭-৩২
- ৫। দার্শনিক মননে রবীন্দ্রনাট্য: এক প্রতিবাদী চেতনা
ড. মহ. মহিদুর রহমান, ৩৩-৩৮
- ৬। আবুল বাশারের কথাসাহিত্যে মুসলিম অন্দরমহল
ড. আঞ্জুমান লিপি, ৩৯-৪৬
- ৭। তারাগন্ধর-রামকিঙ্কর-রঘুনাথ-ঋত্বিক: আধুনিকতার উপাদান- দেশ, দেশজ উপাদান ও মানুষ
গোবর্দ্ধন অধিকারী, ৪৭-৫৩
- ৮। সুধাকর দলের সাহিত্যসাধনায় হজরত উমর ফারুকের (রাঃ) প্রাসঙ্গিকতা- ইতিহাসের আঙ্গিকে পর্যালোচনা
মৌসুমী দত্ত, ৫৪-৫৯
- ৯। রবীন্দ্রনাটকে সাধারণ জনতার বিবর্তনের রূপরেখা
ড. গৌতম চন্দ্র বাউড়, ৬০-৬৪
- ১০। হেঁড়াতার: শাস্ত্রের অন্তরালে ভিন্নভাষ্য
ড. কঙ্কণ দত্ত, ৬৫-৭০
- ১১। সূর্য-দীঘল বাড়ি একটি আখ্যানের বিনির্মাণ
রঞ্জিত সরকার, ৭১-৭৮
- ১২। শেরশাবাদিয়া সমাজে প্রচলিত কিস্পা-কাহিনী বা লোককথা: লোককিম্বদন্তির ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্য
অনুসন্ধান
মসিউর রহমান, ৭৯-৯১
- ১৩। রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন: সাহিত্যে নারীমুক্তি ভাবনা
রোকেয়া পারভীন, ৯২-১০১
- ১৪। ‘অশ্বযোনি’: নারীর জীবন সংগ্রামের উপাখ্যান
পরশুরাম রজক, ১০২-১০৯

- ১৫। অপরাধ ও অপরাধী মনস্তত্ত্ব: প্রসঙ্গ সায়ন্তনী পূতভূমির বাংলা গোয়েন্দা উপন্যাস ‘সর্বনাশিনী’
আবু আসিম, ১১০-১১৯
- ১৬। বাণী বসুর ছোটগল্প: মধ্যবিত্তের জীবন আলোচ্য
শান্তি দাস, ১২০-১২৬
- ১৭। তারাপদ রায়ের কবিতা: স্বতন্ত্র স্বর
মনোরঞ্জন উরাও, ১২৭-১৩৪
- ১৮। ‘মহানদী’: প্রবাহমান উপাখ্যান
বেবী পারভীন, ১৩৫-১৪১
- ১৯। রবীন্দ্র নৃত্যনাট্য, প্রেম বনাম ন্যায়: একটি পর্যবেক্ষণ
প্রিহিলা সুলতানা, ১৪২-১৫০
- ২০। পোস্টমাস্টার’ গল্পে উপনিবেশের রাজনীতি, গল্পবয়ান: দুটি অনুবাদ
অজয় শীলশর্মা, ১৫১-১৫৮
- ২১। লোকসংস্কৃতি এবং উপজাতি সমাজ: একটি জীবন দর্পণ
তমাল আদক, ১৫৯-১৬৪

Guidelines, Review Process & Publication Ethics, Page No: 165

Publication Charge, Page No: 167

Seminar Brochure, Page No: 168-172

Schedule of the Seminar, Page No: 173-181

ভূমিকা



‘সাহিত্য সৃষ্টির নানা দিগন্ত: তত্ত্ব ও প্রয়োগের নিরিখে’ এই বিষয়ে ২০২৫ সালের ৮ ও ৯ এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গের মালদাহিত সামসি কলেজের ইংরেজি ও বাংলা বিভাগ এর উদ্যোগে এবং অসমের উত্তরসুরি এর সহযোগিতায় একটি দ্বি-দিবসীয় আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই আলোচনাচক্রে ভারতবর্ষ এবং বাংলাদেশের অধ্যাপক এবং গবেষকরা তাদের গবেষণাপত্র উপস্থাপন করেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং অধ্যাপকবৃন্দ আলোচনাচক্রে আমন্ত্রিত বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। দুদিনের অনুষ্ঠান ছিল শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং নান্দনিকতায় পরিপূর্ণ। উত্তরসুরি নানা আলোচনাচক্রের অনুষ্ঠান এবং অনলাইনে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরের আলোচনাচক্রের আয়োজন করলেও এটি ছিল প্রথম সরাসরি কোনো আনুষ্ঠানিকভাবে আলোচনাচক্রে যোগ দেওয়া। সে ক্ষেত্রে সামসি কলেজের আতিথেয়তার ভূয়সী প্রশংসা করতে হয়। কলেজের অধ্যক্ষসহ শিক্ষকরা যেভাবে আমাদের স্টেশন থেকে ভোরবেলা আনতে গিয়েছিলেন এবং সম্মেহে আমাদের কলেজের অতিথি নিবাসে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন তা আমাদের আপ্তত করেছে এবং কৃতজ্ঞতার বন্ধনে আবদ্ধ করেছে। এই বিশেষ সংখ্যায় যে লেখাগুলো প্রকাশিত হয়েছে তা আলোচনাচক্রে উপস্থাপিত বাছাইকৃত লেখা। প্রবন্ধগুলো প্রকাশের পূর্বে যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে যাতে কোনো ধরনের ত্রুটি না থাকে। এই সংখ্যার আমন্ত্রিত সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন আমার বন্ধুবর সামসি কলেজের বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. সেখ মোফাজ্জাল হোসেন। তাকে উত্তরসুরির পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। পত্রিকায় প্রকাশের জন্য শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়েছেন সামসি কলেজের অধ্যক্ষ ড. সলিল কুমার মুখার্জী। যা এই বিশেষ সংখ্যার মর্যাদা অনেকখানি বাড়িয়ে দিয়েছে। এই সংখ্যাটি প্রকাশের পেছনে সামসি কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতিসহ যারাই নেপথ্যে কাজ করেছেন প্রত্যেকের প্রতি আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। অধ্যাপক এবং গবেষক আপনারা যারা লেখা দিয়ে এই সংখ্যাকে সমৃদ্ধ করেছেন, আমরা তা প্রকাশ করতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত। আমাদের বিশ্বাস এভাবেই আমরা সবাই সহযাত্রী হয়ে আগামীতে একটি সুন্দর শৈক্ষিক পরিবেশ গড়ে তুলতে পারব। সামসি কলেজের শিক্ষক এবং অশিক্ষক কর্মচারী এবং এই আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্রের সাথে যারাই যুক্ত ছিলেন তাদের প্রত্যেকের প্রতি আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

ড. বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য

সম্পাদক, উত্তরসুরি, শ্রীভূমি, আসাম

Published Research Journal

Atmadeep: <https://www.atmadeep.in> Novel Insight: <https://www.novelinsights.in>

✉ : uttarsuri20@gmail.com

Website : <https://www.uttarsuri.org/>

☎ : +919435750458

📺 YouTube : [://uttarsurigroup](https://uttarsurigroup)

সম্পাদকীয়



সম্পাদক হিসেবে ‘সাহিত্য সৃষ্টির নানা দিগন্ত: তত্ত্ব ও প্রয়োগের নিরিখে’ শীর্ষক দুই দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক সেমিনার থেকে উদ্ভূত এই সংকলনটি উপস্থাপন করতে পেয়ে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। ২০২৫ সালের ৮ ও ৯ এপ্রিল সামসি কলেজের ইংরেজি ও বাংলা বিভাগ এবং উত্তরসূরি, অসম এর যৌথ উদ্যোগে এই আন্তর্জাতিক সেমিনারের আয়োজন করা হয়।

শিরোনামটি নিজেই এক বিস্তৃত বৌদ্ধিক পরিসর উন্মোচন করে। ‘নানা দিগন্ত’ শব্দবন্ধ প্রসারণের ইঙ্গিত বহন করে; এক অনবরত বিস্তৃত অনুসন্ধানক্ষেত্র, যেখানে সাহিত্য জাতি, ভাষা ও শাস্ত্রের সীমারেখা অতিক্রম করে। ‘সাহিত্য সৃষ্টি’ কল্পনাশক্তি ও সমালোচনামূলক প্রক্রিয়াকে সামনে আনে, যা পাঠ ও ঐতিহ্য নির্মাণে ভূমিকা রাখে। আর ‘তত্ত্ব ও প্রয়োগের নিরিখে’ নির্দেশ করে এক সক্রিয় সংলাপের ক্ষেত্র, পাঠ ও প্রেক্ষিতের মধ্যে, সৃজনশীল লেখক ও সমালোচকের মধ্যে, প্রতিষ্ঠিত তাত্ত্বিক কাঠামো ও জীবন্ত সামাজিক বাস্তবতার মধ্যে। এই সেমিনার সাহিত্যকে স্থির সংরক্ষণাগার হিসেবে নয়, বরং ইতিহাস, সংস্কৃতি, রাজনীতি, লিঙ্গ, পরিবেশ ও পরিচয়ের প্রতি সাড়া জাগানো এক চলমান আলাপ হিসেবে কল্পনা করে।

এই দুই দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক সেমিনার আয়োজনে মূল্যবান সহযোগিতার জন্য আমরা উত্তরসূরি, অসম-কে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। এই একাডেমিক সমাবেশ জ্ঞান-বিনিময়কে সুদৃঢ় করা এবং অর্থবহ বিদ্যৎ-সহযোগিতা গড়ে তোলার এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

আমাদের মাননীয় বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ, সম্মানিত বক্তাগণ এবং মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক; বিশেষত মাননীয় উপাচার্যবৃন্দ, যাঁদের প্রজ্ঞাপূর্ণ আলোচনায় সেমিনার সমৃদ্ধ হয়েছে, তাঁদের প্রতি রইল গভীর কৃতজ্ঞতা। তাঁদের মননশীল বিশ্লেষণ সমকালীন সাহিত্যচর্চার বিভিন্ন দিক উন্মোচিত করেছে এবং অংশগ্রহণকারীদের সমালোচনামূলক চিন্তাকে অনুপ্রাণিত করেছে।

বর্তমান সংকলনে বিভিন্ন সাহিত্যিক ও সামাজিক বিষয়কে বহুমাত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আলোচিত গবেষণাপত্র সংযোজিত হয়েছে। তত্ত্বচর্চা, পাঠবিশ্লেষণ, লিঙ্গ-আলোচনা, সাংস্কৃতিক অধ্যয়ন, উত্তর-ঔপনিবেশিক অনুসন্ধান এবং আন্তঃবিষয়ক নতুন প্রবণতা, বিষয়বৈচিত্র্যের এই বিস্তৃতি সমকালীন সাহিত্য-গবেষণার প্রাণবন্ততা ও বহুস্বরতা নির্দেশ করে। প্রতিটি প্রবন্ধেই রয়েছে কঠোর গবেষণা ও মননশীল সংলাপের প্রতিফলন, যা সম্মিলিতভাবে এক তাৎপর্যপূর্ণ একাডেমিক আলাপকে রূপ দিয়েছে।

সমস্ত প্রবন্ধ উপস্থাপককে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। বিষয়বিশেষজ্ঞদের সুচিন্তিত মূল্যায়নের মাধ্যমে নির্বাচিত মোট একুশটি প্রবন্ধ এই সংখ্যায় প্রকাশিত হচ্ছে, এ আমাদের গর্বের বিষয়। সহকর্মী মূল্যায়ন (Peer Review) প্রক্রিয়া এই প্রকাশনার একাডেমিক সততা ও মান নিশ্চিত করেছে।

এই সেমিনার সফলভাবে সম্পন্ন করতে সামসি কলেজের গভর্নিং বডির প্রেসিডেন্ট, প্রিন্সিপাল ও সেমিনার আয়োজক কমিটির পরিকল্পনা ও নিরলস পরিশ্রমের জন্য তাঁদের প্রতি জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। শিক্ষকবৃন্দ; তাপস কুমার বর্মণ, নীলাঞ্জনা চৌধুরী, রঞ্জিত সরকার, ড. আনারুল ইসলাম, ড. কঙ্কন দত্ত, এবং ড. রোকেয়া পারভীন, তাঁদের নিষ্ঠা, সমন্বয় ও একাডেমিক অঙ্গীকার এই সেমিনার এবং সংকলন প্রকাশে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন।

আমরা আশা করি, এই সংকলন গবেষক, অধ্যাপক ও শিক্ষার্থীদের জন্য একটি মূল্যবান সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হবে এবং সাহিত্য-অনুসন্ধানের নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচনে অনুপ্রেরণা জোগাবে। অবিরাম একাডেমিক সংলাপ ও যৌথ গবেষণার প্রত্যাশায়।

ড. সেখ মোফাজ্জাল হোসেন

সম্পাদক, বিশেষ সংখ্যা

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ সামসি কলেজ, মালদা, পশ্চিমবঙ্গ



আখ্যান বিহীন আখ্যান-এ কার্নিভালের ব্যঙ্গাত্মক হাসি- ‘মসোলিয়ম’

ড. সেখ মোফাজ্জল হোসেন, সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, সামসী কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 26.12.2025; Accepted: 28.01.2026; Available online: 28.02.2026

©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

Abstract

In Mausoleum, everything is deconstructed. The counter-text is infused with illusion, magic, and improbability. In a twenty-first-century, logic-driven, technology-obsessed age, imagination is shaped through an intense carnival and a fusion with the hyper-real, giving rise to the complete narrative—or anti-narrative. It is as if Nabarun has taken a vow not to spare any subject. After literature, his primary target is contemporary politics and political leaders. He seems to place every major party of India’s multi-party democracy before an encounter squad. He exposes the cult of personality prevailing in some parties, while also laying bare the fundamentalist character of others.

To rupture this rigid chain of logic, Nabarun Bhattacharya creates a verbal intoxication of illusion and storm, and a language steeped in satire and mockery. And if we choose to see the issue this way—that social decay has reached the very soul and is no longer confined merely to the exterior—then Nabarun shows that it is the soul that has fallen ill, not the body. In this society, those entrusted with maintaining law and order are today the very violators of the law, and in many cases, criminals themselves.

From the 1970s onward, conscious novelists began attempting to break free from this closed chamber of narrative. The seeds of Nabarun’s writing are scattered within the equations of that period. His effort is to dismantle the illusion of story and the stagnation of thought. Mausoleum adds another new dimension in this respect—where the counter-text governs the text. If there is no objection to large-scale hero worship such as the preservation of Lenin’s dead body, then why does an uproar arise over Bhodi becoming a mummy? After all, this too is a form of personality cult.

Mausoleum thus emerges as an example of possible improbability, where, within the author’s constructed world, even the impossible becomes possible.

Keywords: Illusion, magic, carnival, authoritarianism, imperialist propaganda, Lenin’s mummy, Soviet science, Saptahik Vampire, textual play, Purandar Bhat’s poetry, Khandani Khanki

বিশৃঙ্খল এই সময়ের বিশৃঙ্খল জীবনকে উপন্যাসে রূপদানের জন্যে আজকের আখ্যানকাররা তাঁদের লেখার মাধ্যমে যে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, সে চেষ্টার এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ ‘মসোলিয়ম’। জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে আমাদের নিখাদ অভিজ্ঞতার বর্ণনা উপন্যাস নয়। বাখতিন আমাদের জানিয়েছেন ‘when a man is in art,

he is not in life, and vice versa’ (‘Estetika’ page. 5) জীবন ও শিল্প অন্যান্যসম্পৃক্ত হয়েও দুটি এক নয়। জীবনানন্দকে একটু বদলে নিয়ে বলা যেতে পারে জীবন ও উপন্যাস একই জিনিসের দুরকম উৎসারণ বা সমালোচকের ভাষায়-

“Both art and lived experience are aspects of the same phenomenon, the heteroglossia of words, values, and actions whose interaction makes dialogue the fundamental category of dialogism... Art and life are two different registers of dialogue that can be conceived only in dialogue.”^১

যথার্থ ঔপন্যাসিকরা তাই যথাপ্রাপ্ত জীবন ও কাহিনি চিত্রণের জাবর কাটায় নিজেদের ব্যস্ত রাখেন না। বিশেষত যখন বাস্তব হয়ে ওঠে আধিপত্যবাদের ছায়ায় আবিল, ছদ্মসত্যের কুযুক্তি ও শৃঙ্খলায় বিশৃঙ্খল, তখন আখ্যানকারদের দায়িত্ব হয়ে পড়ে এই মিথ্যার অতিস্বর ও ইচ্ছাপূরণের আয়োজনকে প্রতিহত করতে বিকল্প বাস্তবের নির্মাণ করা। নবারুণ ভট্টাচার্যের মতো আখ্যানকার এ দায়িত্ব সযত্নে পালন করেন। ‘মসোলিয়ম’ (এখন পর্যন্ত প্রকাশিত সর্বশেষ উপন্যাস) থেকে ‘হারবার্ট’ পর্যন্ত তাঁর এই সামাজিক দায়িত্ব পালনের চিত্র ছড়িয়ে আছে। তাই রমাপ্রসাদ নাগ ‘নবারুণ ভট্টাচার্যর কথাবাস্তব: এক প্রতিস্পর্ধী অ্যাজেন্ডা’ নামক প্রবন্ধে লেখেন

“জনজীবনের সামগ্রিক পরিসরটির কথারূপ দিতে গিয়ে নবারুণ বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ ও নান্দনিক চেতনা দুটি ক্ষেত্রের সমন্বয় সাধন প্রয়াসী। কবিতা দিয়ে শুরু করে গদ্য- সাহিত্য পর্যন্ত অর্থাৎ হারবার্ট থেকে মসোলিয়ম এবং অজস্র ছোটগল্পে নবারুণ ব্যঞ্জনধর্মী কথাশিল্পের ভাষারূপটিকে প্রসারিত করেন—নির্মাণ করেন—উন্মুক্ত করেন। সমাজের আয়নার মুখোশে ঢাকা শাসনের মুখটিকে তিনি স্পষ্ট করে দেখিয়ে দিয়েছেন। মুন্ডুহীন ক্ষমতাবানদের অসারতা তুলে ধরেছেন। স্পর্ধা, অশালীনতা ও হিংস্রতার পদাটি উন্মোচন করে ক্ষমতার আধিপত্য বিস্তারের চেহারাটি স্পষ্ট করেছেন।”^২

‘কাঙাল মালসাটে’ ভদির চোক্তারবাহিনী ও ফ্যাডাডুরা মিলে যে জবরদস্ত ঝামেলা পাকিয়েছিল, ‘মসোলিয়ম’-এ সেই দুই বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বনবেড়াল ও সাহিত্য সম্রাট বজয়া ঘোষ সব মিলিয়ে আরো একটা ধুন্দুমার কাণ্ড। এবার ঘটনার কেন্দ্রে মমি-ভদির মমি। আর এ ঘটনাকে জড়িয়ে জড়িয়ে ঘটে চলে একের পর এক ঘটনা। যেগুলি বাস্তব এবং অধিবাস্তবের যুগলবন্দীতে আধিপত্যবাদী প্রতিটি অবস্থানকে নস্যাৎ করে দেয়। ‘মসোলিয়ম’ গ্রন্থাকারে প্রকাশের আগে ২০০৫ সালে নবারুণের লেখা সম্বন্ধে তপোধীর ভট্টাচার্য ‘আখ্যানের সাতকাহনে’ লিখছেন-

“...হারবার্ট থেকে ‘কাঙাল মালসাট’ পর্যন্ত নবারুণ ঐন্দ্রজালিক বাস্তবতাকে নিজস্ব পদ্ধতিতে গ্রহণ করে রচনা করেছেন বাস্তবের ইন্দ্রজাল। এ এমন এক বিশিষ্ট বাস্তব যাতে অধিবাস্তবের সঙ্গে দ্বিরালাপ স্বতঃসিদ্ধ আর যাতে সমস্ত আধিপত্যবাদী অবস্থানের প্রতি ঘোষিত হয় উত্তর-ঔপনিবেশিক প্রত্যাহ্বান ও প্রতিরোধ। কার্নিভালের শ্লেষ ও রাজনৈতিক অন্তর্ভবনের উত্তাপ এই পাঠকৃতিকে পণ্য-সাহিত্যের প্রতিষেধক হিসেবে উপস্থাপিত করে।”^৩

এই মন্তব্যের প্রতিটি বাক্যই সমানভাবে প্রযোজ্য ‘মসোলিয়ম’-এর ক্ষেত্রেও। বাস্তব, কাহিনি— সব কিছুই বিনির্মিত হয়েছে। আর প্রতिसন্দর্ভটিতে মিশে গেছে কুহক, ইন্দ্রজাল, অসম্ভাব্যতা। একুশ শতকের যুক্তি ও যন্ত্র-প্রযুক্তি সর্বস্ব সময়ে প্রকল্পনা নিবিড় কার্নিভাল এবং অধি-বাস্তবের মিশ্রণে তৈরি হয় সম্পূর্ণ আখ্যান বা না-আখ্যানটি। কার্নিভালের ব্যঙ্গাত্মক হাসি দিয়ে লেখক মোকাবিলা করেন বাস্তব নামক প্রহসনকে। আর ‘কাঙাল মালসাট’ আলোচনা কালে আগেই উল্লেখ করেছি যে, কার্নিভাল কেবল মাত্র কৌতুক নয়, কৌতুকের আড়ালে

থেকে একটু বেশি বলা, বা-

“...আপাত-লঘু ভঙ্গিতে সরকারি মতাদর্শ ও প্রতাপ-পুষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক সম্ভ্রান্ততার বিরুদ্ধে লোকায়তের প্রত্যাঘাত।”^৪

শাসক শক্তি সবসময় চায় তার আধিপত্যকে বজায় রাখতে। আর ক্রিয়ার বিপরীত-মুখী প্রতিক্রিয়ার মতো শাসিত শক্তি চেষ্টা করে সেই আধিপত্য থেকে বেরিয়ে আসতে। সমাজ-সংস্কৃতি এবং সাহিত্যের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত এই তত্ত্বে বলা হয় কার্নিভালের উদ্দামতার আড়ালে মূলত লুকিয়ে থাকে তীব্র সমাজ সমালোচনা। যে সমালোচনায় থাকে শাসকশক্তির প্রতি ব্যঙ্গ। এখানে আপাতত একটি অংশকে উদ্ধৃত করা যায়, উদাহরণ হিসেবে—

“পুরন্দরের ভাগ্যটা সত্যিই খুলে গেল। যারা ‘কাঙাল মালসাট’ আর ফ্যাতাডু-র গল্পো ছেপে ডুবছে তারা পুরন্দরের কবিতার একটা ফোল্ডার বের করল, ‘কবিবর পুরন্দর ভাটের ভাটের কবিতা’। বাংলা কবিতার কন্ট্রোল রুমে খবরটা কি পৌঁছেছিল। ডোনারকে ঐ কন্ট্রোল রুমটিতে ঢুকলে নানা রেয়ার জাতের হাফ-ডাইনো ও কতিপয় কুমিরকে কী দেখা যাবে যাদের ডিসকভারি, ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক বা অ্যানিমাল প্ল্যানেট চ্যানেলে দেখা যায় না। এদের ধরে ধড়াধড় ক্যালানোর হাই টাইম অনেক দিন আগেই পার মারীচরণী হয়ে গেছে। যাই হোক, ওই ভেড়ুয়াগুলোকে নিয়ে কস্টলি সময় না ওয়েস্ট করে আমরা বরং পুরন্দরের কাব্য-জীবনের নতুন পর্যায়টি একটু সাইজ করতে পারি।”^৫

এভাবে সরাসরি নবাবুণের ব্যঙ্গের চাবুক আঘাত হানে সাহিত্যের ক্ষেত্রে আধিপত্যবাদী প্রতিষ্ঠানের উপর। যে নির্দিষ্ট সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠান বেতনভুক সাহিত্যিক শ্রেণির পৃষ্ঠপোষক এবং সেই পালিত সাহিত্যিকদের লেখার গতি, ধারা নির্ণায়ক, সেই প্রতিষ্ঠানকে বর্তমানের ব্যতিক্রমী ধারার লেখকরা সযত্নে এড়িয়ে চলে। কিন্তু নবাবুণ এড়িয়ে না গিয়ে সোজাসুজি তাল ঠুকে আক্রমণ করেন এই প্রতিষ্ঠানকে তাঁর লেখার মাধ্যমে। সাহিত্য এবং সাংস্কৃতিক রাজনীতির আরো কিছু বিষয় হয়ে ওঠে তাঁর ব্যঙ্গের সরাসরি লক্ষ্যবিন্দু। যেমন—

“আশা করা যায় যে পিওর পাঁচু না হলে পাঠক বুঝতে পারবেন যে বজরা ঘোষ এক মহান ঔপন্যাসিক এবং হালের বাংলায় নভেল রচনার নামে যে ত্যাগদা হারামিগিরি চলেছে তার মধ্যে বজরা ঘোষকে ভাবাই যায় না। বলাই বাহুল্য যে ক্রিটিকেরা আমাদের এই সুচিন্তিত মূল্যায়নের সঙ্গে একমত তো হবেনই না উপরন্তু অবজ্ঞা ভরে ঠোঁট বঁকাইবেন। মাঝরাতে যখন মশারির ওপরে বনবেড়াল ল্যান্ড করবে তখন শালারা টের পাবে।”^৬

অর্থাৎ এবারে নবাবুণের লক্ষ্য সাহিত্য সমালোচকগণ। সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে একটা ধাঁচ ছিল, পাশ্চাত্যের সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের সঙ্গে তুলনাত্মক বিচার। তাই মাইকেল মধুসূদন দত্তকে তুলনা করা হয়েছে মিল্টনের সঙ্গে। এমনকি আধুনিকোত্তরবাদী লেখক রমানাথ রায় একটি সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন-

“...পাশ্চাত্য সাহিত্যের পাশে একালের বাংলা সাহিত্যকে রাখলে বোঝা যায় আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছি।’...আমরা যদি বাইরের লেখালেখি পড়ি তাহলে বুঝতে পারব, আমাদের লেখালেখি কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। একটা জিনিস ভাল কি মন্দ, নতুন কি পুরনো সেটা বিচার করা হয় তুলনার সাহায্যে।”^৭ (অন্যায় করিনি/উপন্যাসের পেছনে প্রকাশিত সাক্ষাৎকার/১৪০৯/বইমেলা/পৃষ্ঠা-৯৬)

আর সে জন্যেই পাশ্চাত্য সাহিত্যের ধারা থেকে সরে কিছু রচনা করলে তা সমালোচকদের হালে পানি পেত না। তাই সে যুগে ত্রৈলোক্যনাথের মতো দেশীয় রচনাভঙ্গির অনুসারী লেখকের লেখা সম্বন্ধে সমালোচকরা খুব ভালো মত প্রকাশ করেননি। এমনকি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও একে রূপকথা বলেই অভিহিত করেছেন। আর সুকুমার সেন সাদৃশ্য খুঁজেছেন ত্রৈলোক্যনাথের ‘কঙ্কাবতী’র সঙ্গে লুইস ক্যারলের ‘অ্যালিস ইন ওয়াণ্ডারল্যান্ড’-এর। বাঙালি সমালোচকদের এই প্রবণতাকে কার্নিভালের হাসিতে অবজ্ঞা করার জন্যেই যেন লেখক নিজেই বনবেড়ালের হাসির তুলনা খুঁজে নেন লুইস ক্যারলের বর্ণনায়—

“বনবেড়ালের মুখে সেই হাসি যার বর্ণনা লুইস ক্যারলের মতো কোনো মনসবদারই দিতে পারেনি।”^৮

নবাবুণ যেন প্রতিজ্ঞা নিয়েছেন তিনি কোনো বিষয়কে ছেড়ে কথা বলবেন না। সাহিত্যের পরেই তাঁর প্রধান লক্ষ্যবস্তু আজকের রাজনীতি, রাজনৈতিক নেতারা। ভারতের বহু-দল-ভিত্তিক গণতন্ত্রের প্রত্যেকটি প্রধান দলকে তিনি যেন এনকাউন্টারে দাঁড় করিয়ে দেন। কিছু দলে যে ব্যক্তিত্ব চলছে তা যেমন তিনি প্রকাশ করেন, তেমনি প্রকাশ করে দেন কিছু দলের মৌলবাদী চরিত্র। আর লক্ষণীয় বিষয়, দলগুলির চরিত্র তুলে ধরার জন্য তার প্রয়োজন হয় না খুব বেশি শব্দের। কিছু শব্দের দ্বারা নির্মিত ছোটো ছোটো কয়েকটি বাক্যের মাধ্যমে তিনি অব্যর্থভাবে চিহ্নিত করেন জাতীয় এবং আঞ্চলিক কয়েকটি দলের বৈশিষ্ট্য:

“কংগ্রেসের এক লিডারকে মিডিয়ার প্রশ্ন,

—মমি নিয়ে আপনারা কি ভাবছেন?

—হাই কম্যান্ড না জানালে মুখ খুলব না।

তৃণমূলের জনৈক লিডারও ইভেসিভ,

—দেখি উনি কি বলেন।

বি.জে. পি-র নেতার জবাব,

—যাঁর মমি হয়েছে তিনি কতটা নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন আমাদের খতিয়ে দেখতে হবে।

আর. জে. ডি-র নেতা,

—কেয়া মমিয়া মমিয়া করতে হো। হাম কেয়া কুছ কমি হ্যায়?”^৯

আর পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে ক্ষমতাসীন দলটিকে যে নবাবুণ ছেড়ে দেবেন না তাঁর বাক্যবাণের লক্ষ্য থেকে এ বলাই বাহুল্য। তিনি দেখিয়ে দেন দলের কিছু কিছু বিষয় নিয়ে গোঁড়ামি। যেমন, কোনো কবিতার ভালো কি মন্দ নির্ধারিত করা হয় লেখক কোন দেশীয় তার উপর নির্ভর করে। পার্টি অফিসের মিটিং-এ দুই মন্ত্রী কথোপকথন—

“কবিতাটা ভালো? কিন্তু কার?

—অ্যামেরিকান কবি অগডেন ন্যাশ-এর।

—তার মানে ইম্পিরিয়ালিস্ট প্রোপাগান্ডা। ওসব ফালতু জিনিস পড়েন কেন?”^{১০}

আবার একই পৃষ্ঠাতে দেখি, নিজেদের দেশের প্রতিটি ব্যাপার নিয়ে সন্দেহ করতে অসুবিধা নেই। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে স্বাধীন মতামতকে তাঁরা রুদ্ধ করতে চান তাই— ভদ্রির মমি নিয়ে যদি প্রশ্ন ওঠে তবে লেনিনের মমি নিয়েই বা প্রশ্ন ওঠে না কেন—এরকম কথা উঠলে কমরেড আচার্যর মন্তব্য—

“এদের এমন সাহস যে ওরা লেনিনের মমি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। কোথায় সোভিয়েত বিজ্ঞানের যুগান্তকারী সাফল্য আর কোথায় ...”^{১১}

বিশেষত বামপন্থার যে বিচ্যুতি ক্ষমতার আধিপত্যের অঙ্কে জন্ম নিয়েছে তা সম্বন্ধে তাঁর ক্ষোভ ও ক্রোধ দুই-ই বর্তমান। বিশেষত নকশালপন্থীদের প্রতি সহানুভূতিশীল লেখক ভুলে যেতে পারেন না বিভিন্ন আন্দোলন দমনে বামপন্থী সরকারের গৃহীত বিভিন্ন অত্যাচারের নমুনা— যা ছড়িয়ে আছে তার দীর্ঘ বত্রিশ বছরের ক্ষমতাসীন থাকার সময়ে। তাই নবায়ন লেখেন—

“হুঁ হুঁ বাবা এর নাম সি.পি.এম.। যার পোঁদে লাগবে তাকে ছ্যাঁচাপোড়া করে মারবে। সারাক্ষণ লোক লাগিয়ে রেখেছে। কেউ হয়তো অন্যের বউ ফুঁসলোবে বলে তান্ত্রিক ধরে এনেছে। ঘর ভাড়া নেবে। মোড়ের মাথায় ধরে এমন সব উল্টোপাল্টা গাওনা দেবে, রগড়া দেওয়ার ভয় দেকাবে, মাল আর আসে? পুলিশে ধরবে, হাজতে নিয়ে গিয়ে ন্যাংটো করে ক্যালাবে- এসব থ্রেট শুনে ওরাও ভাবলো যে কাজ নেই বাবা। কোতায় শান্তি করে এটা-ওটা করবো, তা না, যতো উটকো হ্যাঁপা। শুকিয়ে মারবে। সি.পি.এম. বলে কতা।”^{২২}

‘সাপ্তাহিক ভ্যাম্পায়ার’-এর প্রসঙ্গে নবায়ন গণমাধ্যমের প্রতি তাঁর কটাক্ষ নিষ্ক্ষেপ করেছেন। প্রাক্ স্বাধীনতা ভারতবর্ষের বাংলা সংবাদপত্রের এক ঐতিহ্যময় ইতিহাস রয়েছে। হরিশ মুখোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন সিংহ, ঋষি অরবিন্দ ঘোষ, কাজি নজরুল ইসলামের মতো সম্পাদক যারা নিজেদের ব্যক্তি জীবনকে প্রাধান্য না দিয়ে জনসেবার উদ্দেশ্যে সংবাদপত্র প্রকাশ করে, সরকারের রোষের শিকার হয়েছিলেন। আর আজ সেইখানে সংবাদপত্রগুলির চরিত্র যা হয়েছে তা কবিতা সিংহ-এর ভাষায়-

“আজ খবরের কাগজের প্রকৃত মালিক ‘হৌস’। সম্পাদকের চেয়ে স্বত্বাধিকারীর মুখ বেশি স্পষ্ট। লেখক ও কর্মচারীরা সেই বন্ধ ঘরের অন্ধকারের রাজার নির্দেশে লাঠি ঘোরানোর খেলা খেলেন। আজ আমরা কোন ‘সম্পাদকীয়’ পথনির্দেশ বা প্রতিবাদী লেখা পাই না। সারা বাংলার ফোর্থ স্টেটের আজ সামনে কোন আদর্শ নেই, দাপিয়ে বেড়াচ্ছে বণিকের মানদণ্ড ধনিকের রাজদণ্ড হয়ে। ‘যো হুকুম’ বলবার জন্য লালায়িত লেখকদের ফেরুপালের মধ্যে একটা ‘সিংহ’-ও নেই। সব ভিতরে ক্যাসেট ভরা পুতুল এবং ব্রেন ওয়াশড্ ভেড়ুয়ার দল। মাস-মাইনের বদলে যা বলাও বলি। যা করাও করি।”^{২৩}

স্বাভাবিকভাবেই নবায়নের মতো সংবেদনশীল লেখক সংবাদপত্রের এই চরিত্রাঙ্কনকে মুখ বুজে মেনে নেবেন না। ঘৃণা, ক্ষোভ, বিতৃষ্ণা সব মিলেমিশে প্রতিবাদী রূপ প্রকাশিত হয় তাঁর লেখায়। সাপ্তাহিক ভ্যাম্পায়ার-কেন প্রকাশ করা হচ্ছে লেখক জানান এভাবে—

“— আজিকার সংবাদপত্রগুলি যে সব খবর ছাপে তাহা পড়িয়া পাঠকের কোনো লাভই হয় না। উপরন্তু ছাগলামি বাড়ে। তাই, প্রকৃত, সরেস সংবাদ সারবান পাঠককে পোঁছাইবার নিমিত্ত এই পত্রিকা প্রকাশিত হইল। সমাজের যাঁহারা মাথা তাঁহারা আমাদের লক্ষ্য নয়। মাথা বাদ দিয়াও অনেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আছে। আমাদের লক্ষ্য তাহাই।”^{২৪}

সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনে ছয়লাপ হয়ে থাকাটাও হয়ে উঠেছে আজকালকার নিয়ম। সে নিয়ম পালনের ছলে ‘সাপ্তাহিক ভ্যাম্পায়ার’-বিজ্ঞাপনের জগতের প্রতি তীক্ষ্ণ ‘বিক্রপবাণ’ ছুঁড়ে দিয়েছে। আসলে এই সময়ে সমাজ-অঙ্গে পচন এতদূর পোঁছে গেছে তাকে রোধ করা কোনো সাধারণ ওষুধের কাজ নয়। তাই এই সময়ের লিখিয়েদের তৈরি করতে হয় পাল্টা এক শক্তিশালী প্রত্যাঘাতের প্রতিনন্দন। জটিল এই সময়ের আধার-আধেয়, চিহ্নায়ক-চিহ্নায়িতদের শনাক্ত করে আবিষ্কার করতে হয় সময়-স্বভাবের অন্তবর্তী অন্ধবিন্দুগুলিকে। আর, অতি আবশ্যকীয়ভাবেই তখন তাঁদের হাতে বিনির্মিত হয় জগত ও জীবনের যাবতীয় যথাপ্রাপ্ত সন্দর্ভ। তাত্ত্বিক তপোধীর ভট্টাচার্য এ প্রসঙ্গে হেলগা নোহোটনিকে উদ্ধৃত করে বলেন—

“সময় স্বয়ং যখন মুখ ও মুখোশ হয়ে জটিলতায় উচ্চাবচতা বাড়িয়ে দেয় আরো, সংবেদনশীল মনে এই প্রতীতি আসে: Time here appears in the mask... which threatens, denies wishes, suppresses and expropriates them. It is the mask of time which causes suffering and which has inevitable death in store in the end. ... Time is made by human beings and has to do with power which they exercise over one another with the aid of 2-3 strategies of time. Time unites and separates-combatants as well as lovers. As with every form of power, there is a counterpower; every strategy finds its counter strategy” (হেলগা নোস্টোতিনি: ১৯৯৪: ১৪২-১৪৩)^{১৫}

এভাবেই উপনিবেশবাদ পরাজিত হয়ে আবার নতুন প্রকরণে নব্য-উপনিবেশবাদের চেহারা আবির্ভূত হয়েছে। প্রতাপ বদলে নেয় তার কৃৎকৌশল। তৈরি হয় এক নতুন কৃষ্ণগহ্বর। প্রতাপের এই যুক্তিশৃঙ্খলাকে ছিন্ন করার জন্যে নবাবুণ ভট্টাচার্য তৈরি করেন কুহক-আঁধির এক বাচনিক মাদক এবং রঙ্গব্যঙ্গের এক ভাষা। আর যেহেতু আমাদের যে কোনো অভ্যাস একটি নির্দিষ্ট যুক্তি- শৃঙ্খলকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে, তাই তাঁর লক্ষ্য হয় প্রতিটি অভ্যাসকে ভেঙে দেওয়া, প্রতিটি প্রচলিত ধারণাকে ভেঙে দেওয়া। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে লেখক আমাদের ইতিহাস সম্বন্ধীয় ধারণাকে বদলে দিতে চেয়েছেন। কারণ এখন পর্যন্ত ভারতীয়রা যাকে ইতিহাস বলে জেনেছে তা আসলে ইংরেজদের শেখানো ইতিহাস। এমনিতাই ইতিহাস বলে যা বোঝানো হয় তা আসলে রাজা-রাজড়ার ইতিহাস, সে ইতিহাসে নিম্নবর্গের কোনো স্থান হয় না। তারপর তা ইংরেজদের নিজেদের শ্রেষ্ঠ এবং ভারতীয়দের এক বর্বর জাতি ধরে নিয়ে লেখা ইতিহাস— ফলে এ ইতিহাসের কতটা যথার্থ ‘ইতি-হ-আস’ তা সন্দেহ থেকে যায়। নবাবুণ ভট্টাচার্য ঠিক সে জায়গাটাই ধরিয়ে দিতে চান। তাই সরখেলের কলমে লিখে চলেন-

“ইংল্যান্ড দ্বীপের স্টোনহেঞ্জ ও বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে রহস্যময় বিরাট বিরাট পাথর নানা ঢঙে সাজাইয়া রাখার বহর দেখিয়া দানিকেনসহ নানা সাহেব নানা মত ব্যক্ত করিয়াছেন। প্রতিটি মতই অসার। গরু খাইলেই যে মাথায় বুদ্ধি খোলে এমনটি নয়। হয়তো পেট গরম হইবার ফলে বায়ু কুপিত হইয়া নানাবিধ আজগুবি স্বপ্ন দেখায়। এমনই একটি থিওরি হইল যে ভিত্তি হইতে দানবরা আসিয়া ওইসব প্রস্তরখণ্ড সাজাইয়া পালাইয়া গিয়াছে। ইহা হইতে পারে না। মানুষ ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ পয়দা। সে এতকাল হাঁচর পাঁচর করিয়া বড়োজোর চন্দ্র পর্যন্ত গিয়াছে, আর কোথাও যাইতে পারিবে বলিয়াও মনে হয় না। সে পারিল না আর দূর তারকামণ্ডল হইতে দানবরা আসিয়া ভূপৃষ্ঠে দৈত্যাকৃতি পাথর লইয়া লুডো খেলায় মাতিল, এ কথা উন্মাদও বিশ্বাস করিবে না। মানুষ যতদিন ধরাধামে আছে তাহা হইতে অনেক হাজারগুণ সময় ডাইনোসররা পৃথিবীতে রাজত্ব করিয়াছিল। সাহেবরাই শিখাইয়াছে যে ডাইনোসর নিরন্তর কামড়াকামড়ি করিত এবং এ উহাকে দেখিলেই হিংস্র গর্জন সহকারে তাড়া করিত। এই ভুল শিক্ষাটিকেই আমি খণ্ডন করিয়া প্রমাণ করিব যে ডাইনোসর ছিল সুশীল ও শান্ত প্রকৃতির এবং অতীব সভ্য। রান্নাঘরে বাসনে বাসনে ঠোকাঠুকির মতো স্বাভাবিক কিছু হয়তো ঘটিয়া থাকিবে কিন্তু উহা বড়ো কথা নয়। সহস্র সহস্র বৎসর থাকিতে থাকিতে ডাইনোসরের মনে আমরা কী ও কেন? এই প্রশ্ন জাগরিত হয়। বিশাল বিশাল চক্ষু মেলিয়া তাহারা নানা আধ্যাত্মিক প্রশ্নের সমাধান খুঁজিয়াছিল। ত্রিতাপের জ্বালা কতদিন আর ভোগ করা যায়? অতএব, তারা তন্ত্রসাধনার পথ ধরিয়াছিল। ওই পাথর সাজাইয়াছিল তাহাই, ওইগুলি এক একটি তন্ত্রপীঠ। আমাদের যাহা ‘ওঁ’, তাহাদের সেটিই ছিল ‘গঁঘ’। এইজন্যই দেখা যায় যে

সকল ডাইনো- মস্তের গোড়াতেই সেই ‘গঁকঘ’।”^{১৬}

প্রচলিত চিন্তাধারার উপর বুলডোজার চালিয়ে দেন এভাবে নবায়ন। আরেকটি হিন্দুধর্মের প্রচলিত মান্যতা প্রাপ্ত ধারণা হলো দেহের মৃত্যু হয়, দেহ জরা প্রাপ্ত হয়, অসুস্থ হয় কিন্তু আত্মার এসব কিছু হয় না। আত্মা অনন্ত, অবিনশ্বর। গীতায় আছে—

“ন জায়তে মৃত্যতে বা কদাচিৎ
নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ । অজো নিত্যঃ শাস্ত্বতোহয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।” (শ্রীমদ ভাগবত গীতা /চতুর্থ অধ্যায়)

নবায়ন এ ধারণাকেও বদলে দিচ্ছেন। তাঁর লেখায় আত্মা অসুস্থ হয়। ভদ্রির পেট খারাপ হলে মমি সাজতে অসুবিধা হবে। তাই তার উপায় দাঁড়কাক জানায় এভাবে-

“—পরকায়-প্রবেশ। ভেরি ইজি। ভদ্রির বডিতে আমি ঢুকে যাব। ভদি ঢুকবে আমার বডিতে।
হাগলে হেগে মরবে দাঁড়কাক। ভদি ঘেরকম রয়্যাল স্টাইলে মমি হয়ে আচে তেমনই থাকবে।”^{১৭}

আর যদি বিষয়টিকে আমরা এভাবে দেখতে চাই যে, সমাজের পচন পৌঁছে গেছে তার আত্মায়, কেবল আর বহিরঙ্গই তা সীমাবদ্ধ নয়। তাই নবায়নও দেখাচ্ছেন যে আত্মাই অসুস্থ হয়ে পড়ে দেহ নয়। এ সমাজে যাদের উপর ভার দেওয়া হয়েছে আইন শৃঙ্খলা বজায়ের, তারাই আজ আইন-ভঙ্গকারী, অনেক ক্ষেত্রে দুষ্টকারী। ‘মসোলিয়ম’-এই পাচ্ছি, পুলিশ বিভাগের উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সংলাপ-

“... পুলিশ কি রেটে রেপ কেসে ফাঁসচে দেখে তাজ্জব হয়ে যাচ্ছি।... কোথায় রেপ হবে, পুলিশ ধরবে, তা না নন-রেপিস্ট পুলিশকেই রেপিস্ট পুলিশকে ধরতে হচ্ছে। পুলিশই পুলিশকে ধরছে। প্যারাডক্সিকাল।”^{১৮}

জীবনে যদি এত প্যারাডক্সে ভরে গিয়ে থাকে, তবে আখ্যানে তো তাকে আসতে হবেই। তাই এভাবে সবকিছু স্থান বদল করে নেয়। বাস্তব-অবাস্তব মিশে তৈরি হয় এক নতুন বাস্তব। যেখানে যা বলা হচ্ছে তাই যে সত্যি হবে—এমন সম্ভাবনা লেখক নিজেই মুছে দেন-

“উপরে যাহা কিছু বলা হইল তাহা ঠিকও হইতে পারে, ভুল হইতে তো পারেই।”^{১৯}

আর এভাবে নবায়ন ভেঙে দেন ঔপন্যাসিকতার প্রচলিত ধরনকেও। চল্লিশের দশক থেকে পরবর্তী পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে বাংলা উপন্যাস হয়ে উঠেছিল বিশেষভাবে নগর ও কাহিনি কেন্দ্রিক। কাহিনির এই সুগোল বৃত্তে পাঠকরাও নিজেদের আবদ্ধ করে ফেলেছিল। আর এর ফলে সমালোচকের ভাষায়—

“মুঠো থেকে ঝরে-যাওয়া বালির মতো কখন যে ব্যক্তিসর্বস্বতার মোহে সামাজিক সময়ের গ্রন্থনা হারিয়ে গেছে—কেউ লক্ষ করেননি। প্রকৃত ঔপন্যাসিকতাকে আমরা পরিদ্রাবনহীন ভাবে গুলিয়ে ফেলেছিলাম ‘with the script writer's stereotypic, ever-escalating and mutually invading soap-operas until it is impossible to distinguish one story, character or moral from the others, until the poor scriptwriter cracks under the once multiple but now cumulative and mangled project that falls on his, their, our heads.’ (হোমি ভাবা: ১৯৯৪:৭৫)”^{২০}

সত্তরের দশক থেকে সচেতন ঔপন্যাসিকরা এই কাহিনির রুদ্ধ ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে চেষ্টা শুরু করেন। নবায়নের লেখার বীজ ছড়িয়ে আছে এই সময়ের অঙ্কেই। তাঁর প্রচেষ্টা কাহিনির মায়া, ভাবনা-চিন্তার অচলায়তনকে ভেঙে দেওয়ার। ‘মসোলিয়ম’এক্ষেত্রে আরেকটি নতুন মাত্রা। যেখানে পাঠকৃতিকে শাসন করে

প্রতি-পাঠকৃতি। থেকে থেকেই কাহিনির বিন্যাস হয়ে যায় নির্মৌক, যা আসলে প্রতিন্যাসের প্রবণতাকে আড়াল করে। আপাত-অসংলগ্ন অনুষঙ্গ বিন্যস্ত হয়ে উপন্যাসকে করে তোলে না-উপন্যাস। ‘কাঙাল মালসাটে’ আমরা দেখেছিলাম স্বয়ং লেখক নিজেকে টেক্সচ্যুয়াল প্লে’র সঙ্গে জড়িয়ে নিয়েছেন। আর ছিল পুরন্দর ভাটের কবিতা। এবারের নতুন সংযোজন উপন্যাসের মধ্যে আরেকটি উপন্যাস, আর উপন্যাসে সংবাদপত্রের সংযোজন। ‘সাপ্তাহিক ভ্যাম্পায়ারে’র অদ্ভুত খবর, সেগুলোর কোথাও কোথাও হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মতো ফুটে উঠেছে সমাজের উল। চেহারা। যেমন, ‘পেত্টির কুপ্রস্তাব’ যেখানে এক ফাঁকে এসেছে পরিচারিকার রহস্যময় মৃত্যু বা রাতের রণক্ষেত্রে ‘ছুঁচা বনাম বেড়াল’ সংবাদটিতে কেমন যেন অন্ধকার জগতের দুই দলের সংঘর্ষের কথা মনে করিয়ে দেয়। আর ‘মসোলিয়ম’-এ কেবল ‘সাপ্তাহিক ভ্যাম্পায়ার’-এর খবর দিয়েই শেষ নয়, যোগ করা হয়েছে সচিত্র বিজ্ঞাপন। আর রয়েছে সাহিত্য সম্রাট বজরা ঘোষ প্রণীত উপন্যাস ‘খানদানি খানকি’।

“কাকভোরে বা বলিতে গেলে ঘোর শীতের প্রায় শেষ রাতে অর্ধোন্মাদ শিবনাথ ঝড়ের গতিতে তাহার ডজ ট্যাক্সি উড়াইয়া গঙ্গার জেটির দিকে ধাবমান হইল। কলিকাতার বিশিষ্ট চর্ম ব্যবসায়ী মিস্টার কক্-এর সহিত তিনমাসের জন্য খানদানি খানকি মাল্টা চলিয়া যাইতেছে। শিবনাথের কাতর ওজর-আপত্তি দৃঢ়চেতা খানদানি খানকি উড়াইয়া দিয়াছে।”^{২১}

এভাবে চলেছে উপন্যাসের মধ্যে আরেকটি উপন্যাসের সংযোজন। আবার লেখক এতটুকুতেই শেষ করেননি, মসোলিয়মে’ রয়েছে ‘খানদানি খানকি’ সম্বন্ধে আলোচনাও-

“‘মসোলিয়ম’ রচনা করার বা নামানোর ফাঁকে ফাঁকে ‘খানদানি খানকি’-র নিবিড় পাঠ চলিতেছে। আমরা বিস্মিত হইয়াছি—বজরা ঘোষের একটি টেকনিকে। সেটি হল নিজের উপন্যাসের মধ্যে স্বনামে লেখকের আবির্ভাব। নিজের নাম না করিয়া যেমন নিজের ছবিতে অটোগ্রাফের মতো উপস্থিত হইতেন ভীতিপ্রদ আলফ্রেড হিচকক।”^{২২}

অর্থাৎ তাঁর মূল অভিনিবেশ হচ্ছে অন্তর্ভবনের অন্তর্হীন গ্রন্থনায়। তাই বোধহয় আখ্যানে ন্যস্ত হয় এত ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিক। আবার নবাবুগের অগোছাল সন্নিবেশের ধরনে মনে হয় এসব হয়তো একেবারে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কলমের ডগায় এসে যাওয়া। কিন্তু একটু অভিনিবেশ সহযোগে পাঠ করলে বোঝা যায় এই অগোছাল সন্নিবেশের আড়ালে একটি শক্ত মুঠোতে ধরে আছে সবকিছুর রাশ। এবং যথোচিত চিন্তাভাবনা করেই প্রতিটি বাক্য লেখা হয়েছে। আর বিদূষণ ও ক্ষয়ের সংক্রমণে সংক্রামিত রাষ্ট্র-পৌর-সমাজ-রাজনৈতিক ব্যবস্থা-বৌদ্ধিক সমাজের অন্তঃসারশূন্যতা এবং ইতরতাকে নগ্ন করে দেওয়া হয় পক্ষপাতহীন কার্নিভাল দিয়ে। সমালোচক তথা তাত্ত্বিক তপোধীর ভট্টাচার্যের ভাষায়—

“জীবনকে যখন ফাঁপা খোলস বলে মনে হয়, মুখোসের ভিড়ে দমবন্ধ হয়ে আসে –বাস্তব কী, কাহিনি-ই বা কোথায়! প্রতিবাস্তব আর প্রকল্পনার নাগরিক কুহক যেন প্রতিষেধক হয়ে ওঠে তখন। সবকিছু যদি নারকীয় বিশৃঙ্খলা বলে প্রতিভাত হতে থাকে, প্রণালীহীনতার তুমুল হটরোরেলের মধ্যে প্রণালী খুঁজে নিতে পারেন কোনো ব্যতিক্রমী কথাকার। যে প্রজন্ম যুগপৎ শিকড়হীন ও আকাশহীন, আধুনিকতাবাদী পর্যায় পেরিয়ে এসে তা আর চোরাবালি কিংবা পোড়ো জমির আকল্প খোঁজে না। বরং ‘fragments of nonsense’ দিয়ে তৈরি করে নেয় সূচনাহীন সমাপ্তিহীন না- কাহিনির উৎসব-মত্ততা। প্রতিটি পরম্পরা বিচ্ছিন্ন অথচ অমোঘভাবে অন্যান্য- সম্পৃক্ত অনুচ্ছেদে লক্ষ করি গন্তব্যহীন যাত্রার প্রবর্তন। যাতে নিরবচ্ছিন্ন যাত্রাই লক্ষ্য। সব কিছু শেষ হচ্ছে কানাগলিতে তবু এদের মধ্য থেকে তৈরি হয়ে যাচ্ছে পাকদন্ডি পথ।”^{২৩}

আর তাই প্রচলিত ভাষা ব্যবহারের রীতি আর মান্যতাপ্রাপ্ত শব্দ প্রয়োগের পন্থাকে কলমের হাঙ্কা আঘাতে বিদেয় দেন। কারণ এও একরকমের অভ্যাস—ভাষা সম্বন্ধীয় ছুৎমার্গীয় সংস্কার। আর তাই তো সাধু ও চলিত ভাষারীতির মিশ্রণটি ‘গুরুচণ্ডালী দোষ’ নামে পরিচিত। এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে ভাষার সংস্কারে কেমন করে ঢুকে গেছে প্রতাপের বয়ান। আর নবাবরুণের মতো লেখক, যাঁর উদ্দেশ্যই প্রতাপের সব সদর দপ্তর ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়া, স্বাভাবিকভাবেই ভাষা- সংস্কারের মতো প্রতাপের একটি ঘাঁটিকে ছেড়ে দেবেন না। তাঁর নিজের ভাষায়-

“মহাপণ্ডিতদের ফুৎকারে, মান্য ভাষা না মেনে চলার অপরাধে, কত কত সাহিত্যিকমণী যে উড়ে গেছে তা শুনে শেষ করা যাবে না। কিন্তু উড়ে যেতে যেতে তারা সকলেই বলেছে ‘অনেক ভাটিয়েছেন, এবারে ফুটুন’। হাংগ্রি-রা থাকলে অবশ্যই বলতেন, যেমন তাঁরা বলেছিলেন— ‘এবার তবে মুখের মধ্যে লাগিয়ে নিন লুপ’। আমরা না হয় কুলুপই বললাম। বাংলায় মানেটা এই যে ভাষাকে রক্তহীন, অযৌন, প্লাস্টিকগন্ধী ও ঢামনা করে দেওয়ার একটা চেষ্টা আছেই। আমাদের কাজ হল এইসব সচেষ্টদের বাংলা মতে ক্যালানো। আগে তেরপল চাপা। তারপর খেঁটো বাঁশ।”^{২৪}

নবাবরুণ ভট্টাচার্য চাকরিসূত্রে দীর্ঘদিন সোভিয়েত রাশিয়াতে ছিলেন। একজন বামপন্থী হিসেবে সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতি কিছু স্বপ্ন নিশ্চয় তাঁরও ছিল, কিন্তু তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় তিনি দেখেছেন খুব ভালো নেই সোভিয়েতের দেশগুলো। বিশেষত বীরপূজাকে কোনো যথার্থ বামপন্থীর পক্ষেই মেনে নিতে পারার কথা নয়। কারণ-

“ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় সোভিয়েতে বীরপূজা প্রচলিত হয়েছিল যেদিন, সেদিন থেকে প্রাধান্য পেতে থাকে সমাজতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধ এক চেতনা। অত্যাচার ও নিপীড়নে স্তব্ধ হয়ে যায় বিরুদ্ধবাদী কণ্ঠস্বর।”^{২৫}

স্বাভাবিকভাবেই নবাবরুণও তাই ভালোভাবে মেনে নিতে পারেননি লেনিনের মমি বানিয়ে রাখা। কারণ এও তো বীরপূজারই উপাচার। তাই লেনিনের মৃতদেহ না দেখাকে তিনি সৌভাগ্য হিসেবে বর্ণনা করেন। তাঁর ভাষায়—
“সোভিয়েত ভ্রমণে একটি সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। ক্রেমলিনে, মসোলিয়ামে সুরক্ষিত লেনিনের মৃতদেহ আমাকে দেখতে হয়নি। কারণ তখন সোভিয়েত মৃতদেহ সংরক্ষণবিদরা সেটিকে নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন, ফি বছরই এরকম একটা সময় মসোলিয়াম বন্ধ থাকে। মানুষকে নিয়ে ‘ঈশ্বর নির্মাণের’ ঘোর বিরোধী ছিলেন লেনিন।”^{২৬}

এটাও কি একটা কারণ ‘মসোলিয়ম’ রচনার। যার মাধ্যমে নবাবরুণ তাঁর বিরক্তি প্রকাশ করলেন ব্যক্তি পূজা সম্বন্ধে। ভদিরমমি সূত্রে প্রশ্ন তোলা হয় লেনিনের মৃতদেহ সংরক্ষণ সম্বন্ধে। যারা জানে না, তাদের জানিয়েদেওয়া হল লেনিনের স্ত্রী ক্রপস্কায়ার মত ছিল না। আবার এর সঙ্গে লেখক ঠাকুরের ইচ্ছে। তাদের ‘রিচুয়াল সার্ভিস’ নামক একটা ব্যবসা। যেখানে গ্যাংস্টারদের ছিন্নবিচ্ছিন্ন জুড়ে দিয়েছেন আরো কিছু সূত্র। যেমন, লেনিন মসোলিয়াম ল্যাবরেটরির বিজ্ঞানীর মুখে সবই লাশগুলোকে অন্তিম যাত্রার জন্য সাজিয়ে-গুছিয়ে তোলার কাজ করা হয়। সবকিছু মিলিয়ে এক অদ্ভুত পরিবেশ। যা হোক, আবার পুরোনো প্রসঙ্গে ফিরে যাই। লেনিনের মৃতদেহ সংরক্ষণের ঘটনার মতো বড়ো স্তরীয় বীর পূজায় যদি কারো আপত্তি না থাকে তবে ভদির মমি হওয়া নিয়েই ওঠে কেন! কারণ এ তো সেরকমই একটা ব্যক্তিপূজার ঘটনা। প্রশ্ন তবে এক্ষেত্রে প্রশ্ন আরেকটাও হতে পারে যে মমি হওয়াটা কতটুকু সত্যি বা মিথ্যা। লেনিনের মৃতদেহ সংরক্ষিত হয়েছে বৈজ্ঞানিক উপায়ে, এক্ষেত্রে পদ্ধতিটা বৈজ্ঞানিক নাকি ধাপ্লাবাজি! কথাটা হল এই বিজ্ঞানও আজ অন্ধ অনেক রহস্যের

কিনারা করে উঠতে পারেনি, আমাদের জানার পরিধির থেকে না জানার পরিধি কয়েক শত-হাজার গুণ বেশি। তাই দেখি, আমাদের বিচারে অসম্ভব জনজাতিরাও কিছু কিছু ব্যাপারে তথাকথিত শিক্ষিতদের চেয়ে বেশি জানে। ‘মসোলিয়ম’ সে ইঙ্গিতও দিয়েছে—

“—ও কি বলবে? ওয়াইল্ড একটা ক্রিচার, র মিট খায়!

—দ্যাখো মমির সাবজেক্টটা নিয়ে ও একজন অথরিটি, বুঝলে? লং বিফোর দা ফাকিং সাহিবস্, যখন লোকাল চোরগুলো পিরামিডে ঢুকত, ঢুকেই ওকে দেখতে পেত। ইজিপশিয়ান মমি তো হ্যাডি একটা ব্যাপার, বুদ্ধিস্ট মমি সম্বন্ধে ওই আমাকে এনলাইটেন করে। মোস্ট থ্রিলিং। এখন দেখচি বুনো বানচোতটাকে এতদিন কাঁচাখেকো বলে আন্ডার এস্টিমেটই করে এসেচি।”^{২৭}

আর বিশেষত, বিজ্ঞান যেখানে মানুষকে অধীনস্থ করে রাখার, মানুষকে মারবার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে, সেখানে বিজ্ঞানের প্রবেশও বোধহয় নবায়নের তৈরি জগতে নিষিদ্ধ হয়ে যায়। কারণ এ এক আশ্চর্য প্রকল্পনার জগৎ। এখানে বিজ্ঞানের আইনগুলোও উল্টোপাল্টা হয়ে যায়। তাই—

“নর্দমার পাশের টগর গাছ হইতে বৃন্ত্যুত একটি টগরফুল মাঝ আকাশে দাঁড়িয়ে যায় যেন এই সন্ধেতই দিতে যে নিউটনের নিয়ম এই পরিবেশে অচল।”^{২৮}

তাই বদলে যায় সময় ও পরিসরের সাধারণ হিসেব নিকেশটুকুও। সময়ের চলমানতা ও পরিসরের স্থবিরতার নিয়ম পাল্টে যায়। সময় একই থাকে, কিন্তু পরিসর বদলে যায়। অর্থাৎ একটি ব্যক্তি একই সময়ে উপস্থিত হয় ভিন্ন ভিন্ন জায়গায়—

“বনবেড়াল ও দাঁড়কাক ঠিক যে টাইমে পেরদোকে চমকাচ্ছিল সেই একই টাইমে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের মহা মাগিবাজ কিউরেটর ও অন্যান্য বিস্তর খ্যাতিমান ড্যামনার সঙ্গে ওই একই দাঁড়কাক ও বনবেড়ালের সাক্ষাৎ হয়েছিল....।”^{২৯}

ক্রোনোটোপের রৈখিক বিন্যাস ভেঙে যায়। যা ঘটে বা বলে বোধ হয়, তা ঘটে না। সম্ভাবনার মুক্তি-বিধায়ক দিগন্ত প্রকট হয়ে পড়ে অন্তর্ঘাতের লাগাতার বিস্ফোরক উপস্থাপনার সূত্রে প্রসঙ্গে বলে নেওয়া ভালো, আইনস্টাইন-এর আপেক্ষিকতার তত্ত্ব থেকে উদ্ভাবিত ‘ক্রোনোটোপ’ শব্দটির সংজ্ঞা বাখতিন-এর অনুসরণে বলা যায়— সময়গত ও স্থানিক সম্পর্কের সহজাত সংশ্লিষ্টতা যা সাহিত্যে শৈল্পিকভাবে প্রকাশিত হয়। আবার পুরোনো প্রসঙ্গে ফিরে যাওয়া যাক, আসলে লেখক এভাবে ভেঙে দেন সম্ভব ও অসম্ভবের মধ্যস্থানের দেওয়ালটুকু। আর ‘মসোলিয়ম’ হয়ে ওঠে সম্ভব অসম্ভাব্যতা (possible improbability)-র নিদর্শন। যেখানে লেখকের নির্মিত জগতে সব অসম্ভবও সম্ভব। একই চরিত্র একই সময়ে বিভিন্ন জায়গায় যেতে পারে। টগরফুল পড়তে পড়তে মাঝপথে আটকে থাকতে পারে। ভূতেরা তো থাকেই, রীতিমতো টি.ভি.তে পুরোনো ক্রিকেট ম্যাচের সরাসরি সম্প্রচার দেখতে পারে। মনুষ্যের প্রাণীরা কথা বলতে পারে। এই অবাস্তবগুলো লেখকের জগতে ঘটে। আবার এগুলোকে অবাস্তবই বা বলব কেন? বাস্তবে ঘটছে পুরোপুরি এরকম না হলেও কাছাকাছি এ ধরনেরই ঘটনা। মানুষের কণ্ঠকে দাবিয়ে দিয়ে কথা বলছে মানুষের মধ্যে থাকা সব অমানুষ। যে কোনো কাজ অনায়াসে মাঝপথে আটকে দিতে পারে ক্ষমতাশালীরা কেবল নিজেদের স্বার্থে। মৃত ব্যক্তির ভোট দিতে যায়। খুনীরা, অপরাধীরা আদালতে প্রমাণ করে ঘটনার সময় তারা দেশেরই বাইরে ছিল। এই যদি হয় বাস্তব তবে ‘মসোলিয়মে’ বর্ণিত ঘটনাগুলোকেই বা অবাস্তব বলি কীভাবে? সেই ঘটনাগুলির মধ্যে আসলে মিশে গেছে সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ববাদের বিরুদ্ধে, সমাজের নানা অসঙ্গতির প্রতি তীব্র তীক্ষ্ণ শেষ। এখানে তাই সত্য ও মিথ্যাও মিশে যায়। কারণ সত্য ঠিক কি এবং কতটা, তা কি নির্ধারণ করা সম্ভব? আবার শাস্ত্রেই আছে, যে সত্য কারো অপকার করে তা না বলাই ভালো। অতএব সত্যের এটাও একটা চেহারা। ‘মসোলিয়মে’ও

তাই দেখি সত্য প্রকাশিত হলে কেউ হাসতে পারে না, তৈরি হয় এক অশ্রু আর্দ্র-করণ পরিবেশ—

“দাঁড়কাকও কাঁদতে কাঁদতে লুটিয়ে পড়ে। গোলাপ মল্লিক কাঁদতে থাকে। তিনজন ফ্যাডাডুও কাঁদতে থাকে। এত কান্নায় লেখকও বেসামাল। পাঠক, বিশ্বাস করুন বা নাই করুন, লেখকও এখন কাঁদছে।”^{৩০}

এভাবে লেখক নিজেও ঢুকে পড়েন উপন্যাসের বয়ানে। বজরা ঘোষের মতো স্বনামে সশরীরে না প্রবেশ করলেও লেখকের এভাবে প্রবেশ বেশ ‘নতুন একটি মাত্রা সংযোজিত করে’ বৈকি। সরকারি বয়ান পরম্পরাকে ধ্বংস করার জন্যেই বোধহয় এবার রচিত হয় ‘ভদি-অভিধান’। কারণ শব্দেও তো লুকিয়ে থাকে প্রতাপের কুৎকৌশল। তাই শব্দকে নতুনভাবে ভেঙে গড়ে নিয়ে রচিত হতে থাকে পুরন্দর ভাটের ‘ভদি-অভিধান’। আর তার কবিতাগুলো তো আছেই যাদের অবজ্ঞা করা কার সাধ্য—

“শুধু পরা ব্ল্যাক বেল্ট

আর কিছু নাই

আয়নায় করিতেছে

তুমুল লড়াই”^{৩১}

আরেকটা বিষয় লক্ষণীয়, ‘ফ্যাডাডুর বোম্বাচাকে’ তুমুল হট্টগোল সৃষ্টি করা ফ্যাডাডু ‘কাঙাল মালসাটে’ ভদ্র চোক্তার বাহিনীর অন্যতম নলেনের হাতে প্রায় ধরাশায়ী হয়ে গেছে। আবার— ‘মসোলিয়মে’ এসে কবি পুরন্দর ভাটকে রীতিমতো ভড়কে দিয়ে প্রবেশ ঘটেছে ‘খানদানি খানকি’ সহ সাহিত্য সম্রাট বজরা ঘোষের। দণ্ডবাসের সমান ক্ষমতাদারী তার বন্ধু স্থানীয় বনবেড়ালেরও প্রবেশ ঘটেছে এ উপন্যাসে। অর্থাৎসব মিলিয়ে আমরা বলতে কি পারি না যে নবাবরূপে কোনো নির্দিষ্ট দল বা ব্যক্তির হাতে বিদ্রোহের সব ক্ষমতাটুকু দিতে চান না। কারণ ভয় থাকেই কখন কে ক্ষমতার সবটুকু ‘আলুর চপের মতো’ খেয়ে নেবে। তাই চলতে থাকে ক্ষমতার এই বিকেন্দ্রীকরণ। সাতাত্তর পাতার এ উপন্যাসে এ ভাবে নবাবরূপে বিচিত্র উৎসজাত অন্তর্ভবনের সূক্ষ্ম ও অরৈখিক সমাবেশকে ব্যবহার করেছেন সুকৌশলে। হুজুগে বাঙালি জাতির চরিত্র চিত্রণও বাদ যায় না। মমি বেরোনোর খবরের প্রতিক্রিয়া দেখাতে গিয়ে বাঙালির এই চরিত্র বৈশিষ্ট্য লেখক তুলে ধরেন—

“খবর কি করে কয়েক মিনিটের মধ্যে শহরের এমুড়ো থেকে পাঁচমাথা হয়ে ও মুড়োয় পৌঁছে দেওয়া যায় সে সম্বন্ধে গণেশের দুধ প্যাঁদানোর বেলাতেই কলকাতা ট্রায়াল দিয়ে রেখেছিল। মমির বেলাতে সেই ট্রায়ালের সুফল পাওয়া গেল। বস্তি এলাকায় শুরু হয়ে গেল মমি-ডাঙ্গ। মোড়ে মোড়ে মমি-বিরিয়ানি ও মমি-রোলার দোকান বসে গেল। ভদ্রলোকদের পাড়ায়ও অন্যথা হল না। চল্লিশ কিলো ওজনের এক-একটা বাচ্চা স্কুল থেকে ফিরে ম্যাগি গিলতে গিলতে বায়নাক্সা জুড়ে দিল— মমি দেখব, মামি, মমি দেখব!”^{৩২}

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হল শ্রেণিগত বৈষম্য থাকলে বাঙালির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য মোটামুটি— ভাবে এক, প্রকাশে হয়তো একটু রকমফের হতে পারে। তাই- ‘বস্তি এলাকা এবং ভদ্রলোকদের পাড়া’ দু’জায়গাতেই এই ঘটনাটি আলোড়ন তোলে।

আখ্যানবিহীন এই আখ্যান শেষ হচ্ছে কাহিনির হালকা এবং সূক্ষ্ম সূতোটুকু গুটিয়ে নিয়ে। ভদ্র যে কারণে মমি হওয়া, যার জন্যে বনবেড়ালের উত্তরবঙ্গ থেকে কলকাতায় আসা, বেগম জনসন, দাঁড়কাক, ফ্যাডাডু ও চোক্তার বাহিনীর তৎপরতা সেই কারণের যথেষ্ট ফলবান কার্যে রূপান্তরিত হওয়ার পর অর্থাৎ যথেষ্ট পরিমাণে হুজুতি বাধিয়ে, নাম কামিয়ে এবং মাল কামিয়ে (যাতে করে এর পরে নাইদার দা চোক্তারস্ নর দা ফ্যাডাডুজ প্লাস যারা আমাদের দলের— কারও যেন কোনো ফিন্যান্সিয়াল ডিফিকালটি না হয়।) পুরো দল

উত্তরবঙ্গ অভিমুখে যাত্রা করছে। এই যাত্রায় আখ্যানটির সমাপ্তি। একে সমাপ্তি বলব নাকি আরো একটা ঘটনার আরম্ভ বলব। নিটোল কাহিনি ও সূচনা-সমাপ্তি বিহীন আজকালকার উপন্যাসেও ছোটগল্পের সেই 'শেষ হইয়া হইল না শেষ'-এর আমেজ জড়ানো থাকেই। আর 'কাঙাল মালসাটে'র পরে 'মসোলিয়ম' পেয়ে পাঠকের প্রত্যাশা কি রয়ে যায় না এরপরের হাস্যামা উত্তরবঙ্গে। যদিও প্রতিশ্রুতি রয়েছে বেগম জনসনের কাছে না কি পাঠকের কাছেই—

“মাত্র তো মাস দুয়েক। তারপরেই তো সবাই আবার ফিরে আসবো।”

তবু প্রত্যাশা জাগে দুমাসের কথা কিছুই কি জমবে না ফ্যাতাডু আর চোজারদের। আর নবাবরূপ উপন্যাসের শেষে এসেও তার ব্যঙ্গের চাবুক যে নামিয়ে রাখেননি তার প্রমাণ দেন এইভাবে লিখে—

“দুমাসে লোকে মমির কথাও ভুলে যাবে। তারপর, যে কে সেই।”

তাই তো আমরা সবই ভুলে যাই। নকশালদের আন্দোলন, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আত্মত্যাগ, তাজ হোটেলে সন্ত্রাসবাদীদের আক্রমণ, কালাহান্দির কংকালসার শিশু অথবা পাঠশালার সেই শিক্ষক-শিক্ষিকা, স্কুলের সবচেয়ে ভালো বন্ধুটি কিংবা অনেকগুলো কথা যেগুলো 'রাখব' বলেছিলাম। আর তাই বাক্যটি পড়ে সত্যজিৎ রায়ের লালমোহন গাঙ্গুলীর মতোই বলে শেষ করতে ইচ্ছে করে

- “থ্যাঙ্কস ফর দ্যা খোঁচা।”

তথ্যসূত্র:

1. Holquist, Michael. Bakhtin and his world: Dialogism. Routledge, London, 2002. page-111.
2. সরকার, নীলকমল সম্পাদিত। (সংখ্যাটির সম্পাদনা- রাজীব চৌধুরী), অক্ষরেখা। ফেব্রুয়ারি ২০০৮, পৃ. ৯২।
3. ভট্টাচার্য, তপোধীর। আখ্যানের সাতকাহন। অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, মেদিনীপুর ৭২১১০১, জানুয়ারি ২০০৫, পৃ. ২২।
4. তদেব, পৃ. ৮১।
5. ভট্টাচার্য, নবাবরূপ। মসোলিয়ম। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, জানুয়ারি ২০০৬/মাঘ ১৪১২, পৃ. ৫৮।
6. তদেব, পৃ. ৩৯।
7. ভট্টাচার্য, তপোধীর। আখ্যানের সাতকাহন। অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, মেদিনীপুর- ৭২১১০১, জানুয়ারি ২০০৫, পৃ. ৮০।
8. ভট্টাচার্য, নবাবরূপ। মসোলিয়ম। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, জানুয়ারি ২০০৬/মাঘ ১৪১২, পৃ. ১৮।
9. তদেব, পৃ. ৬০।
10. তদেব, পৃ. ৬৮।
11. তদেব, পৃ. ৬৮।
12. তদেব, পৃ. ১৬।
13. চৌধুরী, কমল সম্পাদিত। স্বাধীনতা ৫০ পেরিয়ে। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, জানুয়ারি ১৯৯৯/মাঘ, ১৪০৫, পৃ. ৩৩৫।
14. ভট্টাচার্য, নবাবরূপ। মসোলিয়ম। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, জানুয়ারি ২০০৬/মাঘ ১৪১২, পৃ. ২৬।

১৫. ভট্টাচার্য, তপোধীর। উপন্যাসের সময়। এবং মুশায়েরা, কল-৭৩, জানুয়ারি ২০০৯/পৌষ ১৪১৫, পৃ. ৪৫।
১৬. ভট্টাচার্য, নবারুণ। মসোলিয়ম। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, জানুয়ারি ২০০৬/মাঘ ১৪১২, পৃ. ৪৪-৪৫।
১৭. তদেব, পৃ. ৬১।
১৮. তদেব, পৃ. ৫২-৫৩।
১৯. তদেব, পৃ. ৪৬।
২০. ভট্টাচার্য, তপোধীর। উপন্যাসের সময়। এবং মুশায়েরা, কল-৭৩, জানুয়ারি ২০০৯/পৌষ ১৪১৫, পৃ. ১০৫।
২১. ভট্টাচার্য, নবারুণ। মসোলিয়ম। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, জানুয়ারি ২০০৬/ মাঘ, ১৪১২, পৃ. ৩৮।
২২. তদেব, পৃ. ৩৯।
২৩. ভট্টাচার্য, তপোধীর। আখ্যানের সাতকাহন। অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, মেদিনীপুর-৭২১১০১, জানুয়ারি, ২০০৫, পৃ. ১৩১-১৩২।
২৪. সরকার, নীলকমল সম্পাদিত। (সংখ্যাটির সম্পাদনা—রাজীব চৌধুরী), অক্ষরেখা। ফেব্রুয়ারি ২০০৮, পৃ. ২৯৮।
২৫. তদেব, পৃ. ৬৮।
২৬. তদেব, পৃ. ৩১৬।
২৭. ভট্টাচার্য, নবারুণ। মসোলিয়ম। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, জানুয়ারি ২০০৬/মাঘ ১৪১২, পৃ. ৪৭-৪৮।
২৮. তদেব, পৃ. ১৮।
২৯. তদেব, পৃ. ৩১।
৩০. তদেব, পৃ. ৩৪।
৩১. তদেব, পৃ. ৪৩।
৩২. তদেব, পৃ. ৫২।



উত্তরবঙ্গের সমাজ ও বনব্যবস্থাপনার পারস্পরিক সম্পর্ক: একটি সমীক্ষা

সলিল কুমার মুখার্জী, অধ্যক্ষ, বানিজ্য বিভাগ, সামসি কলেজ, মালদা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 31.12.2025; Accepted: 03.01.2026; Available online: 28.02.2026

©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

Abstract

This study examines the dynamic interrelationship between society and forest management in North Bengal, with particular emphasis on the role of forest-dependent communities and the performance of Joint Forest Management (JFM). Despite the relative abundance of forest resources in North Bengal compared to South Bengal, JFM initiatives in the region have shown limited and uneven success. Drawing upon secondary data, field-based studies, and institutional analyses, the paper challenges the dominant assumption that forest-adjacent communities are the principal agents of forest degradation. Empirical evidence indicates that local populations largely depend on non-timber forest products, dry biomass, and subsistence-level extraction practices that rarely contribute to large-scale deforestation. It also focuses on selected sites in Darjeeling and Jalpaiguri districts, analysing patterns of fuelwood dependence, forest condition, user groups, and institutional arrangements under different forest management regimes. The findings suggest that conflicts between communities and the Forest Department arise primarily from unequal access to benefits, exclusion of non-member users, and the short-term nature of incentives generated through JFM. The paper argues that the sustainability of participatory forest management depends on two critical factors: whether the benefits derived from participation exceed the costs borne by local communities, and whether such benefits are durable over time. So, the study concludes that successful forest conservation in North Bengal requires a more equitable distribution of forest-derived benefits, recognition of diverse user groups, and integration of livelihood security measures such as basic services, forest-based cottage industries, and eco-tourism. Only through addressing these socio-economic asymmetries can genuine community participation be ensured and long-term forest sustainability achieved.

Keywords: Joint Forest Management (JFM), Forest-Dependent Communities, Participatory Forest Governance, North Bengal, Sustainable Livelihoods

১৯৯০-২০০০ সালের মধ্যে প্রত্যেক বৎসর, প্রায় ৯.৪ মিলিয়ন হেক্টর বনসম্পদ হারিয়ে যাচ্ছে। বন ও বনভূমি সংরক্ষণ তাই একটি অপরিহার্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভারতের বনভূমি প্রধানতঃ তিনটি অঞ্চলে বিস্তৃত। উড়িষ্যার ছোটনাগপুর মালভূমি থেকে বিহার, মধ্যপ্রদেশ, পশ্চিমঘাট পর্বতমালার উত্তর-দক্ষিণপ্রান্ত এবং হিমালয় সন্নিহিত অঞ্চল। অতি প্রাচীনকাল থেকেই সমাজ ও বনজাত সম্পদের আদান প্রদানের একটি নিবিড় সম্পর্ক লক্ষ্য করা গেছে। শতকরা প্রায় ৬০ শতাংশ বনজাত সামগ্রী (Non Timber Forest product) মানুষ খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে থাকে। একটি সমীক্ষা (Malhotra *et.al.* 1991) থেকে দেখা গেছে যে ২১৬ টি পরিবারে

(তপশিলি জাতি ও উপজাতি) প্রায় ১২২ ধরনের গাছপালার ব্যবহার এবং তার মধ্যে বেশীর ভাগই (৪৪) খাদ্য হিসাবে, তার পর জ্বালানী (৩৯) এবং ঔষধী হিসাবে (১৮)। শতকরা প্রায় ৭০ শতাংশ গ্রামীণ ও শতকরা প্রায় ৫০ শতাংশ শহরবাসী রান্নার জ্বালানী হিসাবে বনসম্পদের উপর নির্ভরশীল (UNCED Report) সুতরাং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে, মানুষ বন ও বনসম্পদ-এর উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল এবং এই নির্ভরশীলতা আবার দীর্ঘস্থায়ী। এই গুরুত্বের কথা ভেবে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের নিয়ম নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে ও বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে (Annexure দেখুন) কিন্তু তা সত্ত্বেও দু'টো প্রশ্ন আজও আমাদের তাড়া করে যাচ্ছে- কিভাবে বন ও বনসম্পদ সংরক্ষণ করা যায়? এবং এই বন ও বনসম্পদ কার জন্য?

অনেক আলোচনার পর, আমাদের নিয়ম প্রণয়কগণ ধীরে ধীরে বিশ্বাস করতে শিখেছে যে, সংরক্ষণের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র সরকারিস্তরের যোগদানই যথেষ্ট নয়- পূর্ণ সাফল্যের জন্য বনভূমি নিকটবর্তী সমাজের প্রত্যক্ষ যোগদান জরুরি। (Malhotra and Poffenberger 1989, Poffenberger 1990) এবং দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর হিসাবে আমরা মনে করি, বনসম্পদ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সকলের অর্থাৎ সারা পৃথিবীর। এই লেখার মূল আলোচ্য বিষয় হল, প্রায়শই দেখা যায় বনবিভাগ ও শক্তি বিশারদগণ বনসম্পদ ধংসের জন্য বননিকটবর্তী সমাজকে দায়ী করে থাকেন। এই দোষারোপ কতদূর সত্য? এবং দক্ষিণবঙ্গ অপেক্ষা উত্তরবঙ্গে বন সম্পদের প্রাচুর্য সত্ত্বেও যৌথ বন ব্যবস্থাপনার (JFM) সফলতা আশাপ্রদ নয় কেন?

আলোচনার ক্ষেত্র:

হিমালয় সন্নিহিত উত্তরবঙ্গের দু'টি জেলা, দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি যেখানে বহুসংখ্যক মানুষ বন ও বন সম্পদের উপর নির্ভর করে জীবিকা অর্জন করে। এই দু'টি জেলায়, শতকরা প্রায় ১০ শতাংশ গ্রামীণ মানুষ কাঠ ও কাঠ সংশ্লিষ্ট ব্যবসার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। সপ্তাহে প্রায় ৭২০০০ টন কাঠ উত্তরবঙ্গের বাজারে কেনাবেচা হয়। (Ram Prasad 1999)

Table 2.1: Fuel Wood Dependence in Two Districts of North Bengal

District	Population (Million)	Forest Area (sq. km)	Forest as % of Total Area	% of Households Dependent on Fuel Wood
Darjeeling	1.3	1445	45.9	88
Jalpaiguri	2.8	1580	25.4	86

উপরের তালিকাতে এই দু'টি জেলার নির্ভরশীলতা দেখানো হয়েছে। ফলে খুব স্বাভাবিক কারণেই সাধারণ মানুষ ও বনবিভাগের মধ্যে প্রায়শই বনসম্পদের সঠিক ব্যবহার ও সংরক্ষণ নিয়ে বিবাদ দেখা যায়।

Table 2.2: Forest Condition of North Bengal

Site	Density	Mean DBH	Mean Height	Total Area	VOL FW m ³	Supply /Ha	FWOOD m ³	Demand/Ha	No. of User	FWDD/capita	Forest/capita
Lataguri	139	0.42	19.04	3963	2840071.88	716.65	1143.78	0.29	324	3.53	8765.65

Jayanti	300	0.32	17.7	10123	8475159.67	837.22	8958.30	0.88	1041	8.61	8141.36
Kalpokhri	472	0.21	9.59	382.9	119645.71	312.51	343.48	0.90	26	13.21	4601.76
Fapri	236	0.2	12.02	2847	524520.87	184.25	1812.83	0.64	976	1.86	537.42
Khuntimari	48	0.56	21.61	2500	1263577.79	505.43	9350.19	3.74	1400	6.68	902.56
Bungkulung	178	0.15	11.73	467.8	35992.28	76.94	2125.23	4.54	632	3.36	56.95
Rampuria	187	0.23	11.26	178.1	30936.44	173.66	2226.24	12.50	175	12.72	178.78
Dabgram	62	0.55	25.97	577.5	438725.97	759.70	35611.64	61.67	1504	23.68	291.71
Niamti	337	0.21	13.25	3629	1110220.60	305.93	108629.66	29.93	3388	32.06	327.89
Simanatar	40	0.12	7.74	257.8	16680	6.52	1323.34	5.13	156	8.48	10.77
Poobong	27	0.2	9.13	118.1	1843.57	15.60	4469.17	37.83	606	7.37	3.04

Sulkapara	96	0.3	12.7	1443	249322.32	172.73	632627.46	438.29	1769	357.6 2	140.94
-----------	----	-----	------	------	-----------	--------	-----------	--------	------	------------	--------

Source Create Database

উপরের তালিকাতে উত্তরবঙ্গের ১২টি স্থানের সমীক্ষা প্রতিবেদন দেওয়া আছে। দুইটি স্থান ছাড়া, প্রায় সবকটিতেই মাথা পিছু বনসম্পদ যথেষ্ট বেশী। বন ও বনসম্পদের প্রতি নির্ভরশীলতার চিত্রটিও পরিষ্কার। সুতরাং এই পরিস্থিতিতে কন সন্নিহিত সমাজকে বনসম্পদ ধ্বংসের উল্লেখযোগ্য কারণ হিসাবে দেখার কোন কারণ নেই। তাছাড়া কনসন্নিহিত সমাজ সাধারণতঃ গুরু পাতা, ডালপালা, ঝোপঝাড় ইত্যাদির দ্বারা তাদের জ্বালানী যোগান মিটিয়ে থাকে, যা কখনই বন ধ্বংসের কারণ হতে পারে না। বর্তমানে যৌথ বনব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কিছু মাত্র কর্তব্য পালনের বিনিময়ে স্থানীয় মানুষ বিভিন্ন ধরনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সুবিধা পেয়ে থাকে। উত্তরবঙ্গের যৌথ বনব্যবস্থাপনার বর্তমান প্রেক্ষাপট নীচে দেওয়া হল।

Table 2.3: Site Matrix

Site	Forest Type	Location	Distance from Market	Management Type
Nimati	Tiger Reserve	Plains	Near	Wildlife
Jainti	Tiger Reserve	Plains	Far	Wildlife
Sulkapara	National Park	Plains	Near	Wildlife
Lataguri	National Park	Plains	Near	Wildlife
Salugarah	Reserve Forest	Plains	Near	Territorial
Dabgram	Reserve Forest	Plains	Far	Territorial
Khutimari	Reserve Forest	Plains	Near	Territorial
Kalpokhri	National Park	Hills	Far	Wildlife
Simanatar	Reserve Forest	Hills	Near	Territorial
Bunkulung	Reserve Forest	Hills	Far	Territorial
Rampuria	Wildlife Sanctuary	Hills	Far	Wildlife
Poobong	Reserve Forest	Hills	Near	Territorial

Table 2.4: User Groups in Relation to JFM

User Group / Institution	Site	Status of JFM
Nimati-Domohani FPC	Nimati	Registered, functional
Nimati-Domohani (Non-FPC users)	Nimati	Users are non-members
Rava FPC	Nimati	Registered, defunct
N. Jhora Tea Garden	Nimati	Users are non-members
Jayanti EDO	Jainti	Unregistered, functional
Jayanti EDO	Jainti	Registered, functional
Sulkapara EDO	Sulkapara	Registered, functional
Tondu Tea Garden	Sulkapara	Users are non-members
Bichabhanga EDO	Lataguri	Registered, functional
Fafri FPC	Salugarah	Registered, defunct
Jaldumur FPC	Dabgram	Registered, defunct
Kalpokhri User Group	Kalpokhri	Non-JFM user group
Simanatar User Group	Simanatar	Non-JFM user group

Bungkulung FPC	Bungkulung	Registered, functional
Bungkulung (non-FPC users)	Bungkulung	Users are non-members
Poobong FPC	Poobong	Unregistered, functional
Rampur EDC	Rampur	Registered, functional
Madhya Salbari FPC	Khutimari	Registered, defunct

অনেকেরই মনে একটা প্রশ্ন দেখা যায় যে, দক্ষিণবঙ্গে যৌথ বন ব্যবস্থাপনা সফল কিন্তু উত্তরবঙ্গে অন্যরকম কেন। কারণ হিসাবে আমরা বলতে পারি যে, উত্তরবঙ্গের বনসম্পদের প্রাচুর্য্যতা দক্ষিণবঙ্গের তুলনায় বেশী, বিশেষত যখন যৌথ বনব্যবস্থাপনা শুরু করা হয়েছিল এবং দ্বিতীয়তঃ এই ব্যবস্থাপনার দ্বারা উদ্ভূত লাভ দীর্ঘস্থায়ী ছিল না- যা একটি সফল বন ব্যবস্থাপনার অপরিহার্য অঙ্গ।

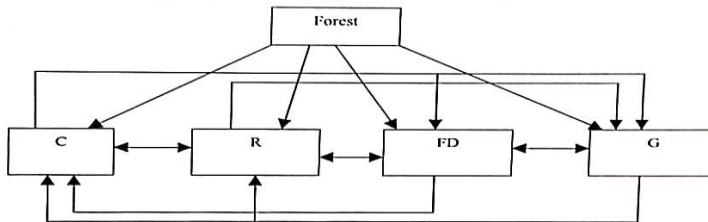
সমস্যার প্রেক্ষাপট:

দক্ষিণবঙ্গের তুলনায় উত্তরবঙ্গের যৌথ বন ব্যবস্থাপনার বিফলতার বিভিন্ন কারণ আছে। তবে আসল কারণ নিহিত আছে বন সম্পদ ও তাঁর সঙ্গে জড়িত সমস্ত স্বার্থ সংশ্লিষ্ট পক্ষের পাওয়া না পাওয়ার অসমতার মধ্যে। স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষকে মোটামুটি চার ভাগে বিভক্ত করলে দেখা যায় (Chakraborty et al 2001)

- যে সমাজ জীবনধারণের জন্য প্রত্যক্ষভাবে বন ও বনসম্পদের উপর নির্ভরশীল (C)
- উপরোক্ত সমাজ ছাড়া, সমাজের যে অংশ পাড় থাকল (R)
- বনবিভাগ (FD)
- সরকার (G)

এদের মধ্যে পারস্পরিক রেকার্প নিম্নরূপ।

Flow of incentives across the stakeholders



এবং দেনা-পাওয়ার পারস্পরিক বিনিময় চিত্রটি নিম্নরূপ।

		BENEFITS				
		C	R	FD	G	F
S E R V I C E S	C	0	Employment, non-forest consumption goods.	Employment, technical services	grants	De facto de jure benefits
	R	Labour	0	Forestry resources	Grants	Intangible environment benefits
	FD	Labour & protection	Revenue	0	Grants	Resources
	G	Tax	Tax	Revenue	0	Intangible environment benefits
	F	Protection	-----	-----	-----	0

উপরোক্ত বিনিময় ব্যবস্থার মধ্যে থেকেও দেখা গেছে, বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই 'C' বঞ্চিত হয়েছে। ফলস্বরূপ দেখা গেছে, প্রাকৃতিক ও বন সম্পদে সমৃদ্ধ অঞ্চলের জনবসতিগুলো নিজেরা সম্পদহীন। এখন দেখা যাচ্ছে, যৌথ বন ব্যবস্থাপনা সফলতার জন্য দু'টো বিষয়ের উপর নজর দিতে হবে। প্রথমতঃ সমাজের প্রত্যক্ষ যোগদানের ফলে উদ্ভূত লাভ তাদের যোগদানের ফলে উদ্ভূত মূল্যের থেকে বেশী কিনা এবং দ্বিতীয়ত, এই লাভ দীর্ঘস্থায়ী কিনা?

দু'টো প্রশ্নেরই উত্তর যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে সমাজ থেকে প্রত্যক্ষভাবে যোগদান পাওয়া যেতে পারে, যা কিনা যৌথ বন ব্যবস্থাপনার সফলতার জন্য জরুরী, কারণ প্রত্যক্ষ যোগদানের জন্য উদ্ভূত নতুন পরিস্থিতি তে যে সুবিধা আগে শুধু শুধুই পাওয়া যেত, তা আর পাওয়া যায় না।

উপসংহার:

সুতরাং স্বতস্ফূর্তভাবে সমাজের প্রত্যক্ষ যোগদানের জন্য অনেক ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া দরকার, এবং সেগুলি প্রত্যেকটি সমাজের স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী চাহিদা মেটাতে সক্ষম হওয়া দরকার। যৌথ বন-ব্যবস্থাপনা সেখানেই সফল যেখানে বিভিন্ন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট যোগদানকারীদের মধ্যে চাহিদা ও সম্পদ বন্টনের মধ্যে সমতা আনতে সফল হয়েছে। সমাজের স্বতস্ফূর্ত যোগদান অনেকটাই তাঁদের অর্থনৈতিক প্রতিদান ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর নির্ভরশীল। ফলে প্রথমেই দেখতে হবে, সমাজের যে মৌলিক চাহিদাগুলো আছে যেমন, পানীয় জল, স্বাস্থ্য, খাদ্য, বাসস্থান প্রভৃতি পূরণ হয়েছে কি না- তা না হলে সেগুলোর প্রতি নজর দেওয়া, তারপর পরিকাঠামোগত উন্নয়ন, বনজাত সম্পদ নির্ভর কুটীরশিল্প স্থাপন, বন নির্ভর পর্যটন শিল্পের বিকাশ ইত্যাদির মাধ্যমে সমাজ ও জাতীকে বনসম্পদ সংরক্ষণের জন্য প্রত্যক্ষ যোগদান এর জন্য আকৃষ্ট করা যেতে পারে। এবং সেখানেই যৌথ বনব্যবস্থাপনার সফলতার নির্ভর করে আছে।

References:

1. Agarwal, Bina. *Cold Hearths and Barren Slopes: The Fuel Wood Crisis in the Third World*. Zed Books, 1986.
2. Arrow, Kenneth J. *Social Choice and Individual Values*. 2nd ed., Yale UP, 1963.
3. Aziz, A., and D. D. Arnold, editors. *Decentralized Governance in Asian Countries*. Sage Publications, 1996, pp. 13-33.
4. Blair, Harry. "Social Forestry: Time to Modify Goals?" *Economic and Political Weekly*, vol. 21, no. 30, 1986, pp. 1317-1321.
5. Chakrabarti, Malini. "Towards an Operational Definition of Sustainability." *Poverty and Sustainable Development*, seminar paper, UNESCO Chair, University of Montesquieu-Bordeaux IV, 22-23 Nov. 2001.
6. Chakrabarti, M. R., R. Mukherjee, and Atanu Sarkar. "Joint Forest Management in North Bengal, India: Conditions for Institutional Sustainability." Paper accepted for the *XII World Forestry Congress*, Quebec, Sept. 2003.
7. CREATE. "Heterogeneity and Collective Action: Evidence from Joint Forest Management in North Bengal." Paper presented at the IFRI Network Meeting, Nairobi, 2002.
8. Gadgil, Madhav, and Ramachandra Guha. *This Fissured Land: An Ecological History of India*. Oxford UP, 1993.
9. Gulati, A. K. "Community Forestry or Social Forestry for Rural Development: A Critical Review." *The Indian Forester*, vol. 116, no. 9, 1990, pp. 687-692.
10. Jeffery, Roger, and Nandini Sundar, editors. *A New Moral Economy for India's Forests?* Sage Publications, 1999.
11. Kothari, Ashish, et al., editors. *People and Protected Areas*. Sage Publications, 1996.
12. ---. *Community and Conservation*. Sage Publications, 1998.
13. Malhotra, K. C., and Michael Poffenberger. *Forest Regeneration through Community Protection: The West Bengal Experience*. Ford Foundation, 1989.
14. Malhotra, K. C., et al. "Role of NTFPs in Village Economy: A Household Survey in Jamboni Range, Midnapore District, West Bengal." Institute for Biological Research and Development, 1991. Mimeograph.
15. Mukherjee, R., and Atanu Sarkar. "Individual Choice and Sustainability of Participation: Reflections from Joint Forest Management in North Bengal." Paper presented at the National Seminar, Tufangang Mahavidyalaya, 24-25 Sept. 2002.

16. Mukherjee, Salil Kumar, and R. Mukherjee. "Community Development through Participation in Forest Management: A Study of the Hill-Terai Region of North Bengal." *Xavier Research Journal*, vol. 2, no. 1, Jan.-Apr. 2003.
17. Poffenberger, Michael. "Forest Management Partnerships." *Regenerating India's Forests*, workshop on sustainable forestry, Ford Foundation, 1990.
18. Ram Prasad, P., P. Bhattacharjee, and B. Joshi. "Fuelwood Collection and Trade as a Survival Strategy in North West Bengal." *Wood Energy News*, vol. 14, no. 2, 1999.

Annexure

Chronology of Key Policies and Laws Concerning Conservation of Forest Biodiversity

Year	Policy/ Law/ Event	Significance / Description
1848	Timber Ordinance No. 24	Regulated the felling and removal of timber from Crown and private lands.
1885	Forest Ordinance No. 10	Provided for the declaration of reserved forests and the protection of forest produce.
1907	Forest Ordinance No. 16	The primary legislation for the management and protection of forests and timber.
1929	First Authoritative Fores Policy Statement	The first formal declaration of national objectives for forest management.
1937	Fauna & Flora Protection Ordinance No. 2	Established the legal framework for protecting wildlife and their habitats.
1944	Amendment Act No. 44	Legislative update to conservation or forest management frameworks.
1953	National Forest Policy	Focused on scientific management, forest protection, and timber self-sufficiency.
1964	Amendment Act No. 1	Legislative update to existing conservation laws (likely FFPO).
1969	UNESCO Biological Programme	Integration of international standards for biological research and conservation.
1970	Amendment Act No. 49	Updated the Fauna & Flora Protection Ordinance (FFPO).
1970	UNESCO Man and Biosphere (MAB) Programme	Focus on sustainable development and biodiversity conservation.
1975	Mahaweli Environment Project	Mitigated the environmental impacts of the Mahaweli development project.
1982	National Heritage Wilderness Areas Act No. 3	Preliminary steps toward identifying and protecting unique wilderness areas.
1988	National Heritage Wilderness Areas Act No. 3	Provided for the preservation of unique ecosystems (e.g., Sinharaja Forest).
1990	National Policy for Wildlife Conservation	Focused on habitat protection and introduced a logging ban in natural forests.
1993	Amendment Act No. 49	Significant update to FFPO, introducing Marine Reserves and Buffer Zones.
1995	National Forest Policy	Shifted focus toward participatory management and biodiversity conservation.



‘অভিজ্ঞানশকুন্তলম্’-নাটকে পরিবেশভাবনা ও কালিদাস

নীলিমা সরকার, সহকারী অধ্যাপিকা, সংস্কৃত বিভাগ, সামসী কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 23.12.2025; Accepted: 03.01.2026; Available online: 28.02.2026

©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

Abstract

The intimate bond between life and the abiotic elements of the environment – such as light, heat, air, and humidity – is undeniable. It is through the proper coexistence and balance of these elements that vital life energy has manifested on Earth, visibly embodied in plants and animals. The existence of plants and animals depends on soil, water, light, air (including oxygen and carbon dioxide), and food. Plants produce food with the help of sunlight, water, soil, and carbon dioxide released by animals. On the other hand, animals carry out respiration using the oxygen emitted by plants and also depend on plants as a source of food.

Thus, plants and animals are mutually bound to each other and to abiotic elements in a relationship of equilibrium. Even the slightest disturbance in this balance renders the course of life vulnerable. In modern civilization, empowered by science and advanced technology, we – so-called civilized beings – have attempted to dominate nature in pursuit of artificial comfort, and in return have handed over to it the authority to determine the very assurance of our existence.

The poet of nature, Kalidasa, through his portrayal of nature’s social ecology, advocated the protection of nature and the maintenance of social balance. Through my research paper, a modest attempt has been made to echo this celebration of the environment.

Keywords: Life, Energy, Love, Universe, Sanctuary

পরি উপসর্গ পূর্বক বিশ্ খাতুর উত্তর ঘঞ প্রত্যয় যোগে ‘পরিবেশ’ শব্দটি নিষ্পন্ন হয়। যার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ‘বেষ্টন’ বা ‘পরিবৃতি’ অর্থাৎ, যা কিছু দ্বারা এই দৃশ্যমান জগৎ পরিবৃত্ত বা বেষ্টিত তাকেই বলে পরিবেশ। যে বেষ্টনীর মধ্যে একদিকে রয়েছে প্রাণী ও উদ্ভিদ থেকে শুরু করে ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক প্রভৃতির মত সজীব উপাদান অন্যদিকে আলো, বাতাস, জল, মাটি প্রভৃতির মত অজীব বা জড় উপাদান। পরিবেশ বিজ্ঞানের মতানুসারে- “একটি জীবের পরিবেষ্টক এবং প্রভাব বিস্তারকারী সজীব এবং জড় উপাদানের মোট সমষ্টি বা যোগফলকে ঐ জীবের পরিবেশ বলা হয়।” সজীব উপাদান অর্থাৎ, জীবনের বিকাশ এবং তার অস্তিত্ব সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে অজীব বা জড় উপাদানগুলির জীবনের প্রতি অনুকূল গুণগত ও পরিমাণগত মানের উপর এবং তাদের পারস্পরিক সূক্ষ্ম সমতার উপর। এই উপাদানগুলির গুণগত ও পরিমাণগত মাত্রার এবং সমতার তারতম্য ঘটলে স্বাভাবিকভাবেই জীবন বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়, দেখা দেয় তার অস্তিত্বের সংকট। এমতাবস্থায় জীবন-ধারাকে নিরবচ্ছিন্ন রাখতে পরিবেশগত আনুকূল্য বজায় রাখাটা অত্যাবশ্যক হয়ে ওঠে।

সত্যি আমরা আজ পরিবেশের এমন এক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে অবস্থান করছি যেখানে দাঁড়িয়ে ভবিষ্যত দ্রষ্টারা পৃথিবী ধ্বংসের দিন ঘোষণা করলে বিজ্ঞানীরাও আর তাকে বাতুলতামাত্র বলে অনায়াসে উপেক্ষা করতে সাহস করছেন না। কারণ নির্দিষ্ট দিনক্ষণটুকু বাদ দিয়ে পূর্বঘোষিত সেই বিপর্যয়ের অনুকূলে এমন কিছু সম্ভাব্য কারণ তারা দেখতে পাচ্ছেন যেগুলিকে তারা অশনিসংকেত বলেই মনে করছেন। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলির নিরন্তর পেট্রোল ও কয়লার অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রাকে ত্বরিত গতিতে এতটাই বৃদ্ধি করে চলেছে যে, এই ক্রমবর্ধমান তাপমাত্রার দ্রুত প্রদর্শনে ভয়ভীত বিজ্ঞানীরাও। ২০০৯-এ রাষ্ট্রসংঘের ঘোষণা অনুযায়ী ‘গ্রীণ হাউস এফেক্ট’, পৃথিবীবাসীর নিকট আজ অতি পরিচিত এক শব্দবন্ধ। এর একবিংশ শতাব্দীর শেষপর্যায়ে পৃথিবী পৃষ্ঠের তাপমাত্রা বেড়ে দাঁড়াবে ৩° সেলসিয়াস।^২ ভয়ঙ্কর পরিণাম সম্পর্কেও তারা অবগত। প্রমাদগুণে বিজ্ঞানীরা প্রতিটি দেশকে ‘গ্রীণ হাউস গ্যাস’ উৎপাদনের মাত্রা নির্দিষ্ট করে তা মেনে চলার প্রস্তাব দিয়েছেন, তথাপি তাকে নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হবে না।

বিজ্ঞানের পরিসংখ্যান বলছে তাপমাত্রার এইরূপ বৃদ্ধির হার অপরিবর্তিত থাকলে পরিবর্তন ঘটবে সমুদ্রপৃষ্ঠে। উষ্ণায়নের কারণে মেরুপ্রদেশে অতিমাত্রায় বরফ গলনের ফলে এতটাই বৃদ্ধি পাবে জলতলের উচ্চতা যে অপেক্ষাকৃত নিম্নস্থলভূমিগুলির অধিকাংশেরই নিশ্চিতভাবে সলিলসমাধি ঘটবে। এখানে উল্লেখ্য যে আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ তার মধ্যে একটি। বিশেষতঃ সুন্দরবন প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। বৈজ্ঞানিক তথ্য অনুসারে সুন্দরবনের ৯৬% বিলুপ্ত হয়ে যাবে।^৩ যাতে বিনষ্ট হবে একটি বিরাট অংশের বাস্তুতন্ত্র। পৃথিবীর অন্যান্য ভূখণ্ডের পট-পরিবর্তনটাও প্রায় একই প্রকার।

বিজ্ঞানীরা অনাগত যে বিপর্যয়গুলি উল্লেখ করেছেন সেগুলি আর সম্ভাব্য নয়, অবশ্যসম্ভাবী এবং অপ্রতিরোধ্যও। তথাপি তার ভয়াবহতার প্রকটতাকে কিছুটা প্রশমিত করার প্রয়াসে দূষণ রোধের জন্য বিজ্ঞানীরা বিবিধ উপায় নির্দেশ করেছেন। তাদের সতর্কবার্তায় বর্তমানে কিছুটা সক্রিয় হচ্ছে রাষ্ট্রগুলি। জনগণকে বিভিন্নভাবে সচেতন করা হয়েছে এবং রাষ্ট্রনৈতিক স্তরে গ্রহণ করা হয়েছে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রসংঘের মনুষ্য-পরিবেশ সম্পর্কিত অধিবেশনে “পরিবেশ-সুরক্ষা আইন” ঘোষিত হয় সেই ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতে আইনটি প্রণীত হয় ১৯৮৬ সালের ২৩শে মে। যা ভারতীয় সংবিধানের ২৫৩নং ধারার অন্তর্ভুক্ত। তাই বর্তমানের মানুষ যে পরিবেশ সম্পর্কে অল্পবিস্তর সচেতন তা বলাই যায়। বর্তমান থেকে যদি কিছুটা পিছনে তাকাই তাহলে দেখা যাবে সেই সময়ের মানুষের মধ্যেও পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। তৎকালীন সাহিত্যকীর্তির মধ্যেই তার সুস্পষ্ট পরিচয় মেলে। সে পরিচয় বাল্মীকি-ব্যাস প্রণীত রামায়ণ-মহাভারতে যেমন বিধৃত, সেই প্রকার তৎপরবর্তীকালীন কবিকীর্তিতেও সম্যকরূপে প্রস্ফুটিত হয়েছে। তন্মধ্যে মহাকবি কালিদাসের রচনাসমূহ সর্বাগ্রে উল্লেখ্য। বিশেষতঃ তাঁর অবিস্মরণীয় সৃষ্টি ‘অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্’^৪ নাটকে পরিবেশ সম্পর্কে কবির সচেতন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় সমধিক লক্ষ্য করা যায়। ‘অভিজ্ঞানশকুন্তলম্’ নাটকে মহাকবি কালিদাসের এই বিশিষ্ট পরিবেশ মনস্কতাকে অবলম্বন করেই আমার বর্তমান প্রবন্ধটি রচিত হয়েছে। নাটকের প্রারম্ভেই মঙ্গলাচরণদৃশ্যে কবিকৃত শ্লোকটি হল-

“যা সৃষ্টিঃ স্রষ্টুরাদ্যা বহতি বিধির্হৃতং যা হবি যা চ হোত্রী,
যে দ্বৈ কালং বিধত্তঃ, শ্রুতিবিষয়গুণা যা স্থিতা ব্যাপ্য বিশ্বম্।
যামাহুঃ সর্বভূতপ্রকৃতিরিতি যয়া প্রাণিনঃ প্রাণবন্তঃ,
প্রত্যক্ষাভিঃ প্রপন্নস্তনুভিরবতু বস্তাভিরষ্টাভিরীশঃ।।”^৫

এখানে জল, অগ্নি, যজমান, চন্দ্র ও সূর্য, বায়ু, আকাশ এবং পৃথিবী এই অষ্টমূর্তি বিশিষ্ট ঈশ্বরের নিকট সকলের রক্ষার্থে প্রার্থনা করা হয়েছে। আলাংকারিক বিধি অনুযায়ী এটি মঙ্গলাচরণ শ্লোক হলেও নিছকই মঙ্গলাচরণের

উদ্দেশ্যে এই শ্লোক রচিত হয়নি। একটু সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করলেই বোঝা যায় যে এর আপাত সরল এবং নাটকীয় তাৎপর্যবাহী অর্থের অন্তরালে রয়েছে অন্য এক গভীর অর্থ। জীবনের সৃজন, পালন ও রক্ষণে যে প্রকৃতিই প্রথম এবং শেষ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে এই বাস্তব সত্যটাকে তুলে ধরাই কবি তাঁর কর্তব্য বলে মনে করেছেন। এই কর্তব্য বোধই পরিবেশের প্রতি তাঁর গভীর সচেতনাবোধের পরিচয় বহন করে। সকলের সুরক্ষার নিমিত্ত আলো, বাতাস, আকাশ, মাটি প্রভৃতি অষ্টমূর্তিবিশিষ্ট ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনার মধ্য দিয়ে এই বাস্তব সত্যই তিনি ব্যক্ত করেছেন যে, জীবন একমাত্র প্রকৃতিরই আশীর্বাদধন্য। জীবনের নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় থাকা ঈশ্বর কোন অলৌকিক শক্তি নয়, তা প্রকৃতিরই শক্তিমাত্র।

বিপন্নতা সম্পর্কে কবিচিন্তা সদা সচেতন। আলোচ্য নাটকে বিভিন্নভাবে সেই সচেতনতার প্রকাশ ঘটেছে। প্রথম অঙ্কে আমরা দেখি শকুন্তলা ও তার দুই সখী অনসূয়া এবং প্রিয়ংবদা তপোবনাশ্রমের চারাগাছগুলিতে জল সিঞ্চনে রত। এই অবস্থায় প্রিয়ংবদা শকুন্তলাকে লঘুচ্ছলে বলছে-

“হলা শকুন্তলে, তত্ত্বতঃ অপি তাতকাশ্যপস্য আশ্রমবৃক্ষকাঃ প্রিয়তরেতি তর্কয়ামি যেন নরমালিকাকুসুমপেলরা অপি ত্বম্ এতেষাম্ আলবালপূরণে নিযুক্তা।”^৬

অর্থ হল- ওহে শকুন্তলা, পিতা কাশ্যপের নিকট তোমার অপেক্ষা আশ্রমের গাছগুলি অধিক প্রিয় বলেই মনে হচ্ছে। কারণ নবমালিকাকুসুমপেলব তোমাকেও গাছগুলির জল সিঞ্চনে নিযুক্ত করেছেন তিনি। এখানে কার প্রতি কণ্ঠ স্নেহাধিক্য প্রদর্শন করেছেন তা বিচার্য নয়। যে বিষয়টি এখানে লক্ষণীয় তা হল, কবি মানবজাতি অপেক্ষা উদ্ভিদকে তথা প্রকৃতিকে কোন অংশেই ন্যূন করে দেখেননি। উদ্ভিদের পরিচর্যা মানুষকে নিয়োগ করেছেন। প্রিয়ংবদার উক্তপ্রকার উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে শকুন্তলার উক্তিটিও এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয়, যা হল-

“ন কেবলং তাতনিয়োগ এব, অস্তি মে সোদরস্নেহোহপি এতেষু।”^৭

অর্থাৎ কেবল পিতা নিয়োগ করেছেন বলে নয়, এদের প্রতি আমারও সহোদর স্নেহ আছে। শকুন্তলার এই সংলাপে মানব ও প্রকৃতির অন্তর্বর্তী সীমারেখা মুছে গিয়ে রচিত হয়েছে আত্মীয়তার এক গভীর বন্ধন। এইরূপ নাটকের অন্যত্রও দেখা যায় কখনো শকুন্তলা লতাকে ভগিনীরূপে সম্বোধন করে, কখনো বা লতাভগিনীর নামকরণে ব্যাপ্ত হয়। গাছেদেরকে জল পান না করিয়ে সে জল পান করে না, সাজতে ভালোবাসলেও একটি পত্রও ছিন্ন করে না। গাছেদেরকেও মানুষের প্রতি অনুরূপ আচরণ করতে দেখা যায়। যেমন চতুর্থ অঙ্কে পতিগৃহে যাত্রার উদ্দেশ্যে তপোবন থেকে বিদায় নেওয়ার প্রাক্কালে শকুন্তলাকে বধূসাজে সাজাতে বনস্পতির প্রদান করে প্রয়োজনীয় প্রসাধনী, বস্ত্র, অলংকার। মহর্ষি কণ্ঠ বনবাসবন্ধু তথা বনস্পতিদের নিকট শকুন্তলাকে বিদায়ের অনুমতি প্রদান করতে বললে কুহুরবে সে সম্মতি জ্ঞাপিত হয়। শকুন্তলার বিদায়ে বিচ্ছেদ বেদনায় ব্যথাতুর বনলতা পত্ররূপ অশ্রুবিসর্জনের দ্বারা সমবেদনা জ্ঞাপন করে “অপসৃতপাণ্ডুপত্রা মুঞ্চন্ত্যশ্রুণীব লতাঃ।”^৮ এইরূপে কবি গাছ তথা প্রকৃতি ও মানবের মাঝে এক সুদৃঢ় আত্মীয়তার বন্ধন রচনা করতে প্রয়াসী হয়েছেন। কবির এই প্রয়াস নিছকই কাব্যিক সুষমা সৃষ্টিতে আপন উৎকর্ষতা প্রমাণের নিমিত্ত বলে মনে হয় না। আমি মনে করি উদ্ভিদ ও মানুষের মাঝে সম্পর্কের আত্যন্তিক নৈকট্য রচনার মাধ্যমে কবি এক মহৎকৌশলে প্রকৃতি তথা সবুজের সুরক্ষাকে কিছুটা সুনিশ্চিত করে নিতে চেয়েছেন।

সবুজ সংরক্ষণ ও সবুজায়ন মাত্র নয়, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার্থে প্রাণী সংরক্ষণও যে অপরিহার্য-এই বিষয়েও কবির সজাগ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় আমরা পেয়েছি তাঁর ‘অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্’ নাটকে। নাটকের শুরুতেই দেখা যায় মৃগয়াবিহারি রাজা দুষ্যন্ত রথারূঢ় অবস্থায় ধনুতে বাণ সংযোজন পূর্বক এক কৃষ্ণসার মৃগের পশ্চাদ্ভাবন করে শর নিক্ষেপে উদ্যত। ইত্যবসরে শুনতে পেলেন বৈখানসের অমোঘ নিষেধবাণী- “আশ্রমমৃগো হয়ং ন হন্তব্যো ন হন্তব্যঃ।”^৯ অর্থাৎ, এটি আশ্রমের মৃগ, মারবেন না, মারবেন না। শ্রবণমাত্র তৎক্ষণাৎ তিনি মৃগবধ

হতে বিরত হলেন। এই দৃশ্যপট নাট্য প্রয়োজনে সংযোজিত ঠিকই, কিন্তু নাট্যোদ্দেশ্য সিদ্ধিই এর একমাত্র লক্ষ্য নয়। এই দৃশ্যপটের নেপথ্যে কবিকণ্ঠে উদ্ঘোষিত হয়েছে এক কঠোর নিষেধাজ্ঞা, যা হল- শাসক হোক বা সাধারণ মানুষ, নিতান্ত বিনোদনের জন্য অহেতুক বন্যপ্রাণী হত্যায় কোন ব্যক্তিরই বিন্দুমাত্রও অধিকার নেই। এই আলোচনায় সপ্তমাস্কের একটি দৃশ্যাংশের উল্লেখ ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক। দৃশ্যটি এরূপ, হেমকূট পর্বতস্থিত মহর্ষি মারিচের তপোবনাশ্রম। আশ্রমে প্রবেশকালে মহারাজ দুষ্যন্তের দৃষ্টিগোচর হল এক বিস্ময়কর দৃশ্য। এক বালক মাতৃদুগ্ধ অর্ধেক পান করেছে এমন এক সিংহশাবকের কেশর ধরে পীড়ন করতে করতে বলপূর্বক আকর্ষণ করে নিয়ে চলেছে খেলার নিমিত্ত এবং তার দন্তগণনার জন্য তাকে মুখব্যাদন করতে বলছে। সিংহ শাবকটির উপর এইপ্রকার উৎপীড়ন দেখে বালকটির সঙ্গে থাকা এক তাপসী বালকটিকে পীড়ন ক্রিয়া থেকে বিরত হওয়ার জন্য বলছে “অবিনীত! কিং নঃ অপত্যনির্বিশেষানি সত্ত্বাণি বিপ্রকরোষিঃ?”^{১০} অর্থ হল, ওরে অবাধ্য! আমরা যে পশুগুলিকে নিজসন্তান তুল্য স্নেহ করি তাদের উপর কেন উৎপীড়ন করছ? এতৎ সত্ত্বেও সে নিবৃত্ত না হওয়ায় তাপসীরা তাকে ভয় ও লোভ প্রদর্শনের দ্বারা বিরত করার চেষ্টা করছে। এখানে নাটকীয় বক্তব্য যাই হোক না কেন একটি বিষয় সুস্পষ্টভাবে প্রতীত হয় যে, সংবেদনশীল কবির নিকট বন্যপ্রাণীদের প্রতি সামান্য বালকের উৎপীড়নও সমর্থনযোগ্য নয়।

বর্তমান সময়ে পরিবেশ ভাবনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হল অভয়াারণ্য। বন্যজীবনকে স্বাভাবিকতা ও সুরক্ষা প্রদান করতে রাষ্ট্রগুলির এ এক শুভ প্রচেষ্টা বলা যায়। কবিচিন্তেও অভয়াারণ্যের ধারণার ছায়াপাত ঘটেছে। তাঁর ‘অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্’ নাটকে চিত্রিত তপোবনের পারিপার্শ্বিক চিত্র, জীবনযাত্রা ও কার্যাবলী কবির এই ধারণার সুস্পষ্ট বাহক।

নাট্যকাহিনির শুরুর দিকে দেখা যায় বৈখানস কর্তৃক আমন্ত্রিত রাজা মালিনী নদীতীরস্থ কণ্ঠাশ্রমের অভিমুখে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে যে স্থানটিতে উপস্থিত হন সেই স্থানটিই যে তপোবন, এই প্রকার অনুমানের হেতু প্রদর্শনকল্পে সারণিকে বলছেন-

“নীবারাঃ শুকগৰ্ভকোটরমুখভ্রষ্টান্তরুগামধঃ,
প্রম্নিষ্ঠাঃ ক্ৰচিদিঙ্গুদীফলভিদঃ সূচ্যন্ত এবোপলাঃ।
বিশ্বাসোপগমাদভিন্নগতয়ঃ শব্দং সহন্তে মৃগা-
স্তোয়াধারপথাশ্চ বঙ্কলশিখানিষ্যন্দরেখাঙ্কিতাঃ।”^{১১}

অর্থাৎ শুকপাখীর গর্ভকোটর হতে তার মুখভ্রষ্ট নীবার ধান তরুতলে পড়ে আছে। মসৃণ উপলক্ষণগুলি সূচিত করছে যে সেগুলি ইঙ্গুদী ফল ভাঙতে ব্যবহৃত হয়, মানুষের সংস্পর্শে থাকার কারণে মানুষের প্রতি বিশ্বাস জন্মানোয় মৃগকুল রথের শব্দকে সহ্য করছে, ভীত হয়ে যুথভঙ্গ হচ্ছে না ইত্যাদি। দুষ্যন্ত কৃত এই উক্তিটিতে সুস্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে মৃগকুলের ভয়হীন, শঙ্কাহীন নিরুপদ্রব জীবনযাত্রা, পক্ষীকুলের অনুকূল বাসস্থান ও উপযুক্ত আহার সহযোগে নির্বিঘ্ন ও নিশ্চিন্ত জীবনযাপন। এদের জীবনের নিশ্চিন্ততা আরো ধরা পড়ে যখন কণ্ঠমুনি শকুন্তলার বিদায়কালে তার গতিরোধকারী মৃগশিশুর পরিচয় দিয়ে বলেন-

“যস্য ত্বয়া ব্রণবিরোপণমিঙ্গুদীনাম্,
তৈলং ন্যষিচ্যত মুখে কুশসূচিবিদ্ধে।
শ্যামাকমুষ্টিপরিবর্ধিতকো জহতি
সোহয়ং নপুত্রকৃতকঃ পদবীং মৃগস্তে।”^{১২}

অর্থাৎ, যার মুখ কুশের ডগায় ক্ষতবিক্ষত হলে তুমি ক্ষতনিবারক ইঙ্গুদীর তেল লাগাতে, শ্যামাধানের মুঠি খাইয়ে তুমি যাকে বড় করেছো সেই তোমার নিজ পুত্রসম মৃগ পথ আটকাচ্ছে। এইভাবে আরণ্যকরা মাতৃহীন মৃগশিশুকে

সযত্নে পালন করে আবার কখনো সন্তানসম্ভবা মৃগবধূর আসন্ন প্রসব নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়। আমরা আরও দেখি আশ্রম হতে বিদায় নেওয়ার সময় শকুন্তলা তার লতাভগিনী বনজ্যোৎস্না তথা নবমালিকার কথা বিস্মৃত হয় না, সে ঐ লতার পরিচর্যার ভার অর্পণ করে দুই সখীর হাতে- “হলা এষা দ্বয়োঃ যুবয়োঃ ননু হস্তে নিষ্কপঃ।”^{১৩} এই খণ্ডচিত্রগুলি হতে এই বিষয়টি সুস্পষ্ট হয় যে উদ্ভিদ ও প্রাণীর তথা বন্য জীবনের সংরক্ষণ ও সংবর্ধনের পক্ষে তপোবনরূপ পুণ্যভূমিই সর্বাপেক্ষা অনুকূল। পরিবেশ সম্পর্কিত এই বাস্তব উপলব্ধিই কবির তপোবন প্রীতির অন্যতম কারণ বলে আমার মনে হয়। তাই এই নাটকে তিনি একবার নয় একাধিকবার তপোবনের প্রেক্ষাপট রচনা করেছেন।

নাটকের ছত্রে ছত্রে বিবিধ প্রাকৃতিক পশুপ্রাণীর উল্লেখের মাধ্যমেও কবির প্রকৃতি সচেতনতা প্রকাশিত হয়েছে। প্রথমক্ষে হরিণ, ঘোড়া, শুকপাখী, ভ্রমর, হস্তী ইত্যাদি প্রাণীর উল্লেখ পাওয়া যায়। আবার পাটলপুষ্প, শিরীষ, নীলপদ্ম, নবমালিকা, আম্রমুকুল প্রভৃতি ফুলের অনবদ্য বর্ণনা সত্যিই মন হরণকারী। অন্যদিকে কুশঘাস, নীরব ধান গাছ, শমীগাছ, বকুলগাছ, সহকার বৃক্ষ, নবমালিকা লতা, ছাতিমগাছের বর্ণনা। এইভাবে দ্বিতীয় অঙ্কে শূকর, বাঘ, মহিষ, হরিণ, ভাল্লুক, মাছি প্রভৃতি পশুপ্রাণীর, আবার আকন্দফুল, নবমালিকা ফুল, বেতগাছ, মুথা ঘাস, কুরবর গাছের উল্লেখ পাওয়া যায়। তৃতীয় অঙ্কে পরিণ, শুকপাখি, ভ্রমর, পদ্মফুল, মাধবীলতা, কুমুদিনী ফুল, বেণামূল, কুশঘাস, বেতসলতা, মাধবীলতা, সহকার বৃক্ষ ইত্যাদির নিদর্শন লক্ষণীয়। চতুর্থ অঙ্কে কোকিল, হরিণশিশু, চক্রবাক পাখী, ময়ূর, নবমালিকা, কুমুদিনী, বকুলফুল, পদ্ম ফুল, নবমালিকা লতা, দুর্বীর শিস, নীবার ধান, সহকার বৃক্ষ, শ্যামাধান গাছ, ডুমুর গাছ, চন্দন গাছ। পঞ্চম অঙ্কে কোকিল, হস্তী, ভ্রমর, হরিণ, পদ্ম, কুন্দফুল, কুমুদ, প্রভৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়। নাটকের ষষ্ঠ অঙ্কে রাজহংস, বাঘ, হরিণ, পুরুষকোকিল, ভ্রমর, সর্প, কুকুর, রুইমাছ, শকুনি, হস্তী, মাছি, বিড়াল, ইঁদুর, আম্রমুকুল, শিরীষফুল, কমলিনী, কুরবক ফুল, আমগাছ, মাধবীলতা পাওয়া যায়। দৃশ্যকাব্যের অন্তিম অঙ্কে সিংহশিশু, চাতকপাখী, সর্প, ঘোড়া, হস্তী, মন্দার ফুল, সোনার পদ্ম, মন্দার বৃক্ষ, অশোক বৃক্ষ, চন্দন গাছ প্রভৃতির অনন্য উপস্থাপনা প্রকৃতির সৌন্দর্যকে জীবন্ত করে তুলেছে। তাই বলা যায়- কালিদাসস্য সর্বস্বমভিজ্ঞানশকুন্তলম্। বিশ্বচরাচরে বিশ্বভাবনায় পরিবেশচিত্তনে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন-

“নব বৎসরের কুঁড়ি, তারি একপাতে, বরষশেষের পক্ক ফল।

প্রাণ করে চুরি আর, তারি একসাথে প্রাণে এনে দেয় পুষ্টিবল।।

আছে স্বর্গলোক আর, সেই এক ঠাঁই, বাঁধা যেথা আছে মহীতল।

হেল যদি কভু থাকে, তুমি তবে তাই, ওহে অভিজ্ঞান-শকুন্তল।।”^{১৪}

কাব্যজগতে প্রকৃতি নানা ভূমিকায় অবতীর্ণ। কবির লেখনীতে কখনো সে নায়ক, কখনো নায়িকা, কখনো স্বতন্ত্র চরিত্র, কখনো বা বর্ণনা মাধুর্য সৃষ্টিতে অন্যতম উপকরণ হয়ে উঠেছে। প্রত্যেক কবিই তাদের কাব্যসরসতা প্রতিপাদন করতে কখনো না কখনো প্রকৃতিকে আশ্রয় করেছেন। মহাকবি কালিদাসও তার ব্যতিক্রম নন। তবে তিনি তাঁর কাব্যে বিশেষতঃ ‘অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্’-এ প্রকৃতিকে এক অন্য আঙ্গিকে উপস্থাপন করেছেন। যে উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে মহাকবির কবিসত্তাকে অতিক্রম করে প্রকাশিত হয়েছে এক পরিবেশ সচেতন বান্ধব-সত্তা। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যায়- অভিজ্ঞানশকুন্তলমে শকুন্তলা, দুষ্যন্ত, কণ্ঠমুনি, অনসূয়া-প্রিয়ংবদা প্রভৃতি চরিত্রের মত তপোবনপ্রকৃতিও একজন বিশেষ পাত্র। প্রকৃতিকে মানব করে তুলে তার মুখে বাক্যধ্বনির মধ্য দিয়ে তাকে এমন সজীব, এমন প্রত্যক্ষ, এমন ব্যাপক, এমন অন্তরঙ্গ করে তোলার অনন্য নিদর্শন সত্যিই অভূতপূর্ব।

তথ্যসূত্র:

- ১। পাল, ড. গৌতম। পরিবেশ ও দূষণ: পরিবেশ বিজ্ঞান। ৩য় সংস্করণ, দাসগুপ্ত অ্যান্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃ. ১৯।
- ২। চক্রবর্তী, শম্ভুনাথ সাংখ্যতীর্থ রচিত ও সম্পাদিত। মহাকাব্য নিবন্ধাবলী। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, পৃ. ৪১০।
- ৩। তদেব, পৃ. ৪১০।
- ৪। কালিদাস। অভিজ্ঞান শকুন্তলম্। সম্পাদনা ড. সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী, চতুর্থ সংস্করণ, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, পৃ. ১৩৪।
- ৫। 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্', ১ম অঙ্ক, শ্লোক-১।
- ৬। 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্'- নাটক, প্রথমাঙ্ক।
- ৭। 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্'- নাটক, প্রথমাঙ্ক।
- ৮। 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্', চতুর্থ অঙ্ক, শ্লোক-১২।
- ৯। 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্'- নাটক, প্রথমাঙ্ক।
- ১০। 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্'- নাটক, সপ্তম অঙ্ক।
- ১১। 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্'- নাটক, প্রথমাঙ্ক, শ্লোক-১৪।
- ১২। 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্'- নাটক, চতুর্থ অঙ্ক, শ্লোক-১৪।
- ১৩। 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্'- নাটক, প্রথমাঙ্ক।
- ১৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক গ্যটে কৃত শকুন্তলা প্রশস্তির অনুবাদ।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. কালিদাস। 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্'। সম্পাদনা ড. সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী, তৃতীয় সংস্করণ, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ১৪ই মার্চ, ১৯৯৬।
২. কালিদাস। 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্'। সম্পাদনা আচার্য্য রাম নারায়ণ, বোম্বাই, ১৯৪৭।
৩. কালিদাস। 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্'। সম্পাদনা জীবানন্দ বিদ্যাসাগর, পঞ্চম সংস্করণ, কলকাতা, ১৯১৪।
৪. কালিদাস। 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্'। সম্পাদনা এ. বি. গজেন্দ্রগদকর, সপ্তম সংস্করণ, দি পপুলার পাবলিশিং হাউস, সুরাট, ১৯৬২।
৫. পাল, গৌতম ডঃ। পরিবেশ ও দূষণ: পরিবেশ বিজ্ঞান। তৃতীয় সংস্করণ, দাশগুপ্ত অ্যান্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০১০।
৬. মুখোপাধ্যায়, আনন্দদেব ও চন্দ, বিনয় সম্পাদিত। পরিবেশ প্রসঙ্গ (দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথমভাগ)। চতুর্থ সংস্করণ, অতীক পাবলিকেশনস্, ২০১১।
৭. ঘোষ, বিদ্যুৎবরণ। সংস্কৃত-রচনায় প্রতিফলিত পরিবেশ সচেতনতা। দ্বিতীয় সংস্করণ-সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ২০১১।
৮. চক্রবর্তী, শম্ভুনাথ। মহাকাব্য নিবন্ধাবলী। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ২০১৩।



বঞ্চনার ভিতর থেকে: দলিত সাহিত্য, তার ঐতিহাসিক শিকড় ও দলিত ভাবনার প্রসার
জয়িতা বসাক, সহকারী অধ্যাপিকা, দর্শন বিভাগ, বাগানান কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 23.12.2025; Accepted: 28.01.2026; Available online: 28.02.2026

©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

Abstract

The article analyzes the origin, development, and ideological foundations of Dalit literature within the Indian socio-cultural context. The term “Dalit” is derived from the Sanskrit root “dal,” meaning “broken” or “oppressed,” and refers to those communities that have historically been subjected to caste-based discrimination, social exclusion, and institutional injustice. The article demonstrates how caste-based stratification became institutionalized through Brahmanical texts such as the Manusmriti and various Puranas and how religious and literary discourses legitimized social inequality and structures of power.

The paper argues that literature has always played a crucial role in sustaining dominant ideologies and that Brahmanical traditions have used literary forms to perpetuate caste oppression. With the advent of modernity, Western rationalism, and democratic consciousness, resistance to caste-based hierarchies intensified, leading to the emergence of Dalit literature as a distinct literary and political movement. Dalit literature is defined not merely by its subject matter but by lived experience; it prioritizes reality over imagination, emphasizes autobiographical writing and collective memory, and foregrounds themes of pain, rebellion, rejection, the reclamation of identity, and social reconstruction.

The philosophical backbone of this movement is Ambedkarism, shaped by the ideas of Jyotirao Phule and Dr. B. R. Ambedkar, which provide its ideological foundation. The article also discusses the development of the Dalit literary movement in Maharashtra – particularly through the Dalit Panther movement – and its all-India influence. In Bengali literature, Dalit consciousness evolved from a marginal presence in its early stages into a powerful contemporary current; this consciousness is clearly reflected in the works of writers such as Manoranjan Byapari, Anil Gharai, Jatin Bala, and Saikat Rakshit.

Finally, the article concludes that Dalit literature is not merely literature of caste identity; rather, it is literature of liberation, equality, and social justice. By challenging established aesthetic norms, it calls for the creation of a humane and egalitarian society.

Keywords: Dalit, Shudra, Brahmanism, Manusmriti, Rigveda, Purusha Sukta, slavery, rebellion, hegemony, myth, Puranas, Brahma Vaivarta Purana, Namasudra, Ambedkarism, annihilation of caste, democracy, Satyashodhak, Matua, West Bengal, Black Panther (American organization)

সাহিত্যে দলিতদের কথা বলার আগে দলিত কারা— তা আগে ভাগেই বলে রাখা ভালো। ‘দলিত’ শব্দটি এসেছে সংস্কৃত ‘দল’ শব্দ থেকে, যার অর্থ— ভগ্ন বা ছিন্নভিন্ন। আবার ‘দলিত’ শব্দটির আভিধানিক অর্থ হল— যাকে দলন করা হয়েছে, টুকরো করার জন্য বা নিপীড়নের জন্য। অর্থাৎ বলা যায়, এমন একটি দল যাদের নিষ্ক্রিয়

রেখে দাস বানানো, নিপীড়ন করা, অবিচার করা, অস্পৃশ্য রেখে দিনের পর দিন মাড়ানো যায়— আর যাদের উপরে এসব করা যায় তারাই দলিত।

বর্ণ ব্যবস্থা ও দলিতদের সাথে যেহেতু ক্ষমতা বণ্টনের প্রশ্ন জড়িত, সেহেতু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের সাথে সাথে বিভিন্ন জাতি ক্ষমতার অংশীদার হওয়ার জন্য নিজেদের সংগঠিত করতে থাকে। ঠিক সেই সময় ভারতীয় সমাজব্যবস্থা পরিচালনায় শ্রেণীবৈষম্যের কারিগর মনু তাঁর ‘মনুসংহিতা’-য় মানবসমাজকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র— এই চার বর্ণে বিভক্ত করলেন, ‘Divide and Rule’-এর তাস খেলে। প্রথম সারির তিনটি বর্ণকে আর্য স্তরে বসালেন, যাদের তিনি উচ্চ বলে ধারণা করতেন; যারা কিনা ভারতবর্ষের মোট জনসংখ্যার মাত্র ১৫ ভাগ! আর এদেশের মূলনিবাসী আদিম ভূমিপুত্রদের ৮৫ ভাগ মানুষকে দাস, দস্যু বা শূদ্র বলে একেবারে শেষ সারিতে বসালেন। “ভাগ করো, শাসন করো”^১ এই নীতিতে বর্ণের বাটোয়ারা করলেন। এবং পড়ে থাকা এই নিম্নবর্ণের জন্য মনগড়া নিকৃষ্ট বৃত্তিও নির্ধারণ করে দিলেন। আর এভাবেই ভারতবর্ষ তৈরি হয়ে গেল ‘মনুসংহিতা’র দ্বেষ্ট।

ঋগ্বেদের প্রাচীন যুগে শূদ্রের উল্লেখ পাওয়া যায় না। একমাত্র ‘পুরুষসূক্ত’-এর দশম মণ্ডলে, যেখানে পরম পুরুষের দেহ হতে চার বর্ণের সৃষ্টির উল্লেখ মেলে, সেখানেই প্রথম শূদ্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। লিখিত হোক বা মৌখিক, শ্লোক হোক বা সংগীত— সাহিত্যনির্ভর না হয়ে কোনো ধর্মীয় ভাবাদর্শের প্রসার ঘটে না বা ঘটেনি। তাই জাতিব্যবস্থার করাল রূপ ‘মনুসংহিতা’ ও ‘ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ’-এ বেশ পোক্তভাবেই রয়েছে। ব্রাহ্মণ্য সাহিত্য সমাজে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র কায়ম করতে পুরাণ, উপপুরাণ, শ্রুতি সাহিত্যের সাহায্য নিয়েছে। অনুশাসন আরও কায়ম করতে সাহিত্যেরও আশ্রয় নিয়েছে।

আধুনিকতা ও পশ্চিমী উদারনৈতিক যুক্তিবাদী আদর্শের প্রভাবে সমাজে দীর্ঘকালের অসাম্য, ভেদ এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ভারতীয় শিক্ষিত সমাজে ক্ষোভের চাপা আগুন জমতে শুরু করেছিল। তাই প্রশ্ন উঠতে শুরু করল— ব্রাহ্মণবাদীদের জন্য যদি ‘ব্রাহ্মণ্য সাহিত্য’ থাকতে পারে, বৈষ্ণবদের জন্য যদি ‘কৃষ্ণ সাহিত্য’ হতে পারে, শিশুদের জন্য যদি ‘শিশু সাহিত্য’ থাকতে পারে, তবে দলিতদের জন্য ‘দলিত সাহিত্য’ নয় কেন?

‘দলিত সাহিত্য’ বিষয়টি কী? কারাই বা ‘দলিত সাহিত্য’ লিখবেন? কোনো কঠোর সংজ্ঞা না থাকলেও উত্তরটি খুব সহজ— গ্রামের সীমানার বাইরে অবস্থিত শ্রমিক, খেটে খাওয়া যাযাবর, যারা চিরকাল বঞ্চিত, নিপীড়িত, যুগ যুগ ধরে বর্ণীয় অবহেলা ও অপমানের শিকার, যারা তথাকথিত সমাজের কাছে অস্পৃশ্য— এমনকি যারা রাস্তায়, দোকানে, অফিসের পদে, প্রেমে ও সংসারে জন্মসূত্রে দলিত হওয়ার জন্য পদে পদে অপমানিত হয়। সে অস্পৃশ্য হোক বা নারী, কিংবা সংখ্যালঘু— যখন তারা তাদের মনের কথা, জীবনের কথা কলমে তুলে আনে, তখনই তার সূত্রে সাহিত্যের জন্ম হয়; তাই-ই ‘দলিত সাহিত্য’। সাহিত্য যেহেতু জীবনের কথা বলে, তাই জীবনযন্ত্রণা ও অভিজ্ঞতার কথা যারা সাহিত্যে বলে— তারাই দলিত সাহিত্যিক।

এই দলিত সাহিত্য সৃষ্টির মেরুদণ্ড এবং ব্রাহ্মণ্যবাদের যথার্থ মৃত্যুবাণ হল ‘আন্দোলনবাদ’। মহারাষ্ট্রের এক অখ্যাত অন্ত্যজ মাহার সম্প্রদায়ের জ্যোতিষ্মান মুক্তিসূর্য— বাবাসাহেব ড. ভীমরাও রামজি আন্দোলন (১৮৯১-১৯৫৬)। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের আধিপত্য, সামাজিক অসাম্য এবং দলিতদের আর্থিক ও শিক্ষাগত দৈন্যের

^১ Bipan Chandra, Mridula Mukherjee, Aditya Mukherjee, K. N. Panikkar, & Sucheta Mahajan. (1989). *India's Struggle for Independence*. New Delhi: Penguin Books. pp. 50-52.

বিরুদ্ধে তাঁর অগ্নিবর্ষী বাণী অন্ত্যজ সমাজের জাগরণের জন্য যথেষ্ট ছিল। আধুনিক ভারতের সূচনা হয় মহাত্মা জ্যোতিরাজ ফুলের হাত ধরে। ১৮২৭ সালে মহারাষ্ট্রের কুনবি (মালি) পরিবারে তাঁর জন্ম। পিছিয়ে পড়া অন্ত্যজ শ্রেণিকে মূল স্রোতে ফেরানোর লক্ষ্যে তাঁর প্রধান কাজ ছিল। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় ১৮৭৩ সালে প্রতিষ্ঠিত ‘সত্যশোধক সমাজ’ ছিল ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের এক শক্তিশালী হাতিয়ার। সমাজবিজ্ঞানীরা তাঁকে ‘পশ্চিম ভারতের দলিত আন্দোলনের পথিকৃৎ’ বলে অভিহিত করেছেন। এই মহাত্মা ফুলের ভাবশিষ্য হিসেবেই মহারাষ্ট্রের দলিত আন্দোলনের অগ্রনায়ক হয়ে ওঠেন ড. বি. আর. আম্বেদকর। তাঁর *Castes in India: Their Mechanism, Annihilation of Caste, Who Were the Shudras, The Untouchables* প্রভৃতি গ্রন্থে জাতিভেদ প্রথার বিকাশ ও তার সামাজিক শিকড় অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা পাওয়া যায়। ১৯৫৬ সালের ৬ ডিসেম্বর আম্বেদকরের নেতৃত্বে প্রথম ‘দলিত সাহিত্য সভা’ অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু সেই উজ্জ্বল সূর্যোদয়ের সময়েই তাঁর অকাল মৃত্যু ঘটে। ১৯৯৮ সালে বোম্বেতে ‘দলিত সাহিত্য সংঘ’-এর নেতৃত্বে দলিত লেখকদের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে গৃহীত হয় যে—দলিতদের রচিত সাহিত্য ও দলিতদের সম্পর্কে রচিত সাহিত্য, উভয়ই ‘দলিত সাহিত্য’ নামে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব পাবে। ১৯৬৭ সালে বৌদ্ধ সাহিত্য সভার এক সম্মেলনে প্রকাশিত হয় প্রথম দলিত কবিতা-সংগ্রহ *আকর*, যেখানে ছিলেন আল্লাভাউ সার্ঠে, বাবুরাও বাণ্ডল, দয়া পাওয়ার, অর্জুন ডাঙলে, শঙ্কররাও খরাট, বন্ধু মাধব, চোখা কাম্বলে প্রমুখ।

১৯৭২ সালে মারাঠি দলিত লেখকরা ‘দলিত প্যাস্ভার’ নামে একটি সাংস্কৃতিক মঞ্চ গড়ে তোলেন। এই আন্দোলন গড়ে ওঠে আমেরিকান সংগঠন *Black Panther*-এর আদর্শে উদ্ভূত হয়ে। এরপর *দলিত প্যাস্ভার*-এর হাত ধরে কবিতা, গল্প, আত্মজীবনী প্রভৃতির মাধ্যমে দলিত চেতনার বিস্তার ঘটে। যার মূল ভাবাদর্শ— “of the Dalit, for the Dalit, and by the Dalit.”^২ এই আন্দোলনের গনগনে আঁচ অঙ্ক, কর্ণাটক, গুজরাট, পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরা প্রভৃতি প্রদেশে ছড়িয়ে পড়ে।

দলিত সাহিত্য চর্চায় মহারাষ্ট্রের পর পরই পশ্চিমবঙ্গের নাম উঠে আসে ব্যাপক ভাবে। বাংলা সাহিত্যের উজ্জ্বল আকাশে যদিও অনেককাল আগেই দলিতদের কথা অল্প বিস্তার পাওয়া যায়। বাংলার অন্ত্যজ মানুষদের কথা ‘মঙ্গলকাব্য’র ধারা ধরে পাতা ওলটালে আমরা কম বেশি পাই। ‘অন্নদামঙ্গল’ কাব্যের মধ্যে খেয়া মাঝি ঈশ্বরী পাটনি দেবী অল্পপূর্ণা কে বলেছে- ‘আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে’। এটা দলিত মানুষের মুখের ভাষা ছাড়া আর কি বা হতে পারে? যাই হোক এমন উদাহরণ অনেক টানা যেতে পারে! পরবর্তীতে বিশ শতকের গোড়া থেকে শুরু হয়ে যায়- শ্রমজীবী মানুষদের জীবনকথা নিয়ে সাহিত্য রচনা। তবে এ বিষয়ে ‘কল্লোল’ গোষ্ঠীর অবদান যথেষ্ট ছিল। ২১ শতকের কথা সাহিত্যে বাংলার অন্ত্যজ মানুষদের কথা ব্যাপকভাবে ধরা পড়ে। যেন এক বৈপ্লবের পট পরিবর্তন ঘটায়! অনিল ঘড়াই থেকে শুরু করে মনোরঞ্জন ব্যাপারী, মহীতোষ বিশ্বাস, কপিল কৃষ্ণ ঠাকুর, সমরেন্দ্র বৈদ্য, সৈকত রক্ষিত, অনুকূল মন্ডল, মনোরঞ্জন পুরকাইত, বিকাশ কান্তি মিদ্যা, শশাঙ্ক শেখর মৃধা, আদম সফি, অধ্যাপক কালিপদ মণি, জয়কৃষ্ণ কয়াল- প্রমুখদের হাতে দলিত ভূমি পুত্রদের জীবন গাঁথা কবিতা ও গল্প আকারে প্রকাশ পায়। সৈকত রক্ষিত যেন পুরুলিয়ার প্রান্তিক অংশের কণ্ঠস্বর। তাঁর ‘উত্তরকথা’ গল্প সংগ্রহ নাড়াচাড়া করলেই সেই প্রান্তিক অংশের কণ্ঠস্বর শোনা যায়। অরণ্য ও আদিবাসী অধ্যুষিত মানুষগুলোর কথকতা তিনি নিরলস ভাবে লিখে গেছেন। সরাসরি শ্রমিকের জীবন সংগ্রাম নিয়ে লিখেছেন- ‘অক্ষৌহিনী’, বাঁকুড়া জেলার হাট গ্রামের শাখারিদের নিয়ে লিখেছেন- ‘স্তিমিত রণতূর্য’, শুকর পালক সহস্রদের নিয়ে- ‘হাড়িক’, গল্পের মধ্যে ‘শবরচরিত’, ‘খাদান’, ‘রাস্গামাটি’, ‘খরা’- প্রভৃতি। সমষ্টি সংকট

^২ Ambedkar, B. R. (1936). *Annihilation of caste*. New Delhi: Narayana.

কীভাবে ব্যক্তি সংকটে পরিণত হয়, তার বাস্তবতা বোঝাতে তিনি লিখেছেন- ‘পট’ ও ‘মুখোশ’র মতো গল্প। ‘খরা’ গল্প যেন সর্বসাধারণের গল্প। ঠিক যেন দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া এক সাধারণ মানুষদের গল্প। ‘ছল’ গল্পে লোকাচারের আড়ালে মানুষের কুৎসিততম প্রবৃত্তির কথা উঠে আসে। ‘জয়কাব্য’ এ এক আদিবাসী যুবতীকে কেন্দ্র করে দুই শবর-সহোদরের কলহ থেকে জন্ম নেয় যে বিরোধ, কালক্রমে তা-ই রূপ নেয় এক মহাভারতীয় যুদ্ধের। এছাড়া তাঁর ‘উত্তরকথা’, ‘রঙ্গিলা দালানের মাটি’ প্রান্তিক মানুষের স্বরূপ সন্ধানে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। শ্রেণি বৈষম্যের কথা গল্পকার মনোরঞ্জন ব্যাপারীর গল্পে যথেষ্ট ধরা পড়ে। মার খাওয়া, হেরে যাওয়া জীবনের কথা তাঁর গল্পের সম্পদ। বোধহয় সেই জন্যই তিনি নিজেকে আড়াল করেননি গল্পের পটভূমিতে। যেন এক বঞ্চিত- লাঞ্ছিত জীবন গাঁথা, নিজস্ব অভিব্যক্তির কথা ছদ্মবেশে হলেও তার গল্পে উঠে এসেছে। তাঁর একের পর এক লেখায় উঠে এসেছে বাংলার বুকে দলিত এবং নমশূদ্র সম্প্রদায়ের মানুষের কথা। তাঁর গল্পের ভাষা আউটকাস্ট মানুষের ভাষা, যে ভাষা প্রাকৃত, গ্রাম্য, নির্বেদ ও মুক্ত। ভবঘুরে, চোর- সাধু-পাগল-গণিকা-মাতাল-ভিখারি-ফকির তাঁর গল্পের নায়ক। এই রকম আউটকাস্ট মানুষেরা যারা গল্পের মাজা- আসলে তারা অচ্ছুৎ। তারা দলিত। তাঁর ‘মতুয়া এক মুক্তি সেনা’, ‘মরণ সাগর পারে তোমরা অমর’ গল্প ও প্রবন্ধগুলি আসলে তাঁরই খন্ডিত সত্তা বা আত্মকথন। বাঙালি দলিত লেখকের আত্মকথনের ধারায় উল্লেখযোগ্য সংযোজন হল- রাজেন্দ্রনাথ সরকারের ‘আমার জীবনকথা’, প্রফেসর জগবন্ধু বিশ্বাসের লেখা- ‘স্মৃতির পাতা থেকে’ (২০১৪), অনিল ঘড়াই এর ‘শালপাতার অশ্রু’ (২০১৪), যতীন বালার লেখা- ‘দলিত মানুষের গল্প’ ও আত্মজীবনী ‘শিকড়ছেঁড়া জীবন’ যেন উদ্বাস্তু দলিতের দলিল, যেখানে ইতিহাসের রাষ্ট্রীয় ভৌগলিক কাঁটাছেঁড়ায় ভারতবর্ষ দেশ জননীর অঙ্গে বিষাক্ত ক্ষত চাপা পড়ে হয়েছে। মনোহরমৌলি বিশ্বাসের লেখা- ‘আমার ভুবনে আমি বেঁচে থাকি’ (২০১৩), ‘প্রবন্ধে প্রান্তজন অথবা অস্পৃশ্যের ডাইরি’ (২০১০), ‘বিক্ষত কালের বাশি’ (২০১৩) ও তাঁর ‘দলিত সাহিত্যের দিগবলয়’ গ্রন্থে সর্বভারতীয় দলিত সাহিত্যের কথা, মূল্যায়নের ধারা, প্রতিবাদ, পশ্চাদভূমি, উদ্যেশ্যমুখীনতা, প্রতিবন্ধকতা এবং দলিত সাহিত্যে মহিলাদের উপস্থিতিসহ ভারতের প্রথম মহাকাব্যের সৃজন কর্তা অস্পৃশ্যসন্তান মহাকবি বাল্মীকি এবং দ্বিতীয় মহাকাব্যের স্রষ্টা শুদ্রসন্তান কৃষ্ণদ্বৈপায়ণকে নিয়ে আলোচনা আছে।

একুশ শতকে পৌঁছেও জাতিগত বিচারে ভারতবর্ষে দলিত সম্প্রদায় এখনও অনেকাংশেই ব্রাত্য। শুধুমাত্র উচ্চ জাতির তকমা না থাকায় প্রায়শই পরিচয়ভিত্তিক হেনস্থার শিকার হতে হয় তাদের। লোকনাথ যশবন্ত, এমন একজন দলিত কবি যিনি যুক্তিবাদের অস্ত্র নিয়ে বারবার আঘাত করেছেন এই জাতিভেদ প্রথার মেরুদণ্ডে। জাতিভেদ প্রথা মানবতাকে ধ্বংস করেছে, তৈরী করেছে অসাম্য শ্রেণীচেতনার ভিত। সমাজের বিভিন্ন স্তরে নেমে আসা যে অত্যাচারের নজির এখনও আমরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে পাই তা তাঁর কবিতার বিষয়। যশবন্তের মতো কবি- সাহিত্যিকরা অন্ত্যজ শ্রেণির জাতিবাদী দলনকে সহজ ভাষায় কবিতার আকারে জনসমক্ষে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। আন্তঃজাতি প্রেম, জাতিভেদ প্রথা বিরোধী নেতৃত্বের ব্যর্থতা, জাতিভেদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ইত্যাদি বিষয় নিয়ে গড়ে উঠেছে তাঁর কবিতাগুলি। যশবন্তের লেখা পঙক্তি- ‘কসাইটা আমাকে খুব ভালোবাসে সত্যি! মহান প্রেম সে আমাকে স্থানান্তরিত করেছে অন্তিম চূড়ান্তে’- (অনুদিত)। ২০১৮ সালে তাঁর বেশ কিছু কবিতা ইংরেজিতে অনুদিত ও প্রকাশিত হয়। ‘ভগ্ন মানুষঃমাতৃভূমির খোঁজে’ নামে গ্রন্থটি প্রকাশের জন্য এগিয়ে আসে ‘চিতার থাবা’ নামক একটি জাতিভেদ বিরোধী প্রকাশনা সংস্থা। ৬৯ টি কবিতা আছে এই গ্রন্থটিতে, যেগুলি অধিকাংশ ২০০০ সালের আগে অনুবাদ করে ডঃ কে জামানাদাস। বস্তুত এই গ্রন্থের কবিতাগুলি লেখা হয় যশবন্তের কবি জীবনের একেবারে গোড়ার দিকে কিছু কথা নিয়ে লেখা। সাম্প্রতিক ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে দলিত কবি, সাহিত্যিক ও লেখক সমাজ তাঁদের সাহিত্য, কাব্য, সাংস্কৃতিক আলোচনার

এক ধরনের প্রতিবাদী সাহিত্য সাংস্কৃতিক আন্দোলন সূত্রপাত করেছেন। বাংলার দলিত সাহিত্যিক যতীন বাল্য বর্তমান দলিত সাহিত্যের পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন- ১) দলিত জীবনের পীড়নের অভিজ্ঞতা বা suffering, ২) বিদ্রোহ বা revolt, ৩) অস্বীকৃতি বা negation, ৪) জনতত্ত্বের আবিষ্কার বা Ethnic discovery এবং ৫) নবনির্মাণ বা creation। দলিত সাহিত্যে কাল্পনিক গল্পগাথার চেয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতা, আত্মস্মৃতি বা আত্মচরিতই সবচেয়ে বড় জোরের জায়গা। প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণ্যবাদী মূল্যবোধ ও অলীক ধারণার (Myth) বিরোধিতা, অস্বীকার এবং তথ্যানুসন্ধানের মাধ্যমে দলিত জনগোষ্ঠীর ঐতিহ্যমণ্ডিত প্রাচীন সংস্কৃতির উৎস অনুসন্ধান করে বৈষম্যহীন মানবিক মূল্যবোধনির্মিত সমাজ গঠনই দলিত সাহিত্যের অন্তর্নিহিত প্রত্যয়। দলিত সাহিত্য আন্দোলন নিশ্চিতভাবেই হতে পারত ‘নবভারত আন্দোলন’; কিন্তু যে দেশে জাতির পিতা শুধু অস্পৃশ্যতা দূর করতে চান, অথচ জাতিব্যবস্থায় অন্ত্যজ বা দরিদ্রের ক্ষমতায়ন চান না— সেই দেশে এমন আকাঙ্ক্ষা করা অরণ্য সৃষ্টির মতোই দুঃসাহসিক, এ কথা বলাই বাহুল্য। সাধারণ ধারার লেখকদের থেকে দলিত মুক্তিকামী লেখকদের লক্ষ্য ও দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন। তাঁদের শিল্পবিচার পদ্ধতি তথা নন্দনতত্ত্বও আলাদা। পিছিয়ে পড়া এক সমাজ থেকে উঠে আসা লেখকরা নিজেদের বিষয়ে তুলে ধরেছেন ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের বিরুদ্ধে ধ্বজা উড়িয়ে। নিজেদের অতীত আত্মবিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে এক নতুন সৌভ্রাতৃত্বের নির্মাণ করেছেন, দিয়েছেন এক নির্বিশেষ নৈতিক ধারণা। তাঁরা প্রশ্ন তুলেছেন— দলিতদের এই দোলাচলে দলিতকেই লিখতে হবে কেন? প্রখ্যাত মারাঠি লেখক দয়া পাওয়ারের ভাষায়, উচ্চবর্ণের লেখকদের চেতনা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নমুখী দলিত লেখকদের বিবেক। তাঁদের হাতে তাঁদের ইতিহাসের ব্যাখ্যাও আলাদা, তাঁদের কাব্যজিজ্ঞাসাও পৃথক। তাৎক্ষণিক বাস্তবতার বিচার কিংবা শিল্পসৃষ্টির আনুষঙ্গিকতায় তাকে ব্যবহারের ক্ষমতাও আলাদা। সেইজন্যই বলা হয়েছে— দলিত লেখকদের আন্দোলন কেবল আর্থসামাজিক সংগ্রাম নয়; এটি প্রতিষ্ঠিত সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের বিরুদ্ধে এক সংঘর্ষ। সামাজিক ন্যায় (বা অন্যায়)-এর যে দেহভাষ্য— বিশেষ ব্যক্তির উত্তমপুরুষ চেতনায় বোনা অভিজ্ঞতাই দলিত নন্দনতত্ত্বের মূল ভরকেন্দ্র। সুতরাং বলা যায়, ‘দলিত সাহিত্য’ জাতপাতের সাহিত্য নয়। এটি মুক্তির সাহিত্য, সাম্যের সাহিত্য, ন্যায় প্রতিষ্ঠার সাহিত্য। এই সংস্কার সাধনের কাজে, পরিবর্তনের জন্য কেবল দলিত কবিরাই যথেষ্ট নয়— অন্য কবিদের অংশগ্রহণও অত্যন্ত জরুরি।

আধুনিক প্রচেষ্টা ও প্রতিষ্ঠানঃ সুখের কথা, বর্তমান বাংলা সাহিত্যে কিছু নিবেদিতপ্রাণ দলিত সাহিত্যিক আছেন, কিছু সাহিত্যচর্চা ও প্রচার-প্রসার সংস্থাও রয়েছে। আছে ‘পথ সংকেত’, ‘বাংলা দলিত সাহিত্য সংস্থা’। ‘গাঙচিল’ প্রকাশনা সংস্থা বহু দলিত গ্রন্থ প্রকাশ করেছে, করছে এখনও। তারা নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে দলিত সাহিত্যের হাত শক্ত করতে। বাংলার অনেক সাহিত্যপত্র, সম্পাদক ও লেখকও দলিত সাহিত্যচর্চাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য— সনৎ কুমার নস্কর, বিমলেন্দু হালদার, কপিল কৃষ্ণ ঠাকুর, দিলীপ গায়ন, নকুল মল্লিক, বিমল বিশ্বাস, সুকৃতি রঞ্জন বিশ্বাস, গৌরাঙ্গ সরদার, প্রদীপ রায়, নিখিল বৈদ্য, সত্যচরণ সরদার, সনাতন হালদার, দুলাল বিশ্বাস প্রমুখ। মঞ্চনির্মাণ নাটক লিখেছেন— বিনয় কৃষ্ণ রায়, বিষ্ণুপদ মণ্ডল, বিমলেন্দু হালদার, অচিন্ত্য বিশ্বাস ও অমল মণ্ডল প্রমুখ নাট্যব্যক্তিত্ব। এদের হাত ধরে দলিতদের অগ্রগতি ও দলিত সাহিত্যের প্রসার আজ অনেকখানি এগিয়েছে। এরই মধ্যে বাংলায় আত্মপ্রকাশ করেছে ‘দলিত সাহিত্য একাডেমি’। চলতি বছরের ১৪ই সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানান— রাজবংশী, কুরুক, নমশ্রুদ, মতুয়া, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, বাগদি, বাউড়ি, ডোম, মাঝি-সহ বিভিন্ন গোষ্ঠী তথা দলিত সম্প্রদায়ের সাহিত্যচর্চা সংরক্ষণ, পৃথক লাইব্রেরি নির্মাণ, এই সম্প্রদায়ের মনীষীদের জীবনচর্চা ও জীবনী রচনা— এইসব সাহিত্যমূলক কাজ করা হবে দলিত সাহিত্য একাডেমির মাধ্যমে।

তথ্যসূত্র:

১. নস্কর, সনৎ কুমার। এক অন্তহীন মহাজীবন। পৌল্লেখ্য মহাসংঘ, ১৪ই এপ্রিল, ২০১৭; পৃ. ২৯০।
২. ব্যাপারী, মনোরঞ্জন। অমানুষিক। একা। ১৪ই ডিসেম্বর, ২০২০; পৃ. ১১।
৩. সরদার, সনৎ কুমার। জাতের কারাগার। রোহিনী নন্দন, ২০২৫; পৃ. ১৪১।
৪. মন্ডল, সুবলচন্দ্র। দলিত চেতনার বিকাশ। অনন্যা, ১৪ই এপ্রিল, ২০২২; পৃ. ৩৬।
৫. বর্মণ, প্রদীপ কুমার। আমি কুন্তী নই। প্রত্যয়, ২০২৪; পৃ. ৫৪।
৬. আলাসে, বীনা। আশ্বেদকরঃ এক দৃষ্টিক্ষেপ। ঐতিহাসিক, ৪র্থ বর্ষ (৩-৪), পৃ. ৫৪।



দার্শনিক মননে রবীন্দ্রনাট্য: এক প্রতিবাদী চেতনা

ড. মহ. মহিদুর রহমান, সহকারী অধ্যাপক, চাঁচল কলেজ, মালদা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 24.12.2025; Accepted: 03.01.2026; Available online: 28.02.2026

©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

Abstract

Rabindranath Tagore's philosophical outlook extends from incompleteness to completeness, from limitation to the radiant light of the infinite, and is permeated by a universal consciousness. With profound philosophical reflection, he articulated his own philosophical awareness in a distinctively oppositional and resistant tone. Among the various methods traditionally discussed in philosophical discourse, the dialectical method is particularly noteworthy. In dialectics, both reconciliation and opposition are acknowledged; thus, the search for a more comprehensive truth within opposing viewpoints constitutes the essence of the dialectical method. Rabindranath employed this dialectical approach in most of his plays.

In the central or principal characters of the majority of his dramas, Rabindranath expressed his own resistant consciousness in the light of a deep life-ideal. At the same time, he also shaped the other characters within the framework of specific philosophical perspectives. Through characters such as Dhananjaya or Abhijit in Muktaadhara, Nandini in Raktakarabi, Panchak in Achalayatan, Jaysingha in Bisarjan, Amal in Dak Ghar, and the King in Raja, Rabindranath made his own philosophy vividly manifest.

The continuous, spontaneous, and ceaselessly dynamic movement of human life itself constitutes Muktaadhara. Human beings are constantly carried along by the current of motion. Through various conditions across successive births, they move forward incessantly. This movement, this dynamism, is the true nature of life, and within this very motion lies the fulfillment of human existence. In philosophy, materialism refers to an emphasis on bodily pleasure or pleasurable sensations. The background of Rabindranath's play Raktakarabi (1926) is rooted in materialism. In this drama, Rabindranath creates a favorable atmosphere for thesis, antithesis, and ultimately synthesis.

Keywords: Dialectical method, philosophical reflection, ultimate reality, mechanization, materialism, Muktaadhara, Raktakarabi

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ মূলত দার্শনিক। তবে প্রথাগত দৃষ্টিভঙ্গিতে সাহিত্য সৃষ্টির উদ্ভাসনে তিনি হয়ে ওঠেন কবি, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, সার্থক ছোটোগল্পের শিল্প স্রষ্টা ও বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক। জীবনের বহুমাত্রিক শাখা-প্রশাখা ও শেকড়ের সন্ধান তাঁর লেখনি সত্তায় এনে দিয়েছে সুগভীর জীবন দৃষ্টি, দার্শনিক মনন। এই মনন নিয়েই রবীন্দ্রনাথ জীবনকে পূর্ণাঙ্গ ও সত্যাত্মক রূপে বিমূর্ত করে তোলেন। প্রতিভাসিত করেন জীবনের তাৎপর্যকে। তাঁর সৃষ্টিশীল সাহিত্যে দার্শনিক রবীন্দ্রনাথের সৃজনশীল চেতনা অভিনব মাত্রায় প্রদর্শিত।

জীবনের চরম সত্যবোধকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার উদ্দেশ্য নিয়েই রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রতিবাদী চেতনা ব্যক্ত করেছেন। জীবনের মূল্যবোধ, মানবিকতা, শুভ ও মঙ্গলবাণী, সুস্থ সুন্দর ও পবিত্র জীবনের সাধনা করেছেন। সেই সাধনার বাণীতেই ফুটে উঠেছে প্রতিবাদী চেতনার অভিনব সুর।

রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক সুলভ দৃষ্টিভঙ্গি অপূর্ণ থেকে পূর্ণ, সীমা থেকে অসীম সৌন্দর্যালোকে, সার্বজনীন বোধে পরিব্যাপ্ত। সুগভীর দার্শনিক মনন নিয়েই নিজস্ব দর্শন চেতনাকে সুস্পষ্ট করে তুললেন ভিন্নমাত্রিক প্রতিবাদী ব্যঞ্জনা। তাঁর প্রতিবাদী চেতনার সুর যেমন গল্পে, উপন্যাসে, তেমনি নাট্য সৃষ্টির মধ্যেও লক্ষণীয়। মূলত রবীন্দ্রনাথের ‘মুক্তধারা’ ও ‘রক্তকরবী’ রূপক-সাংকেতিক নাটকে তাঁর দার্শনিক মন ও মননের প্রতিফলনে প্রতিবাদী চেতনা কীভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে তাই এই প্রবন্ধে তুলে ধরবার চেষ্টা করা হয়েছে।

দার্শনিক আলোচনার যে সমস্ত পদ্ধতি প্রথাগতভাবে আলোচিত সেখানে দ্বন্দ্বিক পদ্ধতি (Dialectical method) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কান্টের মতে, অতীন্দ্রিয় বিষয় সম্পর্কে ধারণা করতে গেলে যে বুদ্ধি বিভ্রান্তি ও পরস্পর বিরোধিতার উদ্ভব হয়, তার মূল কারণ অন্বেষণ করার নামই দ্বন্দ্বিক পদ্ধতি। আবার হেগেলের মতে, পরস্পর বিরোধী ধারণাগুলির মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার যে প্রক্রিয়া তাই দ্বন্দ্বিক প্রক্রিয়ার উপজীব্য বিষয়। হেগেলের দর্শনে চৈতন্য হল পরম পদার্থ (absolute consequence) তিনি বলেন, অভিব্যক্তির মূল লক্ষ্য হচ্ছে বিরোধকে (Contradiction) সমন্বয়ের (synthesis) বন্ধনে রূপায়িত করা। বিরোধের মধ্য দিয়ে সমন্বয় ও সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে অভিব্যক্তি একেই হেগেল (Georg Wilhelm Friedrich Hegel) দ্বন্দ্বিক প্রক্রিয়া (dialectical process) নামে অভিহিত করেছেন। বাদ (thesis), প্রতিবাদ (antithesis) ও সমন্বয় (synthesis) এই নিয়েই দ্বন্দ্বিক প্রক্রিয়ার ত্রয়ী রচিত হয়েছে।

দ্বন্দ্ব মিলন ও বিরোধ উভয়েরই ব্যঞ্জনা স্বীকার্য। তাই বিরোধী মতবাদের মধ্যে পূর্ণতর সত্যের অনুসন্ধানই দ্বন্দ্বিক পদ্ধতির মূল কথা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বেশিরভাগ নাটকে সেই দ্বন্দ্বিক পদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন। এবং তাঁর প্রায় প্রতিটি নাটকে চরিত্রের চিন্তা চেতনায় প্রতিবাদী সত্তাকে যথেষ্ট মূল্য প্রদান করেছেন। আর সেই প্রতিবাদী চেতনার আলোকে নাটকে চরিত্রের বাদ-প্রতিবাদ এবং পরিশেষে সমন্বয় সূত্রে পূর্ণতর সত্যের অনুসন্ধান করেছেন।

লক্ষণীয়, রবীন্দ্রনাথ তাঁর অধিকাংশ নাটকের মূল/কেন্দ্রীয় চরিত্রের মধ্যে নিজস্ব প্রতিবাদী চেতনাকে সুগভীর জীবনাদর্শের আলোকে ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু অন্যান্য চরিত্রগুলিকেও কোন একটি নির্দিষ্ট দর্শনবোধের প্রেক্ষাপটে রূপায়িত করেছেন। ‘মুক্তধারা’র ধনঞ্জয় কিংবা অভিজিৎ, ‘রক্তকরবী’র নন্দিনী, ‘অচলায়তনে’র পঞ্চক, ‘বিসর্জনে’র জয়সিংহ, ‘ডাকঘরে’র অমল, ‘রাজা’র রাজা ইত্যাদি চরিত্রের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ নিজস্ব দর্শনকে প্রকট করে তুললেন। কখনো বাস্তবতার আলোকে, কখনো মানবিক মূল্যবোধের নিরিখে, কখনো রোমান্টিকতার আবেশে, কখনোবা ব্যক্তিত্ববোধের সুপ্রতিষ্ঠিত রূপায়ণে। মানবজীবনের চরম ও পরম তথা পূর্ণতর সত্য সন্ধানই রবীন্দ্রনাথ প্রতিবাদী চেতনাকে অভিনব শিল্পকৌশলে ফুটিয়ে তুললেন। তাঁর ‘মুক্তধারা’ ও ‘রক্তকরবী’ প্রসঙ্গত উল্লেখ্য।

মানব জীবনের অব্যাহত, স্বচ্ছন্দ, অবিরাম সচল গতিই মুক্তধারা। গতির স্রোতে মানুষ ক্রমাগত ভেসে চলেছে। জন্ম জন্মান্তরের নানা অবস্থার মধ্য দিয়ে সে ক্রমাগত এগিয়ে যাচ্ছে। এই গতিই, চলমানতাই জীবনের স্বরূপ। এই গতির মধ্যেই মানব জীবনের সার্থকতা। কিন্তু সেই গতিময়তা ও চলমানতাকেই রুদ্ধ করছে ও করায়ত্ত করেছে রাজা রণজিৎ। যন্ত্ররাজ বিভূতির দ্বারা এক বিরাট লৌহ যন্ত্রের মধ্য দিয়ে। রাজার আদেশে রাজ ইঞ্জিনিয়ার বিভূতি বিদ্রোহী, প্রতিবাদী, পীড়িত প্রজাদের দমনের জন্য এটি নির্মাণ করেছেন। মানুষের

সচল জীবনধারার বাধা সৃষ্টি করেছে রাজশক্তির সহায়তায়। পাশ্চাত্যের উগ্র, সংকীর্ণ জাতীয়তা ও রাষ্ট্রনীতির এটিই অন্তর্নিহিত স্বরূপ।

যন্ত্রবাদ দর্শনে প্রাণের তত্ত্বকে স্বীকার করা হয় না। যন্ত্ররাজ বিভূতি যন্ত্রবাদী দর্শনে বিশ্বাসী। তাই তার প্রতিবাদ প্রাণ শক্তির বিরুদ্ধে। যন্ত্রশক্তির মহিমায় সে উদ্বুদ্ধ, আপ্লুত-

“দুত: এতকাল ধরে তুমি আমাদের মুক্তধারার ঝরনাকে বাঁধ দিয়ে বাঁধতে লেগেছ। বার বার ভেঙে গেল, কত লোক ধুলোবালিতে চাপা পড়লো, কত লোক বন্যায় ভেসে গেল। আজ শেষে-

বিভূতি: তাদের প্রাণ দেওয়া ব্যর্থ হয় নি। আমার বাঁধ সম্পূর্ণ হয়েছে।

দুত: শিবতরাইয়ের প্রজারা এখনো এ খবর জানে না। তারা বিশ্বাস করতেই পারে না যে, দেবতা তাদের যেজল দিয়েছেন কোন মানুষ তা বন্ধ করতে পারে।

বিভূতি: দেবতা তাদের কেবল জলই দিয়েছেন, আমাকে দিয়েছেন জলকে বাঁধবার শক্তি।

... ...

দুত: ক্ষুধিতের কান্না তোমার সে ভাবনা ভাঙতে পারবে না?

বিভূতি: না। জলের বেগে আমার বাঁধ ভাঙে না, কান্নার জোরে আমার যন্ত্র টলে না।”^১

এই যন্ত্র সর্বস্বতায় মানুষের অন্তরাত্মা, তার মনুষ্যত্ব পীড়িত। কুমার অভিজিৎ মানুষের সেই নিপীড়িত অন্তরাত্মা নিপীড়িত হচ্ছে পরাধীন, শোষিত জাতির মধ্যে। সমগ্র বিজিত পরাধীন জাতির অন্তরাত্মার প্রতীক ধনঞ্জয় বৈরাগী। উভয়েই একই অচলবস্থার, রুদ্ধতার প্রতিবাদী। যার মূল অবলম্বন মানবতা। একজনের প্রতিবাদ বুদ্ধি ও বিজ্ঞানদৃষ্ট মূল যন্ত্রশক্তির বিরুদ্ধে, আর একজনের প্রতিবাদ যান্ত্রিক ব্যবস্থা বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রনীতির বিরুদ্ধে। উভয়ের বিরুদ্ধতাই যন্ত্রের বিরুদ্ধে ও মানুষের মুক্তির সপক্ষে। যে প্রতিবাদী চেতনা রবীন্দ্রনাথের গঠনগত পূর্ণতর সত্য সন্ধানে নিহিত।

‘মুক্তধারা’র বাঁধই যান্ত্রিকতার চরম রূপ। যন্ত্রের প্রবল শক্তি সেখানে কেন্দ্রীভূত। এই বাঁধ ভাঙা সহজসাধ্য নয়। তাই অভিজিৎ যান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। তার প্রাণ বিসর্জন যেন যন্ত্রের কাছে প্রাণের প্রতিবাদ-

“আমার অন্তরের কথা আছে ঐ মুক্তধারার মধ্যে। তারই পায়ে যখন ওরা লোহার বেড়ি পরিয়ে দিলে, তখন হঠাৎ যেন চমক ভেঙে বুঝতে পারলুম উত্তরকূটের সিংহাসনই আমার জীবন স্রোতের বাঁধ। পথে বেরিয়েছি তারই পথ খুলে দেবার জন্য।”^২

এই প্রতিবাদ পীড়নকারীর অন্তরাত্মারই প্রতিবাদ। অভিজিৎ জগত ও জীবনকে গভীরভাবে ভালোবাসে বলেই যন্ত্রের হাতে মনুষ্যত্বের অপমান সহ্য করতে পারে না। যে যন্ত্র ধরণীর সৌন্দর্য ও জীবনের মাধুর্য বিনষ্ট করেছে, বিধাতার দান এই অপূর্ব সুন্দর জীবনকে হরণ করেছে, তিক্ত ও বিষাক্ত করেছে তার প্রতিবাদ সেই যন্ত্রের বিরুদ্ধে, আগ্রাসী শক্তির বিরুদ্ধে- ‘স্বর্গকে ভালো লেগেছে বলেই দৈত্যের সঙ্গে লড়াই করতে যেতে দ্বিধা করি নে’। ‘স্বর্গ’ শব্দের তাৎপর্য মানবতা এবং ‘দৈত্য’ শব্দে নিষ্ঠুরতার আভাসই প্রতিকায়িত হয়ে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথের জীবন দর্শনের এক অন্যতম লক্ষণই হল অহিংস উপায়ে গঠনগত, পূর্ণতর সত্যের সন্ধান। সেই সত্যাত্মবোধী ভাবনা ধনঞ্জয়ের মাধ্যমে প্রতীকী উপায়ে ব্যক্ত করেছেন। তাঁর প্রতিবাদী চেতনায় মনুষ্যত্ববোধের, উচ্চ-ন্যায়াদর্শের ভাব প্রতিফলিত।

‘মুক্তধারা’ নাটকে ধনঞ্জয় বৈরাগী বিজিত অত্যাচারিত জাতির আত্মিক প্রতীক। আত্মার শক্তি জড়শক্তি বা যন্ত্রের শক্তি নয়, সে শক্তি বৃহত্তর নীতির শক্তি। তাই ন্যায় ও নৈতিকতার দোহাই দিয়ে যন্ত্রশক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে জানিয়েছে-

“রণজিৎ: খাজনা দেবে কিনা, বল।

ধনঞ্জয়: না, মহারাজ দেব না।

রণজিৎ: দেবে না! এতবড় আত্মপরিচয়?

ধনঞ্জয়: যা তোমার নয়, তা তোমাকে দিতে পারব না?

রণজিৎ: আমার নয়?

ধনঞ্জয়: আমার উদ্ভূত অন্ন তোমার, ক্ষুধার অন্ন তোমার নয়।

... ..

ধনঞ্জয়: রাজা, ভুল করছ এই যে, ভাবছ জগৎটাকে কেড়ে নিলেই জগৎ তোমার হল। ছেড়ে রাখলেই যাকে পাও, ক্ষুধার মধ্যে চাপতে গেলেই দেখবে সে ফসকে গেছে। ...”^৪

এই সমস্ত প্রতিবাদী উক্তির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মতের ছায়াপাত রয়েছে। ‘রাজত্ব যে কেবল রাজার নয়, প্রজারাও’ এই প্রতিবাদী চেতনা তাঁর বহু প্রবন্ধে ব্যক্ত হয়েছে। কালিদাস নাগকে লিখিত একটি পত্রে রবীন্দ্রনাথ জানান-

“তোমার চিঠিতে machine সম্বন্ধে যে আলোচনার কথা লিখেছ, সেই machine এই নাটকের একটা অংশ। এই যন্ত্র প্রাণকে আঘাত করছে, অতএব প্রাণ দিয়েই সেই যন্ত্রকে অভিজিৎ ভেঙেছে, যন্ত্র দিয়ে নয়।”^৫

নাটকে বাদ, প্রতিবাদ ও শেষে সমন্বয়ের অনুকূল পরিবেশ তৈরি করেছেন রবীন্দ্রনাথ। অভিজিৎ- এর একটি প্রাণের বিনিময়ে শত শত প্রাণ জেগে উঠেছে। বেঁচে থাকার উপাদান চিরদিনের মতো দান করেছে অভিজিৎ। প্রাণ প্রবাহে শিবতরাইয়ের পীড়িত মানুষ ফিরে পেয়েছে তাদের সজীবতা, সচলতা। হেগেলীয় দর্শনের সেই দ্বন্দ্বিক প্রক্রিয়াকেই যেন অভিনব শিল্পকৌশলে বিমূর্ত করে তুললেন রবীন্দ্রনাথ।

দর্শনে জড়বাদ বা বস্তুবাদ (materialism) বলতে দেহের সংযোগ বা সুখকর সংবেদনকে বিশেষভাবে প্রাধান্য দেওয়া হয়। রবীন্দ্রনাথের ‘রক্তকরবী’ (১৯২৬) নাটকের পটভূমি জড়বাদ বা বস্তুবাদ। বলা যায়, পশ্চিমী বস্তুসর্বস্ব জড়বাদ, যান্ত্রিক শাসন ও সভ্যতা এবং লুপ্ত ধনতন্ত্রবাদ ‘রক্তকরবী’র আবহ। তিনি এই বস্তুসর্বস্ব জড়বাদের বিরুদ্ধেই প্রতিবাদী চেতনা ব্যক্ত করলেন। বাদ-প্রতিবাদ প্রাণবাদকেই সমন্বয়ের আদর্শে ফুটিয়ে তুললেন রবীন্দ্রনাথ।

নাটকের অন্যতম মূল চরিত্র রাজা ধনতন্ত্রের বস্তুসর্বস্বতায় আকীর্ণ। যক্ষপুরী বিশেষভাবে স্বর্ণ উত্তোলনের একটা কারখানা। ঐশ্বর্য সংগ্রহের এক মহাকেন্দ্র, কুবেরের অবস্থান। এখানে ঐশ্বর্যের রূপটাই অধিক প্রকটিত। যক্ষপুরীর পরিকল্পনায় পাশ্চাত্য সভ্যতার (আমেরিকা) ছায়াপাত লক্ষ করা যায়। নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং জানান-

“অনবচ্ছিন্ন সাত মাস আমেরিকার ঐশ্বর্যের দানবপুরীতে ছিলাম। সেখানে ভোগের চেহারা দেখেছি, আনন্দের না। এই নিরন্তর উল্লঙ্ঘনের ঝোঁকের মাঝখানে যে পড়ে গেছে তার ক্রোধ চেপে যায়, গরম হয়ে ওঠে, বাহাদুরির মতো সে ভোঁ হয়ে যায়। ... আরো চাই, আরো চাই, আরো চাই, - এ বাণীতে তো সৃষ্টির সুর লাগে না।”^৬

‘রক্তকরবী’র মর্মকথা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টতই জানান-

“নারীর ভিতর দিয়ে বিচিত্র রসময় প্রাণের প্রবর্তনা যদি পুরুষের উদ্যমের মধ্যে সঞ্চরিত হবার বাধা পায়, তা হলেই তার সৃষ্টিতে যন্ত্রের প্রাধান্য ঘটে। তখন মানুষ আপনার সৃষ্ট যন্ত্রের আঘাতে কেবলই পীড়া দেয়, পীড়িত হয়। এই ভাবটা আমার ‘রক্তকরবী’র নাটকের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে।”^৭

নাটকটির মূল দ্বন্দ্ব রাজা ও নন্দিনীর মধ্যে। রাজা জটিল জালে বাস করেন। বস্তুতন্ত্রের নিরেত সাধনা, বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের দ্বারা অপরিাপ্ত শক্তিলোপ ও প্রভূত ঐশ্বর্য সন্তোষ করেন। মনুষ্যত্বহীন, হৃদয়হীন, সঞ্চয়কামী, শোষণশীল সমাজ ও যান্ত্রিক ব্যবস্থায় অতিবাহিত করেন শূন্যতার জীবন। আসলে ‘অচলায়তনে’র প্রাচীর, ‘মুক্তধারা’র বাঁধ ও ‘রক্তকরবী’র জাল মূলত একই মুদ্রার সমরূপ। রবীন্দ্রনাথ নন্দিনী চরিত্রের মধ্য দিয়ে সেই জড়ত্ব, শূন্যতা তথা আনন্দহীন জীবনেরই প্রতিবাদ ধ্বনিত করলেন সু-উজ্জ্বল কণ্ঠে।

নন্দিনীর কাজ তার সাধনা মূলত প্রাণের, সজীবত্বের। সে রাজার জালের মধ্যে ঢুকে তাকে জালের মধ্যে ঢুকে তাকে জালের আড়াল থেকে বের করে আনতে চায়। জালের দরজায় ঘা দিয়ে আনন্দ চিত্তে বলে ওঠে-

“আজ খুশিতে আমার মন ভরে আছে। সেই খুশি নিয়ে তোমার ঘরের মধ্যে যেতে চাই। ... জাল খুলে দাও, ভিতরে যাব।”^৮

অন্যদিকে রাজা জানান-

“না, ঘরের মধ্যে নয়, আসতে দেব না, কী বলবে শীঘ্র বলো। আমার সময় নেই, একটুও না।”^৯

মকররাজ এতদিন আনন্দের মতো জড়বস্তু, নিষ্প্রাণ, বিজ্ঞানশক্তির মোহে আচ্ছন্ন হয়েছে। তাই নন্দিনী প্রাণধারার বাণী নিয়ে রাজার সঙ্গে বাদ-প্রতিবাদে সরব হয়েছে। অভিব্যক্তি ঘটেছে তাঁর আলোক চৈতন্যের-

“নন্দিনী: (জানালায় ঘা দিয়ে) সময় হয়েছে, দরজা খোলো।

নেপথ্যে: আবার এসেছ অসময়ে। এখনি যাও, যাও তুমি..... আজ ধ্বজাপূজা, আমায় বিরক্ত করো না। পূজার ব্যাঘাত হবে। যাও, যাও এখনি যাও।

নন্দিনী: আমার ভয় ঘুচে গেছে। এমন করে তাড়াতে পারবে না। মরি সেও ভালো, দরজা না খুলিয়ে নড়ব না।

নেপথ্যে: আমি ক্লান্ত, ভারি ক্লান্ত। ... এখন বাধা দিলে রথের চাকায় গুঁড়িয়ে যাবে। ...

নন্দিনী: বুকের উপর দিয়ে চাকা চলে যাক, নড়ব না।”^{১০}

প্রাণ প্রতিষ্ঠার এই অভিনব প্রতিবাদ, বাংলা নাট্য সাহিত্যে দুর্লভ। জড়ত্বের অবসানেই সজীবত্বের প্রতিষ্ঠা। নন্দিনীর প্রতিবাদ সেই জড়শক্তিরই বিরুদ্ধে। রবীন্দ্রনাথ সমন্বয়ের সুললিত বাণী শোনালেন নন্দিনীর প্রাণময়তার কর্ণস্বরে। বিশ্বের মুক্তিকামী চিন্তা-চেতনা যেন সমস্ত অপরূহ স্বরের স্ফুটন। সে বলে ওঠে- ‘এতদিন পরে আমার মুক্তি হল... সত্যের মধ্যে মুক্তি পেয়েছি- এ বন্ধন তারই সত্যের সাক্ষী হয়ে রইলো।’

লক্ষণীয়, বস্তু সম্পর্কে হিউম জড়াত্মক দ্রব্য সম্পর্কিত বিশ্বাসকে সংস্কারগ্রস্ত বলে অভিহিত করেছেন। মুখ্য ও গৌণ উভয়প্রকার গুণই বুদ্ধিগত না হলেও তাদের অস্তিত্ব সন্দেহজনক। আর ‘আত্ম সম্পর্কে তিনি জানান- আত্মাকে ধরিবার বা সাক্ষাৎভাবেপাইবার যতই চেষ্টা করা হোক না কেন, বিশেষ (particular) সংবেদন (sensation) আবেগ (feeling) ইচ্ছা (will) ছাড়া তার কিছুই সন্ধান পাওয়া যায় না’। সুতরাং তাঁর মতে, আত্মা বা মন বলে কোন দ্রব্যের (substance) কল্পনা মোটেই যুক্তিসম্মত নয়।

আবার বস্তু সম্পর্কে কান্টের মতবাদ স্বীকার্য। তিনি আত্মগত ভাববাদের তীব্র বিরোধী ছিলেন। তাঁর মতে, দেশ-কালকে অভিজ্ঞতার ব্যাপারে ব্যবহারিকভাবে (empirically) বাস্তব তত্ত্ব বলে গ্রহণ করা যেতে পারে। জ্ঞানতত্ত্ব মতবাদের উপর ভিত্তি করে অভিজ্ঞতালব্ধ বস্তুর গ্রহণযোগ্যতা যাচাই করেছেন তিনি।

রবীন্দ্রনাথ আসলে ‘রক্তকরবী’ নাটকে মকররাজকে বস্তুবাদী বা জড়বাদী তত্ত্ব রূপেই প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। আর তাই রাজা ধনতান্ত্রিক সভ্যতার বস্তুসর্বস্বতায় বারবার নিজের অস্তিত্ব ঘোষণা করতে চান। তিনি জানান- ‘দুর্গমের থেকে হীরে আনি, মাণিক আনি, সহজের থেকে ঐ প্রাণের জাদুটুকু কেড়ে আনতে পারি নে’। ‘আমার যা আছে সব বোঝা হয়ে আছে। সোনাকে জমিয়ে তুলে তো পরশমণি হয় না’। নন্দিনী তাঁর সহজাত মানবিক মূল্যবোধের নিরিখেই সজীব প্রাণের সত্তায় নিজস্ব প্রতিবাদ ব্যক্ত করেছে- ‘তোমার এত আছে, তবু কেবলই অমন লোভীর মতো কথা বলো কেন’?

জড়বাদ ও প্রাণবাদের যে বিরোধ, হেগেলের মতে, তার মধ্যেই নিহিত থাকে সমন্বয়ের সুর। তিনি বলেন, ব্যবহারিক (empirical) ও পারমার্থিক (noumenal) বিষয়ের মধ্যে বিরোধ সত্ত্বেও এক সমন্বয় রয়েছে। বিরোধ ও সমন্বয় উভয়ই পরম চৈতন্যের (absolute consciousness) স্বরূপ। হেগেলীয় দর্শনে মূর্ত বস্তুর কথাই বলা হয়েছে। শুদ্ধ চৈতন্য শুদ্ধ জড়ের বিরোধী। এই বিরোধিতা পরম পদার্থের অভিব্যক্তির জন্য একান্ত অপরিহার্য। রবীন্দ্রনাথ সেই অপরিহার্যতাকেই প্রতিবাদী চেতনায়, দার্শনিক মন ও মননে, শুদ্ধ চৈতন্যের আলোকে অভিনব শিল্পরূপ দান করলেন।

তথ্যসূত্র:

- ১। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। মুক্তধারা। বিশ্বভারতী প্রকাশনী, শান্তিনিকেতন, ১৩৮৬ সাল, পৃ. ৩।
- ২। তদেব, পৃ. ১৩।
- ৩। তদেব, পৃ. ১৩।
- ৪। তদেব, পৃ. ২৪।
- ৫। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্র রচনাবলী। ১৪শ খণ্ড, বিশ্বভারতী প্রকাশনী, শান্তিনিকেতন, ১৩৮০ সাল, পৃ. ৫৩২-৩৩।
- ৬। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। শিক্ষার মিলন, কালান্তর। বিশ্বভারতী প্রকাশনী, শান্তিনিকেতন, ১৩২৮ সাল, ভাদ্র, পৃ. ১৭১-৭২।
- ৭। যাত্রী, পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারী, ২৮ শে সেপ্টেম্বর ১৯২৪, পৃ. ১১৯।
- ৮। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। রক্তকরবী। বিশ্বভারতী প্রকাশনী, শান্তিনিকেতন, ১৩৮০ সাল, পৃ. ১০০।
- ৯। তদেব, পৃ. ১০০।
- ১০। তদেব, পৃ. ১০৩।



আবুল বাশারের কথাসাহিত্যে মুসলিম অন্তরমহল

ড. আঞ্জুমান লিপি, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কালিয়াচক কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 24.12.2025; Accepted: 03.01.2026; Available online: 28.02.2026

©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

Abstract

In the field of Bengali fiction, Abu Bashar stands out as one of the foremost writers whose works present a comprehensive portrayal of the inner quarters of Bengali Muslim society. Centering his narratives on issues such as divorce, polygamy, child marriage, unequal marriages, and halala marriage, he courageously exposes the harsh realities of female oppression carried out under the shelter of religion within the Muslim patriarchal domestic sphere. This bold representation is undoubtedly worthy of appreciation.

The women inhabiting the inner worlds of Abu Bashar's fiction – Zahida, Madina, Rabeya, Kulsum, Shirin, Nabina, or Rajia – are ultimately compelled to disappear within the narrow and complex entanglements of society and religious law. Whether educated or uneducated, affluent or impoverished, women across all strata of the inner household in Abu Bashar's works are subjected to inhuman suffering and relentless anguish.

In the short story Simar, eleven-year-old Zahida is forced to meet the physical demands of eighteen-year-old Sukhabas and dies on the very night of her marriage. In the short story Nastik, the educated Rabeya is likewise driven into darkness due to the religious fanaticism, recklessness, atheism, and misplaced loyalty to friendship displayed by Hamidul and Mamun. On the other hand, in Ek Tukro Chithi (A Fragment of a Letter), even after offering Shirin a glimpse of an enlightened path, the author ultimately pushes her toward a terrifying fate, defeated by religion, wealth, society, politics, power, and inhuman cruelty.

Akhtar Haji, a representative of a patriarchal society obsessed with polygamy, cunningly marries the beautiful and intelligent adolescent Shirin in exchange for five bighas of land and a house in the city. From that moment, all harmony and rhythm vanish from Shirin's life. In the novel Phulbou, despite being educated, progressive, and mature, Rajia and Millat find their union obstructed by religion, society, and entrenched customs, as Millat is Rajia's stepson. The religious decrees and interpretations of the Qur'an and Hadith offered by Akbar Maulavi, the self-proclaimed guardian of religion, overpower Riyaz, Rajia, and Millat through the authority of religious zealots. The resistant and progressive educated individuals in this novel are ultimately defeated by the rigid and uncompromising dictates of society and religion.

Through these dark narratives of the Muslim inner household, Abu Bashar's social vision leaves us profoundly speechless.

Keywords: Muslim inner household, Qur'an-Hadith, religious fanaticism, divorce, halala marriage, polygamy, women's tragic life and suffering

বাঙালি মুসলিমদের আর্থসামাজিক অবস্থান লক্ষ করলে দেখা যায়, ব্রিটিশভারতে ইংরেজি শিক্ষা থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখায়, শিক্ষা ও সংস্কৃতির দিক থেকে তারা বর্ণশ্রেষ্ঠদের তুলনায় প্রায় একশো বছর পিছিয়ে পড়ে। খুব ধীরগতিতে ইংরেজি তথা আধুনিক শিক্ষার প্রতি তারা এগিয়ে আসে। উপরন্তু দেশভাগে তথাকথিত শিক্ষিত, সংস্কৃতিমনস্ক ও অর্থশালী মুসলিম জনসমাজ পূর্ব পাকিস্তান চলে যায়। এদেশে পড়ে থাকে মূলত অশিক্ষিত, পশ্চাদপদ, দরিদ্র ও গ্রামীণ অন্ধকারাচ্ছন্ন মুসলিম জনসমাজ, প্রায় ব্রাত্য হয়ে। বেশিরভাগ বর্ণশ্রেষ্ঠদের চোখে যারা দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী শ্রমজীবী, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, সাম্প্রদায়িক, অপরাধপ্রবণ এবং অপর। বাংলা সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে তাদের এই রূপই প্রকাশিত। বাংলা কথাসাহিত্যের সূচনা হয় মূলত প্যারিচাঁদ মিত্রের ‘আলালের ঘরের দুলাল’ (১৯৫৮) দিয়ে। ‘আলালের ঘরের দুলাল’এ আমরা ঠকচাচা ও ঠকচাচিও এর ব্যতিক্রম নয়। শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যে আমরা যে সমস্ত মুসলিম নর-নারীর পরিচয় পাই, তারা প্রায় সকলেই পাঠকের মনে পক্ষান্তরে মুসলিম বিদেষ জাগিয়ে তোলে। তাছাড়া ঠকচাচা থেকে শুরু করে জেবউন্নিসা পর্যন্ত যে সমস্ত চরিত্রের সঙ্গে আমরা পরিচিত, তারা কেউই বাঙালি মুসলিম জনসমাজের সার্বিক প্রতিনিধিত্ব করে না। ফলে বাঙালি জনসমাজের একটি বৃহত্তর অংশই তখন থাকে অন্ধকারে।

প্রকৃতপক্ষে কথাসাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করে দেখা যায়, আলালের ঠকচাচি অনেকটা বাস্তবানুগ নারীচরিত্র হলেও, ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক উপন্যাস ‘সফল স্বপ্ন’ ও ‘অঙ্গুরীয় বিনিময়’এর রাজকন্যা জহীরা ও রোশেনারার জীবন-দর্শন ও চাওয়া-পাওয়া সাধারণ মুসলিম নারীর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। একই কথা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘দুর্গেশনন্দিনীর’ আয়েষা, ‘কপালকুণ্ডলা’র মতিবিবি, ‘চন্দ্রশেখর’ উপন্যাসের দলনিবেগম ও ‘রাজসিংহ’এর জেবউন্নিসা-দরিয়া বিবি প্রসঙ্গেও বলা যায়। বাঙালি মুসলিম নারীর অন্দরমহলের সমস্যা ও সংকটের কথা, এইসমস্ত ঐতিহাসিক রোমান্সপ্রধান অসাধারণ নায়িকার জীবনের সঙ্গে মেলে না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘দালিয়া’ ছোটগল্পের আমিনা ও ‘দুরাশা’ ছোটগল্পে বদ্রাউনের নবাব, গোলাম কাদের খানের কন্যার মধ্য দিয়ে যে দুজন মুসলিম নারীর জীবনের চালচিত্র খুঁজে পায়, তাতে লেখকের মূল প্রতিপাদ্য ভিন্নধর্মী। ‘মুসলমানির গল্পে’ হাবিব খাঁর আশ্রিতা কমলার মানসিক পরিবর্তনকে রূপায়িত করেছেন। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘মহেশ’ ছোটগল্পের আমেনার জীবনের যে সমস্যা ও সংকটের কথা লেখক বলেছেন, তাতে প্রাধান্য পেয়েছে হিন্দুপ্রধান গ্রামের জমিদার ও পূজারি তর্করত্নের দাপটের কাছে হেরে যাওয়া দরিদ্র চাষি গফুরের কথা। শরৎচন্দ্রের ‘শ্রীকান্ত’ উপন্যাসের প্রথম পর্বে শাহজীর স্ত্রী অন্নদার জীবনযন্ত্রণার কথা আছে, যে মুসলমান বেদিনির জীবনযাপন করলেও, শাঁখাসিঁদুর ও নোয়া পরে, নিষ্ঠা সহকারে হিন্দুসংস্কার পালন করে। তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘তারিণী মাঝি’ ও ‘নারী ও নাগিনী’ গল্পদুটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। কিন্তু লেখক এখানে তারিণী মাঝি ও খোঁড়া শেখের মধ্য দিয়ে, মুসলিম জনসমাজের আর্থসামাজিক অবস্থানের বাস্তবতাকে রূপায়িত করলেও, সুখী ও জোবেদার মধ্য দিয়ে মূলত জৈব ধর্ম বা জৈব আসক্তির মত মানবজীবনের আদিম প্রবৃত্তিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পথের পাঁচালী’ উপন্যাসের তমরেজের সদ্যবিধবা স্ত্রীর জীবনসংগ্রামের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে, অন্নদারায়ের মত মহাজনের সুদের কারবারে বন্দী দরিদ্র কৃষকপত্নীর চরম আর্থিক সংকটের কথা। বনফুলের ‘তাজমহল’ ছোটগল্পে ফকির শাজাহানের ‘ক্যাংক্রাম অরিস’ রোগাক্রান্ত স্ত্রীর জীবন-মৃত্যুর লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে লেখক, মূলত স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ভালোবাসার এক অপূর্ব আলেখ্য রচনা করেছেন। যেখানে স্ত্রীর প্রতি ফকির শাজাহানের প্রেম, নিষ্ঠা ও সেবাপরায়ণতার কাছে, সম্রাট শাজাহানের তাজমহল অনেকটা ম্লান হয়ে যায়। সমরেশ বসুর ‘আদাব’ ছোটগল্পে প্রাক স্বাধীনতালগ্নে যে রক্তক্ষয়ী দাঙ্গার মধ্যে সম্প্রীতির আবহ রচিত, সেখানে মুসলিম মাঝির ইদের আগের

রাতে মৃত্যুকে কেন্দ্র করে, ‘পরবের দিন’ তার বিধবা স্ত্রী ও সন্তানদের রক্তরাঙা চোখের জলের অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে সুতা-মজুরের বিহ্বল দৃষ্টিতে।

তবে বেশকিছু কথাসাহিত্যিকের রচনায় মুসলিম অন্দরমহল উঠে এসেছে তার পরিপূর্ণ রূপ নিয়েই। এই প্রসঙ্গে কথাসাহিত্যিক নওয়াব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানীর ‘রূপজালাল’ (১৮৭৬) ও বেগম রোকেয়ার ‘পদ্মরাগ’ (১৯২৪) উপন্যাসটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই উপন্যাসদুটোতে মুসলিম নারীর লেখনীতে, মুসলিম অন্দরমহলের সমস্যা ও সংকট উঠে এসেছে। এখানে তালাক ও বহুবিবাহে জর্জরিত মুসলিম অন্দরমহলের যে যন্ত্রণাময় জীবনের বাস্তবতা ধরা পড়েছে, তা বাংলা কথাসাহিত্যে সম্পূর্ণ অভিনব। মীর মোশাররফ হোসেনের ‘বিষাদসিন্ধু’ উপন্যাসটিও এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায়। তিনটি পর্বে বিভক্ত (মহরম পর্ব- ১৮৮৫, উদ্ধার পর্ব- ১৮৮৭ ও এজিদবধ পর্ব- ১৮৯০) এই উপন্যাসের মূল বিষয়বস্তু সুদূর আরবের প্রেক্ষাপটে রচিত হাসান-হোসেনের সঙ্গে এজিদের বিরোধ তথা কারবালার প্রান্তে সংঘটিত যুদ্ধের করুণ পরিণতি হলেও, এর কাহিনি অংশে বর্ণিত বহুবিবাহের ভয়ানক বাস্তবতার মধ্যে ধরা পড়েছে মুসলিম অন্দরমহলের এক অন্ধকারময় জগৎ। জায়েদা ও জয়নব সুদূর আরবের বাসিন্দা হয়েও, বহুবিবাহ ও তালাকজর্জরিত মুসলিম অন্দরমহলের অভিশপ্ত জীবনের প্রতিনিধিত্বে, দেশ ও কালের গণ্ডি অতিক্রম করে সর্বজনীন হয়ে উঠেছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী কাজী নজরুল ইসলাম বাংলাসাহিত্যের অঙ্গনে বিদ্রোহী কবি রূপে সমধিক পরিচিত হলেও, তিনি ‘বাঁধনহারা’ (১৯২৭), ‘মৃত্যুক্ষুধা’ (১৯৩০) ও ‘কুহেলিকা’ (১৯৩১) নামে তিনটি উপন্যাস এবং বেশকিছু ছোটগল্পও লিখেছেন। নজরুল ইসলামের এই তিনটি উপন্যাসের কাহিনি অংশ জুড়ে প্রাধান্য পেয়েছে মুসলিম জনসমাজ। কিন্তু মুসলিম অন্দরমহলের যে চিত্র তিনি উপন্যাসে তুলে ধরেছেন, তার বাস্তব ভিত্তি সংখ্যালঘুদের জীবনের সঙ্গে অনেকটাই বেমানান। আব্দুল আযীয আল আমানের ‘শাহানী একটি মেয়ের নাম’ (১৯৬০) উপন্যাসটি এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। লেখক তাঁর এই উপন্যাসে পশ্চিমবঙ্গের দরিদ্র, পশ্চাদপদ, অশিক্ষিত মুসলিম জনসমাজের একটি বাস্তবসম্মত চিত্রকে রূপায়িত করেছেন। যে জনসমাজ বৈজ্ঞানিক যুক্তিতর্কের দ্বারা পরিচালিত না হয়ে, চোখ বন্ধ করে ধর্মগুরু মোল্লা ও মৌলবিদের বলা প্রথাবদ্ধ পথকেই অনুসরণ করে চলে। এই প্রসঙ্গে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ‘রস’ ছোটগল্পটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এখানে শরিয়তের বিধিকে অপব্যবহার করে, মিথ্যা অপবাদে মাজু খাতুনকে তালাক দিয়ে, মোতালেফ নিজের স্বার্থসিদ্ধি করে। সামান্য কিছু কিছু কথার আঁচড়ে ধরা পড়ে মুসলিম অন্দরমহলে প্রচলিত বিধবাবিবাহ, বহুবিবাহ ও বিবাহবিচ্ছেদে জর্জরিত নারীর দাম্পত্যজীবনের ঠুনকো নিরাপত্তার কথা। গৌরকিশোর ঘোষের ‘প্রেম নেই’ (১৯৮১) উপন্যাসটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই উপন্যাসে মূলত ১৯৩৫ সাল থেকে ১৯৩৭ সালের অন্তর্বর্তী সময়ে ভারতবর্ষের যে বৃহত্তর রাজনৈতিক, ধর্মনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটকে এক মহাকাব্যিক কলেবরে তুলে ধরেছেন লেখক, তাতে তৎকালীন মুসলিম অন্দরমহলের আর্থসামাজিক অবস্থানটিও সুন্দরভাবে রূপায়িত হয়েছে। সৈয়দ মোস্তফা সিরাজের ‘অলীক মানুষ’ (১৯৮৮) উপন্যাসে একাধারে ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য, বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্র ও ধর্মীয় রীতিনীতি তথা সমাজতত্ত্বের নানান দিক মহাকাব্যিক বিশালতায় ধরা পড়েছে। একই ধর্মের মানুষের মধ্যে ধর্মীয় আচার-আচরণের ভিন্নতা থেকেও যে বিরোধিতার সূত্রপাত হয়, তার এক বাস্তবসম্মত রূপও লেখক এই উপন্যাসে তুলে ধরেছেন।

তবে মহাস্বেতা দেবির ‘তালাক’ ছোটগল্পটি বিশেষ আলোচনার অপেক্ষা রাখে। ‘তালাকঃ উচ্চারণের রকমফের নিয়েই মুফতিদের বিরোধ’ প্রবন্ধে লেখক আফসার আমেদ বলেছেন,

“দাম্পত্যের ভিতর নিত্যনতুন নানা সমস্যা এসে পড়ে, তা কখনো রোষের বশবর্তী করে পুরুষটিকে। এটা বাস্তব সত্য। যেমন ক্ষিপ্ত পুরুষ স্ত্রীকে গালি দিতে গিয়ে খুব আহত করে

এমন গালি পর্যন্ত দিয়ে ফেলে। তেমনি ‘তালাক’ উচ্চারণের একটি সমধর্মী প্রবণতা অগ্রাহ্য করার উপায় নেই। সাধারণ্যে এমত তালাক দেওয়ার দৃষ্টান্ত সবচেয়ে বেশি। তার পরিণতি হয় মারাত্মক। পুরুষটির রাগ পড়ার পর আর কিছু করার থাকে না। স্ত্রীকে চলে যেতে হয় তার স্বামী সন্তান সংসার ছেড়ে। স্বামী তার ভুল বুঝতে পারার পরও পরিণতি এমনই ট্রাজেডির দিকে বাধ্যতায় যায়। অনেক সময় এমন বিবাহ বিছিন্ন স্বামী-স্ত্রী পুনরায় দাম্পত্য ফিরে পাবার জন্য যে ধর্মীয় পন্থার আশ্রয় নিয়ে থাকে তা খুব একটা গৌরবজনক নয়। বিগত স্ত্রীকে অন্য পুরুষের সঙ্গে বিয়ে দিতে হয়, সেই পুরুষটিকে দিয়ে নারীটিকে আবার তালাক দেওয়াতে হয়, তারপর পূর্বস্বামী পুনরায় বিয়ে করতে পারে নারীটিকে। এরকম দৃষ্টান্ত বিরল নয়।”^১

মহাশ্বেতা দেবী (১৯২৬-২০১৬) ‘তালাক’ ছোটগল্পে উক্ত সামাজিক সমস্যাকে রূপায়িত করেও, এক ভিন্নতর ও সম্মানীয় পথের সন্ধান দিয়েছেন, তালাকপ্রাপ্ত কুলসমের অসাধারণ মানসিকতার জায়গা থেকে। কুলসম ও আসগরের সুখী দাম্পত্য জীবনে একমাত্র বংশধরের চিকিৎসাকে কেন্দ্র করে চরম বিপর্যয় নেমে আসে। মতবিরোধের চরম পর্যায়ে আসগর রোষের বশবর্তী হয়ে, কুলসমকে তালাক দিয়ে বসে। আসগরের সংসারে তালাকপ্রাপ্ত কুলসমের আর কোন অধিকার থাকে না। তিল তিল করে গড়ে তোলা সংসারে যা কিছু অর্থ, সোনা ও রূপা সে জমিয়েছিল, তার সব কিছু নিয়েই কুলসম অভিমানে ঘর ছাড়ে। নিজের ভুল বুঝতে পেরে, আসগর ট্রাজেডির নায়কে পরিণত হয়। যেকোনো উপায়ে কুলসমকে ফিরে পেতে মরিয়া হয় সে। কিন্তু আসগরের দাম্পত্যে ফিরে যাওয়ার কদর্য পথ ‘হালালা’ বিয়ে কুলসম মেনে নিতে পারে না। অথচ ভালোবাসার মানুষ আসগরের সঙ্গে বসবাসের অভ্যেসও সে ত্যাগ করতে পারে না। তাই সমস্ত সামাজিক সমালোচনা, নিন্দা, ধর্মীয় বিধান ও পাপের ভয়কে উপেক্ষা করে সে, আসগরকে নিয়ে রাতের অন্ধকারে গ্রাম ছাড়ে। কারণ হিসেবে সে আসগরকে দৃঢ়স্বরে বলে, “মোরে হেঁপো উগী এরফানের ঘরে ঠেলছিলে, ই তা হতে ভাল নয়?”^২ তবে ধর্মীয় বিধানকে সে পুরোপুরি অগ্রাহ্যও করে না। সে তাই আসগরের সঙ্গে বসবাস করেও, একটা দূরত্ব বজায় রাখার সিদ্ধান্তে অটল। আর এখানেই কুলসম সেই সমাজ ও সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে অনেক বেশি আধুনিক হয়ে ওঠে। যে সমাজ বারবার ধর্ম ও পাপের ভয় দেখিয়ে নারীর সম্মান ও মর্যাদা নিয়ে খেলা করে, কুলসম তার অসাধারণ ব্যক্তিত্বে সেই সমাজের প্রচলিত আইনকে আমান্য করার দুঃসাহস দেখায়। আর্থিক স্বাবলম্বন নারীকে শক্তি ও সাহস যোগায় বলেই লেখিকা কুলসমকে আর্থিক দিক থেকে স্বনির্ভর করেন। মহাশ্বেতা দেবী তাঁর অসাধারণ প্রতিভাবলে প্রতিবাদী কুলসমের মধ্য দিয়ে, মুসলিম অন্দরমহলে এক প্রভাতরশ্মির ইঙ্গিত দিয়েছেন।

তবে যে সমস্ত কথাকারদের সাহিত্যে মুসলিম অন্দরমহলের বৈচিত্র্যময় আখ্যান তার সার্বিক পরিচয় নিয়ে উঠে এসেছে, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন আফসার আমেদ, আবুল বাশার ও আনসারউদ্দিন। আমাদের আলোচ্য আবুল বাশার। তিনি তাঁর কথাসাহিত্যে তালাক, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, অসমবিবাহ ও ‘হালালা বিবাহ’কে কেন্দ্র করে, মুসলিম পুরুষতান্ত্রিক অন্দরমহলে ধর্মের আশ্রয়ে নারীহননের যে বাস্তব চিত্র তুলে ধরার সাহস দেখিয়েছেন, তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য। মহাশ্বেতা দেবীর ‘তালাক’ ছোটগল্পের কুলসম নিজের মতো করে বাঁচার একটা পথ খুঁজে বার করলেও, আবুল বাশারের জাহেদা, মদিনা, রাবেয়া, কুলসম, শিরিন, নবীনা বা রাজিয়া শেষপর্যন্ত সমাজ ও ধর্মীয় আইনের সংকীর্ণ জটিলতায় হারিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। শিক্ষিত-অশিক্ষিত বা উচ্চবিত্ত-নিম্নবিত্ত সবধরনের সমাজেই, আবুল বাশারের নারীরা জীবনযন্ত্রণা থেকে মুক্তির কোন পথ খুঁজে পায় না।

আবুল বাশারের ‘সিয়ার’ ছোটগল্পে এগারো বছরের জাহিদাকে, আঠারো বছরের যুবক সুখবাসের শারীরিক চাহিদা মেটাতে গিয়ে, বিয়ের রাতেই মৃত্যুবরণ করতে হয়। বুকে লোমহীন সুখবাসের এই অমানবিক নিষ্ঠুরতায়,

সিয়ার নামটি যেন সার্থকতা লাভ করে। পিতা গিয়াসের চাকরির নিরাপত্তা ও ধর্মীয় নির্দেশ পালনেই জাহিদাকে অকালে ঝরে পড়তে হয়,

“মা জাহেদা, সুখবাসই তোমার সব মা। ইহকাল পরকালের সাথী। সুখদুঃখের শরীক। স্বামীর কথা কখনো অমান্য করো না। যখন যা চাইবে, সাথে সাথে পালন করবে। যত কষ্টই হোক, কোনো কিছুতেই না বলবে না। (হাদিসে আছে উটের পিঠে যেতে যেতে স্বামীর যদি কামনা জাগে, স্ত্রী তা সেই উটের পিঠেই নিবৃত্ত করবে।) কথাটা মুখ ফুটে বলতে পারলেন না গিয়াসজী। আটকে গেল। কেননা জাহেদার এখনো স্কুট পূর্ণিমা আসে নি। হয়েজ (মাসিক ঋতুস্রাব) হয়নি। কাঁচা নরম গা। হাড়গুলো পুরোপুরি শক্ত হয়নি।”^৩

সিয়ারের দ্বিতীয় স্ত্রী মদিনাকে বিনা অপরাধে তালাক পেতে হয়। যে মদিনার গরিব পিতা শুধুমাত্র একটু আশ্রয় ও সামান্য ভাতের আশায় সুখবাসের মত মানুষের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেয়, তালাকপ্রাপ্ত মদিনার জীবন সেদিক থেকে আরও বেশি অসহায় হয়ে পড়ে। তাই সুখবাসকে ভালবেসে, সুখবাসের আশ্রয়ে থাকার জন্যই সে ধর্ম নির্ধারিত ‘হালালা বিবাহে’ রাজী হতে বাধ্য হয়। কিন্তু রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি ও ষড়যন্ত্রের শিকার মদিনার আর কাক্ষিত আশ্রয়ে ফেরা হয় না। সে স্রোতের টানে এক আশ্রয় থেকে আর এক আশ্রয়ে ভেসে যেতে বাধ্য হয় নিজের স্বপ্ন ও ইচ্ছের বিরুদ্ধে। কোরান ও হাদিসের আয়াত তার জীবনে তখন আর শান্তি ও স্বস্তি নয়, নিরন্তর এক কান্নার সুর বয়ে আনে। সমাজ অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ লেখক আবুল বাশার জাহেদা ও মদিনার জীবনের মধ্য দিয়ে, মুসলিম অন্দরমহলের এক মর্মান্তিক সত্যকে প্রকাশ করেছেন।

লেখকের ‘নাস্তিক’ ছোটগল্পের শিক্ষিতা রাবেয়াও শেষপর্যন্ত অন্ধকারে চলে যায়। উচ্চবিত্ত পরিবারের পুত্রবধূ রাবেয়াকে, হামিদুল রোযের বশবর্তী হয়েই তালাক দেয়। কিন্তু ভালবাসার মানুষকে হারিয়ে উদভ্রান্ত হামিদুল, রাবেয়াকে পুনরায় ফিয়ে পেতেই, একসময়ের বন্ধু মামুনের সঙ্গে ‘হালালা বিয়ে’র ব্যবস্থা করে তিনমাসের জন্য। বন্ধু হামিদুলের ঋণ শোধ করার জন্য ও রাবেয়ার প্রতি দুর্বলতা থেকেই উচ্চশিক্ষিত, তালাকবিরোধী, প্রগতিশীল নাস্তিক অধ্যাপক, এই নিষ্ঠুর অমানবিক হালালা বিয়েতে রাজি হয়। হামিদুলের চেয়ে, মামুন রাবেয়ার অনেক বেশি প্রিয় মানুষ। এই প্রিয় মানুষের সঙ্গে আজীবন সংসার করার আকুলতা, তার সন্তানের জননী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা বারবার প্রকাশ করেও, রাবেয়া নিজের মতো করে বাঁচার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। বন্ধুর প্রতি সততায় মামুন একসময়ের প্রেমিকা রাবেয়াকে তালাক দেয়। হায়ার সেকেন্ডারি পাস করা রাবেয়া এই ভাবেই দুজন পুরুষের হাতে যন্ত্রণাদগ্ধ হতে থাকে। চরম অবমাননা, দুশ্চিন্তা ও ‘স্নায়বিক উত্তেজনা’ থেকে সে এক একসময় জ্বরগ্রস্ত হয়ে পড়ে, প্রলাপ বকে। রাবেয়ার সমস্ত যুক্তি, তর্ক ও প্রতিবাদ একসময় মামুনের কাছে ব্যর্থ হয়ে যায়। মামুন তাকে গোঁড়া ও হঠকারী হামিদুলের কাছে ফিরিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর। এখানে এসে মামুন নাস্তিক থেকে যেন মুসলমান হয়ে যায়। কিন্তু রাবেয়া জানে, মামুন তাকে স্পর্শ না করলেও, তাদের এই যাপনের সন্দেহ ও আঘাতে বারবার হামিদুল তার জীবনকে ক্ষতবিক্ষত করে তুলবে। তাই লেখক রাবেয়ার মধ্য দিয়ে, হালালা বিয়েতে বাধ্য নারীর অন্দরমহলের এক নিষ্ঠুর সত্যকে এইভাবে তুলে ধরেছেন,

“হামিদুলও আমায় চিরকাল সন্দেহ করবে। তুমি ওকে চেন না। তোমার চরিত্রের পবিত্রতা একটা ঠুনকো সেন্টিমেন্ট। মানুষের কাছে তার কোনোই দাম নেই। ... –কেন তবে তুমি আমায় বিয়ে করলে, বিয়ের সময় তোমার বিবেক কি লোভমুক্ত ছিল? আমাকে তুমি সাত দিন বাদে ফিরিয়ে দেবে, তখন আমার কী হবে? হামিদুল বিশ্বাস করবে না। ফের সে আমায় তালাক দেবে, তখন কী হবে, বল?”^৪

অথচ এই ভয় নিয়েই রাবেয়া হামিদুলের সংসারে ফিরে যেতে বাধ্য হয় ইন্দতকাল পেরিয়ে। লেখক রাবেয়ার জীবনের অন্য কোনো আলোকময় পথ নির্দেশ না করে, তাকে শেষপর্যন্ত বোরখায় আবৃত অন্ধকারের প্রাণী করে তোলেন।

অন্যদিকে লেখক ‘এক টুকরো চিঠি’র শিরিনকে আলোকময় পথের সন্ধান দিয়েও ধর্ম, অর্থ, সমাজ, রাজনীতি, প্রতিপত্তি ও অমানবিক নিষ্ঠুরতার কাছে হারিয়ে, চরম ভয়াবহ পরিণতির দিকে ঠেলে দেন। বহুবিবাহে আসক্ত পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রতিনিধি আখতার হাজী পাঁচ বিঘে জমি ও শহরের একটি বাড়ির বিনিময়ে, সুন্দরী ও মেধাবী কিশোরী শিরিনকে কৌশলে বিয়ে করে। তারপরেই শিরিনের জীবনের সমস্ত সুর ও ছন্দ হারিয়ে যায়। বুড়ো হাজীর স্পর্শে ভীত-সন্ত্রস্ত শিরিনের মর্মান্তিক জীবনের চিত্র লেখক তুলে ধরেছেন হাজীসাহেবের কন্যা মিনুর মধ্য দিয়ে,

“বাবা যেদিন শিরিনের ঘরে ঢুকতেন তাহাজুদের নামাজশেষে, সে রাত ছিল অত্যন্ত পাশবিক। শিরিন কাঁদতেন। মনে হত, শিরিনের গায়ে জোর করে কে যেন সুঁচ ফুটিয়ে দিচ্ছে। এক ধরনের বোবা কান্না শোনা যেত। ধর্ষণের সময় মেয়েরা বোধহয় এমনি করে কাঁদে। মাঝে-মাঝে পশুর মতন গোঁঙাতেন শিরিন। মা কেবল কপালে করাঘাত করে বলতেন—মেয়েটাকে শেষকরে দিলে হাজী। মেরে ফেললে গো।”^৫

শুধু তাই নয় শিরিনের জীবনের সমস্ত সাধ ও স্বাধীনতা হাজীর শাসনে হারিয়ে যায়। বাঙালি সাজসজ্জায় অভ্যস্ত শিরিনকে বোরখা পড়তে বাধ্য করা হয়। মাঝে মাঝেই হাজীসাহেবের মুসলিমলীগ অতিথিদের জন্য সারারাত জেগে চা ও খাবার যোগান দিতে গিয়ে ক্লান্ত শিরিনকে বারবার “বোরখা খুলতে হয়, আর পরতে হয়। শিরিন দম বন্ধ করে কেবলই বলেন, মাই লাইফ ইজ হেল। জাহান্নামের আগুনে বসিয়া হাসি পুষ্পের হাসি।”^৬ এই জাহান্নামের আগুন থেকে পালাতেই শিরিন একসময় আত্মহত্যার চেষ্টা করে। হাজীর চেষ্টায় সে প্রাণে বাঁচলেও, তার গর্ভের সন্তান নষ্ট হয়ে যায়। সেও জীবনের সমস্ত স্বপ্ন ও হাসি হারিয়ে নিস্প্রাণ পুতুল হয়ে ওঠে। কিন্তু কুলসমের দূরসম্পর্কের ভাই সাদিকুল, এই নিস্প্রাণ পুতুলে আবার প্রাণ ফিরিয়ে দেয়। প্রাণবায়ুতে ভরপুর শিরিন, হাজী সাহেবের অবাধ্য হলে, হাজীসাহেব প্রথম স্ত্রী কুলসমের সামনে শিরিনকে তালাক দেয়। এই তালাক শিরিনের জীবনে চরম মুজিরই নামান্তর। সে তার অর্জিত অন্ধের পারদর্শিতায় ও সাদিকুলের সহযোগিতায় আর্থিক স্বনির্ভর হয়ে, নিজস্ব ঘর গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখে। কিন্তু ভগ্নধার্মিক হাজী সাহেব রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহারে, একমাত্র সাক্ষী প্রথম স্ত্রী কুলসমকে আগাম এক তালাক দিয়ে ভয় দেখিয়ে ও মিথ্যার আশ্রয়ে শিরিনকে আবার দখল করে। শেষপর্যন্ত শিরিনের মতো একজন প্রাণবন্ত ও দক্ষ শিক্ষিকা ক্রমাগত জীবন যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত হতে হতে, জীবনের সমস্ত শক্তি হারিয়ে সেই জাহান্নামে পঙ্গু হয়ে পড়ে থাকে। শুধুমাত্র সমাজজীবন বা পরিবারজীবন থেকে নয়, তার গর্ভে লালিত সন্তানের অনুভূতি থেকেও সে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। অসাধারণ মেধাসম্পন্ন শিরিনের মতো কতশত মুসলিম নারী যে এভাবে অকালে হারিয়ে গেছে, তার ঠিকানা নেই। মুসলিম অন্দরমহলের এই অন্ধকারাচ্ছন্ন আখ্যান রচনায় আবুল বাশারের সমাজদৃষ্টি আমাদের বাকরুদ্ধ করে তোলে।

এই প্রসঙ্গে আবুল বাশারের ‘ফুলবউ’ (১৯৮৮) উপন্যাসটিও বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখে। এখানেও লেখক একটি বৃহত্তর পটভূমিতে মুসলিম সমাজে প্রচলিত বহুবিবাহ, অসমবিবাহ, হালালা বিবাহ ও তালাককে কেন্দ্র করে অন্দরমহলে নেমে আসা মর্মান্তিক বাস্তবতার প্রতি কটাক্ষ করেছেন। ‘এক টুকরো চিঠি’ ছোটগল্পের শিরিন, বুড়ো স্বামীর কাছে ধর্ষিত হয়ে, ‘জাহান্নামে’র পরাধীন জীবনযাপনে বাধ্য হলেও, ‘ফুলবউ’ উপন্যাসের

কিশোরী রাজিয়া কিন্তু বুড়ো স্বামী নিসার হোসেনের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে সক্ষম হয়। নিসারের চতুর্থ স্ত্রী হতে বাধ্য হলেও, বিয়ের রাতে কামার্ত স্বামীর হাত থেকে বাঁচতে

“বড় বউয়ের পায়ে বাসর ঘর থেকে ছিটকে আসে চৌদ্দ পনেরর একটি ভীরা যৌবন। বুঝে আমাকে বাঁচাও, আমি বুড়োর কাছে শুতে পারব না। আমার ভয় করছে। বুড়োর চোখ দুটি

জ্বলছে বুঝে, মনে হচ্ছে মড়া। আমি পারব না। আমাকে তোমার পায়ের কাছে শুতে দাও।”^৭

যদিও বিস্তারিত ‘ধ্বস্তাধস্তি’ পরেও কিশোরী রাজিয়াকে ‘বাগে’ আনতে না পারায়, নিসারের কঠিন শাস্তিতে তার কনুই পুড়ে যায়। অথচ শিক্ষিত ও সুন্দরী রাজিয়াকে, নিসারের মা একসময়, নিসারের পুত্রবধূ করার প্রস্তাব দিয়েছিল। পুত্র মিল্লাতের জন্য নির্বাচিত রাজিয়াকে বিয়ে করে নিসার হোসেন, রাজিয়ার দারিদ্র্যতার সুযোগ নিয়ে, শহরের বাড়ির বিনিময়ে। নবীসাহেবের সুনাম পালন করার নামে নিসার হোসেনের এই ভণ্ডামি কন্যা নবীনা ও পুত্র মিল্লাত মেনে নিতে পারে না। রাজিয়া বারবার নিসারের কাছে তালাক চায়, এমনকি তালাক না দিলেও ‘খালাস’ অর্থাৎ ইহলৌকিক মুক্তির জন্য নিসারের মৃত্যুশয্যায় উপস্থিত হয়। কিন্তু নিসারের কাছ থেকে অভিসম্পাত ছাড়া সে আর কিছুই পায় না। শহরের বাড়ির দখল নিয়েই রাজিয়ার সঙ্গে মিল্লাতের পরিচয়। অপরিচয়ের আঁধার কাটিয়ে পরস্পর পরস্পরের শুভাকাঙ্ক্ষী থেকে অনুরক্ত হয়ে ওঠে। এই প্রসঙ্গে আমাদের স্মরণে আসে মাইকেল মধুসূদন দত্তের ‘বীরঙ্গনা কাব্যের’ ‘সোমের প্রতি তারা’ পত্রিকার, গুরুপত্নী তারার, সন্তানসম স্বামীর শিষ্য সোমের প্রতি প্রেমে, বাঁধাহীন আকুলতার কথা। রাজিয়া ও মিল্লাত দুজনেই শিক্ষিত, প্রগতিশীল ও প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া সত্ত্বেও, সতীনপুত্র মিল্লাতের সঙ্গে রাজিয়ায় পরিণয়ে বাধা হয়ে আসে ধর্ম, সমাজ ও সংস্কার। ধর্মের রক্ষক আকবর মৌলবিদের ধর্মের বিধান ও কোরান হাদিসের ব্যাখ্যা, ধর্মধ্বজীদের প্রতিপত্তির কাছে হেরে যায় রিয়াজ, রাজিয়া ও মিল্লাত। ‘ফুলবউ’ উপন্যাসের প্রতিবাদী ও প্রগতিশীল শিক্ষিত মানুষেরা শেষপর্যন্ত পরাজিত হয় সমাজ ও ধর্মের কঠোর বিধানের কাছে। তাই শেষ পর্যন্ত রাজিয়া অন্ধকারে হারিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

যে সমাজে সাদিক বা মবিনের মত শিক্ষিত কিন্তু গোঁড়া অমানবিক চরিত্রের মানুষেরা বাস করে, সেই সমাজে অসহায় রাজিয়ারা ধর্ষিত হতে পারে, কিন্তু কোন সম্মানীয় পরিবারের পুত্রবধূ হতে পারে না বা জীবনের স্বপ্নপূরণ করতে পারে না, এই সমাজসত্যই লেখক এখানে প্রকাশ করেছেন। নবীনার শিক্ষিত কামুক স্বামী সাদিক, অন্য নারীতে আসক্ত হয়ে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে তোলা বা কোনো কুরূপা বিবাহের পাত্রীকে পাত্রস্থ করার জন্য, সুন্দরী রাজিয়ার সৌন্দর্যের টোপ ব্যবহার করার মত অন্যায় অমানবিক কাজ খুব সহজেই করে যেতে পারে। তাতেই এই সমাজের অন্দরমহলে আরও বেশি করে সংকট নেমে আসে। সাদিকের দ্বিতীয় বিবাহেও নবীনা মুক্তি পায় না। সাদিক নবীনাকে তালাক দিতে চায় না, নবীনার বাবার সম্পত্তি পাওয়ার লোভে। তালাক না পাওয়ায় ‘পরস্ত্রী’ নবীনা, ভালবাসার মানুষ রিয়াজকে বিয়ে করতে পারে না। তাই চরম মানসিক উত্তেজনায় সেও মৃত্যুর পরপারে হারিয়ে যায়। এইভাবেই পুরুষতান্ত্রিক সমাজের কুক্ষিগত ধর্মীয় ও সামাজিক বিধানে বারবার রাজিয়া বা নবীনারা হেরে যায়। তাদের জীবনের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা ও প্রতিবাদ একসময় থেমে যেতে বাধ্য হয়। তবে সমাজঅভিজ্ঞ কথাসাহিত্যিক আবুল বাশারের কথাসাহিত্যে অন্তঃপুরবাসিনীরা আলোকময় উত্তরণ খুঁজে না পেলেও, মুসলিম সমাজে ধর্মকে কেন্দ্র করে ঘটে চলা অধর্মের প্রতি তিনি যে দুঃসাহসিকতার সঙ্গে অঙ্গুলিনির্দেশ করেছেন, তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য। পুরুষতান্ত্রিক মুসলিম সমাজে সামাজিক ও অর্থনৈতিক দাপট তথা প্রচলিত ধর্মের অসঙ্গতি মুসলিম অন্দরমহলকে কতটা ভয়াবহ পরিণতির দিকে ঠেলে দিতে পারে, আবুল বাশার সেই সমাজসত্যকে দক্ষতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন।

আবুল বাশারের মুসলিম অন্দরমহলের যে সমস্ত নারীর সংকট ও সমস্যাকে রূপায়িত করেছেন, তাদের অধিকাংশই কোন না কোন দিক থেকে অসাধারণ। রাবেয়া, রাজিয়া বা শিরিনের সংখ্যা এই সমাজে খুবই সীমিত। তাঁর সৃষ্ট মুসলিম চরিত্রের বেশীরভাগই শিক্ষিত কিন্তু ধর্মের মোহে অন্ধ। এই গোঁড়া শিক্ষিত অন্দরমহলে নারী যেন আরও বেশি শোষিত, বঞ্চিত, পীড়িত ও ধর্ষিত। শিক্ষিত পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ধর্মের ভয়কে সহজেই জয় করতে পারে বলেই, তারা ধর্মীয় বিধানের অপব্যাখ্যা করে, ধর্মের বিকৃতি ঘটায় নিজেদের স্বার্থে। তাই বুঝি আবুল বাশারের কথাসাহিত্যে অন্তঃপুরবাসিনীর করুণ পরিণতি এতটা ভয়াবহ রূপে উঠে আসে। মুসলিম সমাজে অশিক্ষিত নরনারীর মনে, তালাককে কেন্দ্র করে পারলৌকিক ধর্মভয় কতটা গভীর, মহাশ্বেতা দেবীর কাছে তা হয়তো স্পষ্ট ছিল না। তাই তাঁর কুলসুম খুব সহজেই জীবনের চরম সমস্যার একটি সমাধান খুঁজে নেয়। অবশ্য অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর হওয়াটাও এখানে একটি বড় সমাধান। আবুল বাশারের নারীরা এদিক থেকে অনেকটাই পশ্চাদপদ। কারণ তিনি জানতেন মৌলবাদী, শিক্ষিত, প্রভাব প্রতিপত্তিশালী মুসলিম অন্দরমহলে নারীরা কতটা অসহায়। তাই হয়তো তাঁর অন্দরমহলের বাসিন্দারা বারবার হেরে যায় মৌলবাদী পুরুষতান্ত্রিক সমাজের কাছে।

তথ্যসূত্র:

১. আমেদ, আফসার। মুসলমান সমাজঃ নানাদিক, তালাকঃ উচ্চারণের রকমফের নিয়েই মুফতিদের বিরোধ। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ৫৮।
২. দেবী, মহাশ্বেতা। রচনাসমগ্র। ঊনবিংশ খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, এপ্রিল ২০০৭, পৃ. ২৯৬।
৩. বাশার, আবুল। গল্পগ্রন্থ সিমার, সিমার। আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা ৯, তৃতীয় মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮, পৃ. ১৫।
৪. বাশার, আবুল। গল্পগ্রন্থ সিমার, নাস্তিক। আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা ৯, তৃতীয় মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮, পৃ. ৯৪-৯৫।
৫. বাশার, আবুল। গল্পগ্রন্থ সিমার, এক টুকরো চিঠি। আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা ৯, তৃতীয় মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮, পৃ. ১১১।
৬. তদেব, পৃ. ১১৩।
৭. বাশার, আবুল। ফুলবউ। আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা ৯, একাদশ মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ২০১৫, পৃ. ৬১।



তারাক্ষর-রামকিঙ্কর-রঘুনাথ-ঋত্বিক: আধুনিকতার উপাদান- দেশ, দেশজ উপাদান ও মানুষ
গোবর্দ্ধন অধিকারী, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, চোপড়া কমলা পাল স্মৃতি মহাবিদ্যালয়, উত্তর
দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 24.12.2025; Accepted: 13.01.2026; Available online: 28.02.2026

©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license
(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

Abstract

Although four twentieth-century literary and artistic figures worked in different genres and forms, there was a remarkable similarity in their creative vision and thought. They placed indigenous elements at the very center of their creativity. Their modern intellectual pursuits were not shaped by reading foreign books or adopting foreign materials. Instead, the nation and its native cultural elements constituted the ultimate foundation of their artistic and literary practice.

Keywords: Literature, art, nation, indigenous elements, common people, life experience

সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতিতে দেশজ উপাদানের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। অর্থাৎ যে ভাষা-সংস্কৃতিকে শিল্পী উপস্থাপন করতে চাইছেন তার গভীরে গিয়ে তাকে অনুসন্ধান বা উপলব্ধি করা প্রয়োজন। দেশজ উপাদান এবং সেই সঙ্গে মানুষ; যা শিল্প-সাহিত্যের কাঁচামাল তাকে গুরুত্বের সঙ্গে অনুভব ও উপলব্ধি না করতে পারলে সেই শিল্প-সাহিত্য দীর্ঘস্থায়ী হয় না। অন্তত পাঠক-দর্শকের মনে তা প্রভাব ফেলে না। এসব বাদ দিয়ে কোনো শিল্পী সাময়িক সাফল্য লাভ করতেই পারে। কিন্তু দীর্ঘকালে তা তলিয়ে যায় হারিয়ে যায়। কালের কোণ্ঠি বিচারে তা টিকে থাকে না। মনে রাখতে হবে ছাঁচের ঠাকুর আর শিল্পীর হাতে গড়া ঠাকুর দুইয়ের মধ্যে বিস্তার পার্থক্য থাকে। ছাঁচে গড়া ঠাকুর মানে কলের তৈরি ঠাকুরে শিল্পীর মনের মাধুরী থাকে না। তাই সেখানে বৈচিত্র্য থাকে না। তা দর্শক গ্রহণ করে না। যদিও ছাঁচে তৈরি ঠাকুর অনেক বেশি ক্রটিহীন হয়ে থাকে। আর শিল্পী নিজের হাতে যে প্রতিমা বা কোনো ভাস্কর্য তৈরি করে সেখানে তিনি বিভিন্ন সময়ে বৈচিত্র্য আনতে পারেন স্বাধীনভাবে।

মূল কথা হল যে ভাষা-সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করে সাহিত্য-শিল্প রচিত হচ্ছে তাকে ভালো করে জানতে হবে। অর্থাৎ আমাদের দেশীয় ঐতিহ্যকে জানতে হবে এবং তাকে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। সেইসঙ্গে জানতে হবে বুঝতে হবে মানুষকে। যে মানুষকে আমরা সাহিত্যে-শিল্পে স্থান দিতে চাইছি তাকে মমতা দিয়ে অনুভব করতে হবে। তাকে সহানুভূতির সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। অর্থাৎ চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ থেকে বই পড়ে মানুষকে জেনে শিল্প-সাহিত্য রচনা করলে তার মধ্যে কৃত্রিমতা আসবে। অনেকটা কলের তৈরি জিনিস হবে। যা পাঠক-দর্শকের চিত্ত জয় করতে ব্যর্থ হবে। আমাদের এই মতের সপক্ষে আমরা পেয়েছি সাহিত্যিক তারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায়, চলচ্চিত্র পরিচালক ঋত্বিক ঘটক, শিল্পী রামকিঙ্কর বেইজ, শিল্পী রঘুনাথ গোস্বামীকে। এঁদের বাইরেও অনেকেই আছেন যাঁরা এই ধারণায় বিশ্বাসী ছিলেন বা আছেন। মনে পড়ে বিশ পর্ব-২, বিশেষ সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি, ২০২৬

শতকের ত্রিশের দশকে একদল সাহিত্যিকের আবির্ভাব হয়েছিল, যাঁরা বিদেশি সাহিত্য পাঠ করে বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতা আনতে চেয়েছিলেন। কল্লোল-কালিকলম-প্রগতি পত্রিকাকে কেন্দ্র করে আবির্ভূত সেইসব সাহিত্যিকদের অধিকাংশই পরবর্তীকালে আর টিকে থাকেননি। হারিয়ে গেছেন। কারণ তাঁদের সাহিত্যচর্চার শিকড় ছিল মাটির উপরে উপরে। মাটির গভীরে সেই শিকড় প্রবেশ করেনি। কেবলমাত্র নুট হামসুন, গোর্কি ইত্যাদি বিদেশি সাহিত্যিকের সাহিত্য পাঠ করে দেশের মানুষকে না জেনে না বুঝে সাহিত্য সৃষ্টি করতে গিয়ে তাঁরা দীর্ঘকালে টিকে থাকতে পারেননি। তবে হ্যাঁ তাঁদের গুরুত্ব অবশ্যই আছে। যে কারণে বুদ্ধদেব বসু ‘রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক’ প্রবন্ধে যথার্থই বলেছেন ‘ভাবীকালে এঁদের রচনা যে-রকমভাবেই কীটদষ্ট হোক-না’ ইতিহাস তিরিশের দশকের এই কবি-শিল্পীদের মনে রাখবে।’ এখন প্রশ্ন উঠতে পারে কবি ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় দেশজ উপাদান বহুল পরিমাণে থাকা সত্ত্বেও তিনি হারিয়ে গেলেন কেন। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন ঈশ্বর গুপ্তের মতো “এখন আর খাঁটি বাঙ্গালী কবি জন্মে না-জন্মিবার যো নাই-জন্মিয়া কাজ নাই।”^২ হ্যাঁ ঈশ্বর গুপ্ত একালে আর সেভাবে চর্চিত হন না। তাঁর রচনায় প্রবলভাবে দেশজ উপাদান থাকলেও তাকে কীভাবে উপস্থাপন করতে হয় বা তার মধ্যে উচ্চ কোনো ভাবকে তিনি যুক্ত করতে পারেননি। আম জনতার দরবারে তিনি একালে বিস্মৃত হলেও তাঁর কয়েকটি প্রবাদ কিন্তু একালেও বেশ চর্চিত হয়। যেমন- “রেতে মশা দিনে মাছি,/এই তাড়িয়ে কল্কেতায় আছি।”^৩ ঈশ্বর গুপ্ত দেশজ কবি হিসেবে আজও স্বীকৃতি এবং সম্মান পেয়ে থাকেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত পাশ্চাত্যে বিখ্যাত কবি হিসেবে স্বীকৃতি পেতে প্রচুর বিদেশি সাহিত্য পাঠ করেছিলেন। কিন্তু তিনি আমাদের কাছে বিখ্যাত হয়ে রইলেন দেশজ উপাদান নিয়ে সাহিত্য চর্চা করার জন্য। তিনি পাশ্চাত্য দার্শনিক ভাবনাকে দেশজ উপাদানের মধ্য দিয়ে উপস্থাপন করে বাঙালির হৃদয়ে চিরস্থায়ী আসন করে নিয়েছেন।

এখন প্রশ্ন হল আমরা বর্তমানের চরম ডিজিটাল দুনিয়ায় দাঁড়িয়ে এসব কাসুন্দি কেন ঘাঁটছি। কারণ এখন মানুষকে পর্যবেক্ষণ না করেই দেশকে না জেনেই ঘরে বসেই সাহিত্য রচিত হয়ে যাচ্ছে। তারপরে আক্ষেপ শুনতে হয় বাংলা সাহিত্যের বাজারে এখনও মৃত লেখকদেরই রবরবা। সাহিত্য-শিল্পের মধ্যে পাঠক-দর্শক কৃত্রিমতা পছন্দ করে না। আমাদের সহৃদয়হৃদয়সংবেদী পাঠক-দর্শক সজীবতা পছন্দ করে। চিত্তের আরাম অনুভব করতে চায়।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সমস্ত গল্প-উপন্যাসেই তুলে ধরেছিলেন তাঁর চোখে দেখা চরিত্রদের। লাভপুর এবং তার সন্নিহিত অঞ্চলের বিভিন্ন ঘটনা, প্রথা, সংস্কার-কুসংস্কার ইত্যাদিকে সজীব করে স্থান দিয়েছিলেন তাঁর সাহিত্যে। নিজের চোখে দেখেই ‘ডাইনী’ গল্প লিখেছিলেন। স্বর্ণ ডাইনী তাঁর চোখে দেখা। অনেকে সে সময় এই গল্প পাঠ করে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন যে বিদেশি কোনো গল্প পাঠ করে তা লেখা। কিন্তু স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁকে শংসাপত্র দিয়েছিলেন যে ‘ডাইনী’ একেবারে দেশিয় জিনিস। কলকাতা কেন্দ্রিক বিদেশি সাহিত্য পাঠ করা সাহিত্যিকরা সেদিন তা বিশ্বাস করেননি। ‘রসকলি’, ‘রাইকমল’ গল্পের বৈষ্ণবী তাঁর কাছারির কাছে আখড়াতে থাকত। নাম কমলিনী বৈষ্ণবী। সেই কমলিনীকে তিনি যেমন চোখে দেখেছেন তেমন করেই সাহিত্যে স্থান দিয়েছেন। ‘কবি’ উপন্যাসের নিতাই কবিরায় বা যে দেহজীবীদের কথা তিনি লিখেছেন এসব সেকালে এভাবেই জীবন্ত ছিল। ‘হাসুলীবাকের উপকথা’র মতো উপন্যাস জীবনকে উপলব্ধি না করলে বা কালারুদ্ধ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না থাকলে লেখা সম্ভব নয়। এইসব দেশজ উপাদান ও মানুষ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার পাশাপাশি তারাশঙ্কর ‘সাহিত্যিকের দায়িত্ব’ প্রবন্ধে জানিয়েছেন “সাহিত্যিক ও সাহিত্য কারও মুখাপেক্ষী নয়- না রাষ্ট্রের না সমাজের না ব্যক্তির। সে মুখাপেক্ষী সত্যের, সত্যের, ন্যায়ের।”^৪ অর্থাৎ সাহিত্যের মধ্য দিয়ে সত্যের বাণীকে তুলে ধরতে হবে। তারাশঙ্করের এই অবস্থান থেকেই

সেকালে কমিউনিস্টদের সঙ্গে বিরোধ বাধে। পার্টি লাইনকে স্বীকার করে উদ্দেশ্যমূলক সাহিত্য রচনাকে তিনি মেনে নিতে পারেননি। এই কারণে তাঁর একই উপন্যাসের একই ব্যক্তি আলোচনা করেন দুরকমভাবে। একবার প্রশংসা করেন এবং লেখক দলের কিছু সিদ্ধান্তের বিরোধীতা করলে মার্ক্সবাদে দীক্ষিত ওই একই আলোচক আবার সমালোচনা করেন।

ঠিক এই ভাবনা থেকেই আমরা পেয়ে যায় চলচ্চিত্র পরিচালক ঋত্বিক ঘটককে। ঋত্বিক নাটকে-চলচ্চিত্রে দেশের মানুষের কথা বলতে চেয়েছেন। দেশের মানুষের সমস্যা সাহিত্য-শিল্পের মাধ্যমে তুলে ধরার কথা বলেছেন বারংবার। ‘আমি মনে করি slogan mongering করে, বড়-বড় বাতেলা করে সমাধান দেখিয়ে দেওয়া আমার কাজ নয়। আমার নিজের ধারণা এদেশে কেউ সে-ভাবে সমস্যাগুলোকে ধরার চেষ্টা করেনি। আমি যদি সেটা করতে পারি, লোকের সামনে ছুঁড়ে ফেলতে পারি যে এই হল তোমাদের সমস্যা, এখন ভাবো- What is to be done- তা হলেই যথেষ্ট। আমার মনে হয় এটাই আমার কাজ’।^৫ অর্থাৎ সাধারণ মানুষের সমস্যা সাহিত্যের মাধ্যমে বা শিল্পের মাধ্যমে তুলে ধরে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া শিল্পী-সাহিত্যিকের কাজ। সেই সমস্যা সমাধানের পথ ভাবতে হবে সাধারণ মানুষকেই। ভাবা প্র্যাকটিস করতে হবে।

ঋত্বিক ঘটক মানুষকে জাগিয়ে তোলার জন্যই প্রথমে গল্প, তারপর নাটক এবং শেষে চলচ্চিত্রে পদার্পণ করেন। চলচ্চিত্রের মাধ্যমে সবথেকে বেশি লোককে ‘hit’ করা যায় তাই তিনি এটাই বেছে নেন। এর থেকে ভালো কোনো মাধ্যম পেলে তিনি চলচ্চিত্রকেও ত্যাগ করবেন জানান। মোদা কথা হল তিনি দেশের মানুষ এবং তাদের সমস্যাকেই নাটকে-চলচ্চিত্রে তুলে ধরতে চেয়েছেন। তিনি এও বলেছেন-

“আমি বিশ্বাস করি না যে, আমার কোনো শিল্পকর্ম করার অধিকার আছে, যদি না আমার দেশের এই সংকটকে কোনো-না-কোনোদিক থেকে উদ্ঘাটিত করে তুলতে পারি। আমার বেশিরভাগ ছবিই সেই সংকটকে ধরার চেষ্টা মাত্র।”^৬

অনেকে উপযুক্ত বিষয় না পেয়ে আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে। কিন্তু তা বেশিদিন চলে না। টিকে থাকে না। ‘সাম্প্রতিক নাটকের একটি সমস্যা’ নামক লেখায় ঋত্বিক

“আমাদের অধিকাংশ সাম্প্রতিক নাটকে মানবজীবন থেকে দূরে সরে যাওয়ার ব্যাপার ঘটছে। প্রতিটি শিল্পীর কাছে মানুষের সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে যাবার একটা প্রশ্ন আছে।”^৭

মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক থাকে না বলেই আঙ্গিকের কলাকৌশলের উপর বেশি জোর দিতে হয়। বিষয় নির্বাচনের মধ্য দিয়েই আঙ্গিক নির্ধারিত হয়ে যায়। এরফলে শেষপর্যন্ত যা হয় বক্তব্য বিষয়ের থেকেও আনুসঙ্গিক বড়ো হয়ে ওঠে। দর্শক-শ্রোতার মন জয়ে ব্যর্থ হয় আঙ্গিকসর্বস্ব শিল্পকলা। আঙ্গিকের এই বাড়বাড়ন্ত পাঠক-দর্শককে অভিভূত করতে পারে, কিন্তু পরক্ষণেই তা দূর হয়ে যায়। তারপরে কী পড়ে থাকে? গভীর শূন্যতা। ঋত্বিক শিল্পকর্ম বিষয়ে বলতে গিয়ে বারবার বলেছেন নাটক-চলচ্চিত্র তিনি করেছেন মানুষকে ভাবানোর জন্য। নাটক বা চলচ্চিত্রের শেষে পাঠক যেন কিছু একটা ভাবতে বাধ্য হয়। তবেই সেই শিল্পকর্ম সফল। দেশের মানুষের কথা সমস্যার কথা দেশজ উপাদান নিয়ে শিল্পের মধ্যে প্রকাশ করে মানুষকে ভাবাতে হবে তারই দেশ বা সমাজের সমস্যাটা কোথায়। সমস্যার সমাধান দেওয়া শিল্পীর কাজ নয়। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে সেকালের সমালোচকরা প্রায়ই অভিযোগ করতেন তিনি সমাজের সমস্যা দেখিয়েছেন, কিন্তু সমস্যার সমাধান দেননি। সমস্যার সমাধান করা শিল্পীর কাজ নয়। তা করতে গেলে শিল্প উদ্দেশ্যমূলক প্রচারধর্মী হয়ে পড়ে।

ঠিক এই জায়গা থেকেই আমরা যেতে পারি শিল্পী রামকিঙ্কর বেইজের কাছে। তিনি তো সম্পূর্ণ দেশীয় মানুষ। দেশজ উপাদান থেকেই কোনোরকম প্রশিক্ষণ ছাড়াই প্রথম রঙ বানাতে শিখেছিলেন। প্রকৃতির কাছ থেকে অনবরত শিখেছেন। গাছের পাতা থেকে নিজে রঙ বানিয়েছেন, শান্তিনিকেতনে আচার্য নন্দলাল বসুর সান্নিধ্যে আসার আগেই। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁকে বাঁকুড়ার গ্রাম থেকে নন্দলালের কাছে নিয়ে গেলে জল রঙ আর তেল রঙের কিছু ছবি দেখে বলেছিলেন “এখানে এসেছ কেন? তোমার তো শেখা হয়ে গেছে, আর কী শিখবে?”,^৮ ‘এই তো হয়ে গেছে, আর কেন?’ অর্থাৎ রামকিঙ্কর তখনই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে ফেলেছিলেন। তবুও দুই-তিন বছর শান্তিনিকেতনে থাকতে বললেন। এই হচ্ছে আসল শিক্ষা। প্রকৃতিই তো আমাদের প্রথম শিক্ষক। এসব আজকের দিনে পাগলের প্রলাপ বলে মনে হতে পারে। কিন্তু প্রকৃতিকে নিজের দেশকে মাটিকে না জেনে প্রকৃত শিল্পী হওয়া খুব মুশ্কিল। হচ্ছে না কি? অবশ্যই হচ্ছে। কিন্তু টিকে থাকার লড়াইয়ে হারিয়ে যায় সে সব। গভীর পর্যবেক্ষণ আর অনুধাবন না থাকলে প্রকৃত শিল্পী হওয়া যায় না।

রামকিঙ্কর যা শিখেছিলেন নিজের চেষ্টায়। চেষ্টা না থাকলে কোনো শিল্পকলাতেই তো সিদ্ধিলাভ সম্ভব নয়। শান্তিনিকেতনে কলাভবনের রবীন্দ্রনাথ নির্দেশিত শিক্ষাপদ্ধতিও ছিল স্ব-শিক্ষার। এক সাক্ষাৎকারে রামকিঙ্কর জানিয়েছেন-

“রবীন্দ্রনাথ নন্দলালকে বলেছিলেন, কারওকে কিছু শিখিও না, যে যা করতে চায় করুক। ‘নন্দলাল নিজেও নিজের কাজ করুক’, কবি বলেছিলেন, ‘ছাত্ররা তা-ই দেখে শিখবে, প্রেরণা পাবে’।”^৯

একালের কোনো আর্ট স্কুলে ছেলে-মেয়েকে কোনো শিক্ষক যদি এই ব্যবস্থায় শেখাতে যায় তাহলে সেই পাঠশালা বন্ধ হতে বেশিদিন সময় লাগবে না। প্রতিযোগিতার বাজারে এখন সবই খুব তাড়াতাড়ি শেখা চায়। শুধু তাড়াতাড়ি শিখলে হবে না। বাজারে তাড়াতাড়ি সুনাম অর্জন করতে হবে। এসব করতে গিয়ে আমাদের এমএ ক্লাসের এক মাস্টারমশাই বলতেন গুরুমারা বিদ্যের চর্চা চলছে।

বর্ষায় মোরামের রাস্তা ভিজে ধুয়ে যাওয়ার পর নীলরঙের এক ধরনের মাটি বের হয়। সেই মাটি দিয়েই রামকিঙ্কর প্রথম কিছু বানান। আর গ্রামে থাকতে রঙ হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন গাছের পাতার রস, বাটনা-বাটা শিলের হলুদ, মেয়েদের আলতা, মুড়ি ভাজার পর খোলায় লেগে থাকা ভুসোকালি। মনে পড়া রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘ছেলেবেলায়’ বলেছিলেন সেকালে শিশুদের খেলার উপকরণ থাকত খুবই কম। কিন্তু সেই স্বল্প উপাদান দিয়েই তারা কল্পনার জগতে স্বাধীনভাবে বিচরণ করে বেড়াত। শিল্পী রামকিঙ্কর বাল্যকালেই প্রকৃতি থেকে উপাদান নিয়ে প্রকৃতির কাছ থেকে পাঠ নিয়ে ভবিষ্যতের শিল্পী হবার সলতে পাকিয়ে ফেলেছিলেন। সুতরাং প্রকৃতির কাছ থেকে পাঠ নিয়ে দেশকে দেশের মানুষকে পর্যবেক্ষণ করেই প্রকৃত শিল্পসৃষ্টি সম্ভব। যা সৃষ্টি হবে তা মনের আনন্দেই সৃষ্টি হবে। উপাদান ও আঙ্গিকের প্রাচুর্য যেকোনো শিল্পকেই তার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশে বাধা দেয়। কৃত্রিমতা সেখানে এসে ভিড় করে।

রামকিঙ্কর একবার রবীন্দ্রনাথের একটি প্রতিকৃতি বা মূর্তি গড়ার প্রস্তাব দেন। কিন্তু এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ ভয় ছিল। কারণ বিদেশে তিনি দেখেছেন মূর্তি গড়িয়েরা জ্যান্ত মানুষকে ঘন্টার পর ঘন্টা বসিয়ে রেখে যন্ত্রপাতি দিয়ে নাক-মুখ মেপে কাজ করে। এই অবিকল ছাঁচ তৈরিতে রবীন্দ্রনাথের আপত্তি ছিল। রামকিঙ্কর বললেন-

“আমার কিছু মাপার দরকার নেই, আপনি নিজের কাজ করবেন, আমি পাশ থেকে আমার কাজ করে যাব।”^{১০}

অর্থাৎ শিল্পী স্বাধীনভাবে তার কাজ করবেন। অত মাপজোক করে কোনোকিছু নির্মাণ হয়, সৃষ্টি হয় না। শিল্প হচ্ছে শিল্পী অহৈতুকী আনন্দের ফসল। কেবলমাত্র সৌন্দর্যসৃষ্টিই তার লক্ষ্য। আর কবি তো অনেক আগেই বলেছেন সত্যি সৌন্দর্য। আর সত্যি শিল্পের আদর্শ। কীটস অনেক আগেই ‘Grecian Urn’ কবিতায় বলে গিয়েছেন- ‘Beauty is truth, truth is beauty.’

ঋত্বিক গণমানুষের কথা শিল্পের মাধ্যমে বলতে চেয়েছেন, যে কারণে তিনি গণনাট্য আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। রামকিঙ্করও বলেছেন শিল্পী হিসেবে “সমাজের প্রতি সব সময়ে কিছু-না-কিছু দায়িত্ব বর্তে যায়ই।”^{১১} তাই দাঙ্গা, দেশভাগ, যুদ্ধ ইত্যাদি শিল্পীকে প্রভাবিত করবেই। তারাশঙ্করও তাঁর ‘মম্বন্তর ও সাহিত্য’ প্রবন্ধে সাহিত্যের উদ্দেশ্য বলতে বোঝাতে চেয়েছেন ‘সর্বজনকল্যাণকর’ বিষয়কেই সর্বাত্মে সাহিত্যে স্থান দিতে হবে। তিনি সমগ্র পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের দেশের মানুষ যাতে সমগতিতে ছুটে চলতে পারে এবং নবজীবন আসে তা তিনি বারবার চেয়েছেন। আর তাই যে বিপ্লব আনে নবজীবন তাকে তিনি সাহিত্যে স্থান দিতে চেয়েছেন। কমিউনিস্ট পার্টির নির্দেশ মেনে সাহিত্য রচনার বিরোধী ছিলেন তারাশঙ্কর থেকে ঋত্বিক দু’জনেই। কিন্তু মানুষের কথা বলতে হবে, জীবনের কথা বলতে হবে- এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ-রামকিঙ্কর থেকে তারাশঙ্কর-ঋত্বিক সকলেই একমত। কারণ সাহিত্য-শিল্প তো মানুষের জন্যই।

রঘুনাথ গোস্বামী একজন গ্রাফিক শিল্পী ছিলেন। কমার্সিয়াল শিল্পী ছিলেন। তিনি বিভিন্ন মাধ্যম নিয়ে কাজ করেছেন। গ্রন্থের প্রচ্ছদ থেকে পুতুল নাচ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কাজ করেছেন। বিদেশে সেকালে অনুষ্ঠিত ভারত উৎসবের পরিকল্পনা ও তা রূপায়ণ করা তাঁরই দায়িত্ব ছিল। এইসব ক্ষেত্রেই তিনি দেশজ বিভিন্ন উপাদানকে বারবার স্থান দিয়েছেন। প্যারিস ইত্যাদি স্থানে ভারত উৎসবের জন্য তিনি ভারত থেকে দেশজ বিভিন্ন উপকরণ বড়ো বড়ো কনটেনারে করে নিয়ে গিয়েছিলেন। দেশের যে অঞ্চলের শিল্পীরা যে কাজটি ভালো করতেন তাদের দিয়েই সেই কাজটি করিয়ে নিতেন। কোনো কৃত্রিমতা সেখানে ছিল না। একই কারণে আলোক শিল্পী তাপস সেনকে নিয়ে যেতেন আলোর কাজ করার জন্য। রঘুনাথের প্রতিটা কাজেই দেশজ উপাদানকে গুরুত্বের সঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছিল।

পুতুল নাচ; যা একান্তভাবেই আমাদের দেশীয় এবং লোকজ একটি উপাদান তা দিয়ে তিনি যেমন নাটক করেছেন, তেমনি তা দিয়ে তিনি অ্যানিমেশনের বিকল্প একটি মাধ্যম তৈরি করতে পেরেছিলেন। অর্থাৎ ইচ্ছা থাকলে এবং একটু পড়াশোনা থাকলে, দেশজ ঐতিহ্য সম্বন্ধে সচেতন থাকলে আমাদের দেশীয় উপাদানের মাধ্যমে উৎকৃষ্ট শিল্প তৈরি সম্ভব। আজকের দিনে যখন অ্যানিমেশন ফিল্ম তৈরি হচ্ছে যেখানে জীবনের থেকে কলা-কৌশলের অতিরিক্ত ব্যবহার দেখা যাচ্ছে। মনে হয় তা যেন জীবনবিযুক্ত একটি শিল্প। আর জীবনবিযুক্ত শিল্পের কলা-কৌশল আমাদের সাময়িক মুগ্ধ করতে পারে, আমাদের কিংকর্তব্যবিমূঢ় করতে পারে। কিন্তু ওইটুকুই। পরক্ষণেই যখন আমাদের চক্ষু থেকে মায়া অঞ্জন দূর হয়ে যায় তখন আমাদের শূন্য হাতেই ফিরতে হয়। আসলে যে ব্যক্তি অ্যানিমেশনের সিনেমা বানাচ্ছেন তাকে কিছু দৃশ্য তৈরি করতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ সামগ্রিক গল্পের উপর তার কোনো হাত নেই। সামগ্রিকতার উপর বা Completeness বিষয়টা এখানে উপেক্ষিতই থেকে যায়। ঋত্বিক এ বিষয়ে ‘ফিল্ম ডিরেক্টর’ ও ‘ক্রিয়েটর’ এরকম দুটো ভাগ করেছেন। ফিল্ম ডিরেক্টর একজনের গল্প কেনে, একজনকে দিয়ে দৃশ্যগুলো লেখায় এবং নিজে ডিরেকশন দেয়। আর ঋত্বিক নিজেকে বলেছেন ‘ক্রিয়েটর’। কারণ গল্প থেকে সাউণ্ড, এডিটিং ইত্যাদি সবকিছু নিজেই করেন। এক্ষেত্রে যে ফিল্মটি তৈরি হল তা সম্পূর্ণ ওই ডিরেক্টরের সন্তান।

অ্যানিমেশন শিল্পী শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাইরের আলো প্রবেশ না-করা অফিসে বসে কম্পিউটারে স্থির কিছু চিত্রকে গতি দান করে বা সচল করে তোলে। বাইরের জীবনের সঙ্গে ওই শিল্পীর কোনো সম্পর্ক

অধিকাংশক্ষেত্রেই থাকে না। যক্ষপুত্রীর মতো অফিসে বসে সারাদিন কম্পিউটারে কাজ করে রাতে ক্লান্ত শরীর বিছানায় ফেলে দিতে হয়। হ্যাঁ সবাই এই পথে চলে না। কিন্তু অধিকাংশক্ষেত্রে এরকমই হয়ে থাকে। ফলে সে যন্ত্রের মধ্য দিয়ে যন্ত্রের মতো কিছু তৈরি করে। তাকে সৃষ্টি বলা যায়? মানুষকে বাদ দিয়ে সার্থক সাহিত্য-শিল্প সম্ভব নয়। রঘুনাথ গোস্বামী এ বিষয়ে ‘ভারতীয় শিল্পকলায় ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতিফলন’ প্রবন্ধে বলেছেন-

“... শিল্পকলা কোনও অপ্রয়োজনীয় সখের বস্ত্রবাহুল্য, জীবনের একটা অনাবশ্যক বা অপ্রধান বিষয় নয়। কোটের বোতাম ঘরে গুঁজে রাখা গোলাপফুলের মতো শিল্পকলাকে একধরনের শৌখিন কিছু ভেবে আমাদের অনুকম্পা করার কোনও কারণ নেই।”^{১২}

এখানে আর একটি বিষয় বলা প্রয়োজন- শিল্পী ও কারিগর। যিনি প্রতিমার সবকিছুই নিজের হাতে করেন মনের মাধুরী মশিয়ে তিনি হলেন শিল্পী। কিন্তু যে যন্ত্রের মতো কেবলমাত্র প্রতিমার চুল ঠিক করে বা কেবলমাত্র প্রতিমার রঙ করে তারা হল কারিগর। অর্থাৎ কারিগর ছাঁচের জিনিস তৈরি করে। শিল্পীর প্রতিটি দুর্গা মূর্তিই একইরকম, কিন্তু তবুও তাদের মধ্যে প্রত্যেকটিরই স্বতন্ত্র রূপ থাকে। কারিগর জিনিস তৈরি করে, সৃষ্টি করতে পারে না।

সাহিত্য-শিল্প সৃষ্টির ক্ষেত্রে দেশজ উপাদান এবং মানুষই হল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সাহিত্য সমাজের কথা তুলে ধরবে। সমাজকে সার্থকভাবে তুলে ধরতে হলে সর্বাত্মক সমাজকে জানা প্রয়োজন। সমাজকে জানার ক্ষেত্রেই বর্তমানে ঘাটতি থেকে যাচ্ছে। যতদিন যাচ্ছে মানুষ সমাজ-বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। মানুষে মানুষে কথা বলা এখন বারণ। মোবাইল স্ক্রিনেই এখন সবাই কথা বলে। উন্নয়নের ধাক্কায় একদিকে আমাদের খেলার মাঠ ক্রমাগত যখন ছিনতাই হয়ে যাচ্ছে, তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে মোবাইলের স্ক্রিন আমাদের হাতে চলে এসেছে খেলার মাঠের বিকল্প হিসেবে। বাল্য-কৈশোর এখন খেলার মাঠে বড়ো হয় না। ফলত একে-অপরকে জানার রাস্তা এখন বন্ধ। ফলত জীবনের অভিজ্ঞতা, জীবনকে পর্যবেক্ষণ করা এখন বাতুলতামাত্র। ফলত ছাঁচেগড়া সাহিত্য সৃষ্টি হওয়াই এখন স্বাভাবিক। যতদিন যাবে মানুষের সমাজ-বিচ্ছিন্নতা আরও বাড়বে। ফলত সাহিত্যে-শিল্পে কৃত্রিমতা আরও দিনদিন চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়তে থাকবে।

এখন প্রশ্ন উঠবে আমরা কি আধুনিকতার বিরুদ্ধে? আমরা কি নতুনকে স্বাগত জানাতে দ্বিধাবোধ করছি? না। আমাদের ভাবনার বিষয় মানুষ এবং দেশজ উপাদান। মানুষের জন্যই তো শিল্প-সাহিত্যের জন্ম। তাহলে সেই মানুষকে উপেক্ষা করে সৃষ্টি কীভাবে সম্ভব! উপাদানের স্বল্পতা ও জীবনকে যথাযথ দেখার অভিজ্ঞতা না থাকাতেই ফর্মুলা মেনে সাহিত্য সৃষ্টি হয়। ফর্মুলা মেনে শিল্প তৈরি হয়। ফলত সজীবতা থাকে না সাহিত্য-শিল্পে। বিঘ্নিত হয় চরিত্রবৈচিত্র্য। আমাদের যা কিছু সার্থক সৃষ্টি সবই যেন উনিশ-বিশ শতকেই হয়ে গেছে। সাহিত্য-শিল্পকলা সর্বত্রই বিগত কালেই শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হয়ে গেছে। যত সময় এগিয়েছে আধুনিকতা এসেছে আমরা ততই জীবনকে দূরে ঠেলেছি সাহিত্য-শিল্পকলা থেকে। তাই সেকালে শিক্ষার হার যথেষ্ট কম থাকা সত্ত্বেও বই বিক্রির হার ছিল ভালোই। যার অন্যতম প্রমাণ সেকালে কলেজ স্ট্রিট কেন্দ্রিক প্রকাশনীগুলির বইয়ের সংস্করণ ৩০০ বা ৫০০ কপিতে হতো না। ১১০০ টি বই বিক্রি হলে নতুন সংস্করণ হতো বা পুনর্মুদ্রণ করা হতো। এখন আবার এসে গেছে প্রিন্ট অন ডিম্যান্ড। অর্থাৎ যেমন চাহিদা তেমন ছাপাব। দরকার হলে পঞ্চাশটা বই, আবার দরকার হলে দশটা বইও ছাপানো যাবে। এ থেকেই প্রমাণিত হয় শিক্ষার হার যেভাবে বৃদ্ধি পেল সেভাবে গল্প-উপন্যাস পড়ার বা সাহিত্য পাঠ বাড়ল না। অবশ্য সাহিত্য পাঠ না বাড়ার পিছনে বহুবিধ কারণ আছে। তাই কেবলমাত্র লেখকদের দোষ দেওয়া যাবে না। কিন্তু পুরোনো লেখকরা এখনও জোর ব্যাটিং করে চলেছেন। যা প্রমাণ করে বর্তমানের লেখকরা বিষয় হোক বা

উপস্থাপনরীতির কারণে বৃহৎ পাঠকের মন জয় করতে ব্যর্থ হচ্ছে। আমাদের অভিযোগ তারাশঙ্কর থেকে ঋত্বিক ঘটক সাহিত্য-শিল্পের চর্চায় যে পথের কথা বলে গেছেন সেই পথ থেকে একালের সাহিত্যিক-শিল্পীরা বিচ্যুত হয়েছেন বলেই আজ এই অবস্থা। মানুষকে মানুষের সঙ্গে মিশে জানার অভাব এবং দেশকে না জেনে সাহিত্য-শিল্প সৃষ্টিতে একালের সাহিত্যিক, চিত্রশিল্পীদের আসার ফলে আঙ্গিক নিয়ে বড়ো চুলচেরা বিশ্লেষণ হয়ে চলেছে। যার ফলে একালে সৃষ্টির থেকে নির্মাণ বেশি হয়ে চলেছে। হ্যাঁ এ তো ঠিকই সব সাহিত্যিক-চিত্রশিল্পী-চলচ্চিত্র পরিচালক এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত নন। সেটাই এখনও আশার আলো দেখায়। শম্ভু মিত্রের একটা কথা দিয়ে এই আলোচনার আপাতত সমাপ্ত টানা যাক। ‘আজকের বাঙলা নাটকের অবস্থা ও ভবিষ্যৎ’ প্রবন্ধে তিনি জানিয়েছেন-

“কিন্তু শিল্প তো নিছক প্রমোদের বা আগুবােক্যের আফিম হিসেবে ব্যবহৃত হবার নয়। শিল্প মানুষের বোধের একটা হাতিয়ার। ... শিল্পও তেমনি মানুষকে বোঝবার, মানুষের সঙ্গে মানুষের এবং মানুষের সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক বোঝবার একটা অস্ত্র।”^{১৩}

দেশ এবং দেশের মানুষকে উপেক্ষা করে সার্থক সৃষ্টি সম্ভব নয়।

তথ্যসূত্র:

১. বসু, বুদ্ধদেব। রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক, সাহিত্যচর্চা। সিগনেট প্রেস, ১৩৬১, কলকাতা, পৃ. ১৫০।
২. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র। ঈশ্বরগুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব, বঙ্কিম রচনাবলী (প্রবন্ধ)। দে'জ পাবলিশিং, ২০১৭, কলকাতা, পৃ. ১০৬০।
৩. তদেব, পৃ. ১০৬৩।
৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর। সাহিত্যিকের দায়িত্ব, অগ্রস্থিত রচনাবলী। মিত্র ও ঘোষ প্রকাশনী, ২০১৫, কলকাতা, পৃ. ২২২।
৫. ঘটক, ঋত্বিক। নিজের পায়ে নিজের পথে: এক কথা-কোলাজ। বইপত্তর, ২০২৪, কলকাতা, পৃ. ৩১।
৬. ঘটক, ঋত্বিক। চলচ্চিত্র মানুষ এবং আরো কিছু। নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ২০০৩, ঢাকা, পৃ. ১৫৩।
৭. তদেব, পৃ. ১৯।
৮. বেইজ, রামকিঙ্কর। আমি চাম্ফিক, রূপকার মাত্র। বইপত্তর, ২০২৪, কলকাতা, পৃ. ২২।
৯. তদেব।
১০. তদেব, পৃ. ৬৩।
১১. তদেব, পৃ. ৯০।
১২. গোস্বামী, রঘুনাথ। ভারতীয় শিল্পকলায় ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতিফলন, রঘুনাথ গোস্বামী: গদ্যসংগ্রহ। গাঙচিল, ২০১৪, কলকাতা, পৃ. ৩১৩।
১৩. মিত্র, শম্ভু। প্রসঙ্গ: নাট্য। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৭১, কলকাতা, পৃ. ১০৭।



ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal

ISSN: 2454-1508

Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)

Volume- II, Special Issue, February, 2026, Page No. 54- 59

Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711

Website: <https://www.atmadeep.in/>

DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.specialissue.W.269



সুধাকর দলের সাহিত্যসাধনায় হজরত উমর ফারুকের (রাঃ) প্রাসঙ্গিকতা- ইতিহাসের আঙ্গিকে পর্যালোচনা

মৌসুমী দত্ত, সহকারী অধ্যাপিকা, ইতিহাস বিভাগ, সামসী কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 05.01.2026; Accepted: 18.02.2026; Available online: 28.02.2026

©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

Abstract

Christian missionaries who came to India, particularly to Bengal, from the West began to weaken the foundations of Islam by attacking it with abusive and derogatory language. Toward the end of the nineteenth century, the *Sudhakar Group* of Bengal stepped forward to provide an appropriate response to this aggression. Centered around the journal *Sudhakar*, a number of talented Bengali Muslim writers united, collectively known as the “Sudhakar Group.”

By presenting Islam correctly to the Muslim masses of Bengal, they established an ideal example that remains unparalleled. The second Caliph, Hazrat Umar (RA), followed the life and teachings of Prophet Muhammad (SAW). He succeeded in spreading Islam throughout the world and safeguarding it from the hands of the unbelievers. Drawing inspiration from the life and teachings of Hazrat Umar (RA), the Sudhakar Group initiated an intellectual movement and refuted the defamatory propaganda against Islam. Their success should not be underestimated. They had neither wealth nor manpower. Despite the lack of patronage, they possessed deep devotion and unwavering faith in Islam.

Protecting the Muslim community of Bengal from the conversion efforts of Christian missionaries and simultaneously promoting Islam through Bengali writings centered on the life and teachings of Hazrat Umar (RA), who was regarded as a guiding light of the Islamic community—these efforts of the Sudhakar Group stand as a bright example for future generations.

Keywords: Literature, Islam, Umar, Sudhakar, Muslim

সাহিত্য মানবমন ও সমাজজীবনের প্রতিবিম্ব। সাহিত্য মানুষের অস্তিত্বের গভীরতাকে তুলে ধরে। সাহিত্যে মানুষের সমস্যা, জীবনধারা, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, আনন্দ-বেদনা, এবং পরিবর্তনের ধারা প্রতিফলিত হয়। এ প্রসঙ্গে ম্যাক্সিম গোর্কির উক্তি প্রণিধানযোগ্য,

“Literature is the heartbeat of society. When the sorrows, sufferings, and joys of society find expression in language, only then does it become literature.”³

তাই কোনও সমাজের রাজনীতি, সংস্কৃতি সম্পর্কে গভীরভাবে জানতে হলে সেই সমাজ সম্পর্কে লেখা রচনার উপর নির্ভর করতে হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে উনিশ শতকের শেষ পর্বের সুধাকর দলের সাহিত্যের কথা উল্লেখ করা যায়। সুধাকর দলের লেখকদের কাছে ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হজরত উমর ফারুক (রা.) ছিলেন এক আদর্শ ও প্রেরণাদায়ী ব্যক্তিত্ব। সুধাকর দলের লেখকরা হজরত মহম্মদের (সা.) জীবন ও বাণীকে কেন্দ্র করে গ্রন্থ লেখার পাশাপাশি হজরত উমর ফারুক (রা) এর জীবন ও কর্মকে ভিত্তি করে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ রচনা লিখেছিলেন। এর ফলস্বরূপ বাংলার মুসলিম সমাজ অনেকাংশে খ্রিষ্টান ধর্মান্তকরন থেকে রক্ষা পেয়েছিল।

রাশেদীন খিলাফতের দ্বিতীয় খলিফা হজরত উমর ফারুক (রা) অথবা উমর ইবনুল খাত্তাব (৬৩৪-৬৪৪ খ্রিস্টাব্দ) ছিলেন ইসলামের ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। তাঁকে কেউ কেউ ইসলামের ‘সেন্ট পল’^২ বলেছেন। তিনি প্রাথমিকভাবে ইসলামের বিরোধী ছিলেন, কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পর তিনি নবী মুহাম্মদ (সা.) এর অন্যতম একনিষ্ঠ অনুসারী হয়ে ওঠেন। দ্বিতীয়ত, তিনি ইসলাম প্রচারে সফল হয়েছিলেন এবং আরবের মুসলিম সমাজকে খ্রিষ্টান ও ইহুদিদের মতো কাফেরদের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। হজরত উমর (রা) বাইজান্টাইন ও পারস্য উভয় সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিজয়ের মূল কাণ্ডারী ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন আপসহীন নীতিবাদী ব্যক্তি। তাঁর কার্যকলাপের জন্য তিনি ‘আল-ফারুক’^৩ বা ‘সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী’ উপাধি পেয়েছিলেন। তাঁর খেলাফতের সময় ইসলামি সাম্রাজ্যের ব্যাপক বিস্তার ঘটে। সুধাকর দল হজরত উমর (রা) ফারুকের জীবনী লেখার মাধ্যমে তৎকালীন বাংলার মুসলিম সমাজকে এই বার্তা দিতে চেয়েছিলেন যে ইসলামি শাসন মানে কেবল গোঁড়ামি নয়, বরং তা হল এমন একটি প্রগতিশীল, জনকল্যাণমূলক ও সুশৃঙ্খল রাষ্ট্রব্যবস্থা^৪, যা আজও আধুনিক বিশ্বের জন্য অনুকরণীয় রূপে গণ্য হতে পারে।

উনবিংশ শতকের ষষ্ঠ-সপ্তম দশকে বাংলায় ইসলামের শুদ্ধ অনুশীলন, কুসংস্কার দূরীকরণ এবং মুসলমানদের ধর্মীয় ও সামাজিকভাবে সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে গড়ে ওঠা ধর্মীয়-রাজনৈতিক আন্দোলন তথা ফরাজী এবং ওয়াহাবী আন্দোলন ইংরেজরা কঠোরভাবে দমন করেছিল। ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে খ্রিষ্টান যাজক ও মিশনারিরা এদেশে এসেছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল খ্রিষ্ট ধর্মের প্রচার। কিন্তু ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী যাজক সম্প্রদায়ের ধর্ম প্রচারকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করেছিল। মুসলমানদের উপর শাসকের আক্রমণের প্রভাব প্রধানত সবচেয়ে বেশি হয়েছিল। তার ফলে দীর্ঘকাল পর্যন্ত মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা, সামাজিকভাবে সংগঠিত হওয়া ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ে। অবিভক্ত বাংলাদেশের ইংরেজ রাজত্ব শুরু হবার পরে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে মুসলমানের মধ্যেও ইংরেজ প্রভাব অনুপ্রবিষ্ট হতে থাকে। এ সময়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার কিছু মুসলমান খ্রিষ্টান হতে থাকে। অশিক্ষা, নিজ ধর্মের প্রতি শিথিল বিশ্বাস এবং আর্থিক সুবিধা ও সাংসারিক মোহই স্বধর্ম ত্যাগ করে তদানীন্তন রাজধর্ম গ্রহণে তৎকালীন বাংলার মুসলমানদেরও অনুপ্রেরণা দিয়েছিল।^৫

উনিশ শতাব্দীতে হিন্দু সমাজকে এই ধরনের খ্রিষ্টান ধর্ম-মুখিতা থেকে বাঁচিয়েছিলেন রাজা রামমোহন রায়, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মতো ব্যক্তিত্ব। শতাব্দী শেষে মুসলমানদের মধ্যে এরকম আন্দোলন শুরু করেছিলেন যশোর নিবাসী বাগ্মীপ্রবর মুন্সী মেহেরুল্লাহ এবং তারই হাতে দীক্ষিত মুন্সী মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন।^৬ এঁদের প্রধান অবলম্বন ছিল ওয়াজ। গ্রামে গ্রামে জেলায় জেলায় বক্তৃতা করে মুন্সী মেহেরুল্লাহ আশাতীত ফলও পেয়েছিলেন। তিনি গভীরভাবে খ্রিস্টানদের বাইবেল পাঠ করেছিলেন, হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থগুলো পাঠ করেছিলেন এবং ইসলাম কুরআন-হাদীস তাঁর আয়ত্তে ছিল। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে তিনি যুক্তির সাহায্যে যেভাবে খ্রিস্টানদের ধর্ম বিষয়ক নানাবিধ সিদ্ধান্তকে খণ্ডন করেছিলেন তা আজকের দিনের আলোকেও অনন্য সাধারণ। বাঙালী মুসলিম সমাজকে রক্ষা করার ব্যাপারে মুন্সী মেহেরুল্লাহর দান অনস্বীকার্য হলেও তিনি এবং তার

অনুগামী জমিরুদ্দীন সংঘবদ্ধ হয়েও সেদিন আপামর মুসলিম সমাজের মধ্যে জাতীয় চেতনা সৃষ্টি করতে পারেননি। তবে এঁদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সেই যুগের বাঙালী মুসলমানদেরকে ইসলামমুখী করে তুলেছিল একটি বিশেষ দল। সে দলটিকে ‘সুধাকর দল’ আখ্যা দেওয়া যেতে পারে।^১

“খ্রিষ্টান মিশনারিদের আক্রমণাত্মক প্রচারণার মুখে মুসলমান সমাজ যখন দিশেহারা, তখন সুধাকর দলই প্রথম কলম ধরে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও যুক্তিনিষ্ঠা প্রমাণে সচেষ্ট হয়।”^২

সুধাকর দলের মধ্যে প্রধান সদস্যরা ছিলেন খুলনা জেলার সাতক্ষীরার অন্তর্গত বাঁশদহের অধিবাসী এবং কলকাতা ডভটন ও সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের আরবী ও ফারসীর অধ্যাপক মৌলবী মেয়রাজউদ্দীন আহমদ, ময়মনসিংহের টাঙ্গাইলের অন্তর্গত চাড়ানের অধিবাসী এবং কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসার বাংলা ও সংস্কৃতের অধ্যাপক পণ্ডিত রেয়াজুদ্দীন আহমদ মাহাদী, বশিরহাটের মোহাম্মদপুর নিবাসী মুন্সী শেখ আবদুর রহিম এবং ত্রিপুরা জেলার রূপসার অধিবাসী মুন্সী মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ। প্রাথমিকভাবে এই দল প্রয়োজনীয় অর্থ ও ব্যবস্থাপনার অভাবের জন্য মুসলিম কৃষ্টি এবং ইসলামের তত্ত্বকথা সংক্রান্ত কতগুলো বই-এর অনুবাদ করে তা খণ্ড খণ্ড আকারে প্রকাশ করেছিলেন। এরপর এরা ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে সুপণ্ডিত এবং অভিজ্ঞ মনীষী জামালুদ্দীন আফগানী দ্বারা ফারসী ভাষায় রচিত ‘নেচার এবং নেচারিয়া’ নামক গ্রন্থের অনুবাদ করে তাকে ‘এসলাম তত্ত্ব’ নাম দিয়ে প্রথম খণ্ড প্রকাশ করেছিলেন। এর অল্পদিন পরেই মওলানা আব্দুল হক হাক্কানীকৃত ‘তফসিরে হাক্কানী’র উপক্রমণিকা ভাগ থেকে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিবাদক বিষয়গুলি অনুবাদ করে ‘এসলাম তত্ত্ব’ রূপে দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল। ‘এসলাম তত্ত্ব’ [বা মুসলমান ধর্মের সার সংগ্রহ] এর প্রথম খণ্ড ১২৯৪ বঙ্গাব্দ, আশ্বিন মাসে অর্থাৎ ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে এবং দ্বিতীয় খণ্ড ১২৯৫ বঙ্গাব্দ বা ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল।^৩ এসলাম তত্ত্ব খুব বেশী দিন চলেনি। তবু এর বিক্রয়লব্ধ অর্থে এবং ময়মনসিংহ করটিয়ার জমিদার হাফেজ মাহমুদ আলী খান এবং বর্ধমানের কুসুম গ্রামের জমিদার মুন্সী মোহাম্মদ এব্রাহিমের অর্থানুকূলে শেখ আবদুর রহিম এবং মুন্সী মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ, ‘সুধাকর’ নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। ১৮৮৯ সালের আশ্বিন মাসে প্রথম সংখ্যা ‘সুধাকর’ প্রকাশিত হয়েছিল। সৈয়দ আলী আহসানের মতে, এই দলের মূল উদ্দেশ্য ছিল বাংলা সাহিত্যে হিন্দু লেখকদের প্রভাব এবং খ্রিষ্টান মিশনারিদের অপপ্রচারের মোকাবিলা করে মুসলিম বীরদের বীরত্বগাথা ও ইসলামের প্রকৃত ইতিহাস প্রতিষ্ঠা করা। তাঁর গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে,

“রেয়াজউদ্দীন আহমদই প্রথম অনুভব করেছিলেন যে, বাংলায় মুসলমানি ইতিহাস ও ঐতিহ্যের বড়ই অভাব এবং এই অভাব পূর্ণ না হলে জাতির মানসিক মুক্তি সম্ভব নয়।”^৪

সুধাকর দলের লেখকদের রচনায় হজরত উমর ফারুক (রা)-এর জীবনী ও তাঁর শাসনব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে আলোচিত হয়েছে। এদের প্রধান লক্ষ্য ছিল মুসলমানদের গৌরবময় ইতিহাস ও আদর্শকে বাংলার মুসলিম জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

“রেয়াজউদ্দীন আহমদের রচনা কেবল জীবনী নয়, বরং তা ছিল একটি জাতির জাগরণের মন্ত্র। উমর ফারুকের বীরত্বগাথা বর্ণনা করে তিনি মুসলমানদের হারানো শৌর্য-বীর্য মনে করিয়ে দিতে চেয়েছিলেন।”^৫

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে বাংলা সাহিত্যে মুসলিম বীরদের জীবনী ও ইতিহাস লেখায় যে শূন্যতা তৈরি হয়েছিল, মূলত তা পূরণে ‘সুধাকর’ দল এগিয়ে এসেছিল। এক্ষেত্রে ইসলামি ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টায় বিশেষভাবে হজরত উমর (রা)-এর জীবনী রচনা গুরুত্ব পেয়েছে। শেখ আবদুর রহিম (১৮৫৯-১৯৩১) ছিলেন সুধাকর দলের প্রাণপুরুষ।^৬ তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল ইসলামের প্রকৃত ইতিহাস ও মহত্ব বাংলা ভাষায় প্রচার

করা। ড. খন্দকার সিরাজুল হক তাঁর গ্রন্থ ‘শেখ আবদুর রহিম: জীবন ও সাহিত্য’ (বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৭০) এ বলেছেন যে শেখ আবদুর রহিম এবং তার সহকর্মীরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, ইংরেজি বা ফারসি ভাষায় লিখলে তৃণমূল স্তরের বাঙালি মুসলমানের কাছে পৌঁছানো সম্ভব নয়। তাই তারা সাধারণ বাঙালি মুসলমানের কাছে পৌঁছানোর জন্য মাতৃভাষা বাংলাকেই হাতিয়ার হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। তিনি আরবি-ফারসি মিশ্রিত বাংলার পরিবর্তে শুদ্ধ বাংলা ভাষায় লিখতেন। তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ‘ইসলাম ইতিবৃত্ত’ এবং অন্যান্য ঐতিহাসিক প্রবন্ধে হজরত উমরের (রা) শাসনব্যবস্থা, ন্যায়বিচার এবং তাঁর ‘ফারুক’ (সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী) উপাধির তাৎপর্য পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি উমর (রা)-এর প্রশাসনিক সংস্কারগুলোকে বাঙালি মুসলমানদের সামনে আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার মডেল হিসেবে তুলে ধরেন।

পণ্ডিত রেয়াজউদ্দীন আহমদ মাশহাদী (১৮৫৯-১৯১৯) ছিলেন এই দলের সবচেয়ে বাগ্মী সদস্য। তাঁর লেখায় তীব্র জাতীয়তাবাদ ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির আভাস দেখা যায়। তাঁর ‘সমাজ ও সংস্কারক’ (১৮৮৯) গ্রন্থে হজরত উমর (রা)-এর শাসনকালকে তিনি যেভাবে বর্ণনা করেছেন, তার একটি লাইন উল্লেখ করা হল (মূল বইটির ভাষা ছিল সাধু রীতিতে)। মাশহাদী উমরের (রা) বীরত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন,

“খলিফা উমর ফারুকের ন্যায়বিচার ও তেজস্বিতা যদি আজ মুসলিম সমাজের আদর্শ হইত, তবে এই অবনতি ঘটিত না। তিনি অর্ধ-পৃথিবী শাসন করিয়াও সামান্য পর্ণকুটির বাস করিতেন এবং সাম্যের মূর্ত প্রতীক ছিলেন।”

মাশহাদী দেখিয়েছেন কীভাবে একজন শাসক সাধারণ মানুষের মতো জীবনযাপন করেও পৃথিবীতে বিশাল এক সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হয়েছিলেন। মুন্সি মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদের (১৮৬২-১৯৩৩) অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ ইসলামি ইতিহাস ও জীবনী বিষয়ক গ্রন্থ ১৮৮৫ থেকে ১৯১০ সালের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল। বিশেষ করে ১৮৮৩ সালে কলকাতায় যাওয়ার পর তিনি শেখ আবদুর রহিম ও মেয়াজউদ্দীন আহমদের সাথে মিলে ইসলাম প্রচার ও ইসলামের ইতিহাসের বিকৃতি রোধে লেখালেখি শুরু করেছিলেন। এই ধারাবাহিকতায় তিনি ‘হজরত উমর (রা)-এর জীবনী’ এবং তাঁর বিখ্যাত তিন খণ্ডের ‘ইসলাম-ইতিহাস’ রচনা করেন। এই গ্রন্থটি রচনার পেছনে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও ধর্মীয় কারণ ছিল বলে মনে করা হয়। প্রথমত, ১৮৮০-এর দশকে অবিভক্ত বাংলার ঢাকা, যশোর, খুলনা ও ২৪-পরগনা অঞ্চলে অনেক মুসলিম খ্রিষ্টধর্ম বা ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করছিলেন। মুসলিম সমাজকে তাঁদের স্বধর্মের গৌরবময় ইতিহাস ও আদর্শের কথা মনে করিয়ে দিয়ে এই ধর্মীয় রূপান্তর রোধ করতে তিনি হজরত উমর (রা)-এর মতো মহাপুরুষদের জীবনী লেখেন। দ্বিতীয়ত: তিনি সাধারণ মুসলিমদের মধ্যে বাংলা ভাষায় ইসলামের প্রকৃত ইতিহাস ও খলিফাদের শাসনকাল সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করতে এটি রচনা করেন। তৃতীয়তঃ সুধাকর দলের সদস্যদের মূল লক্ষ্য ছিল ইসলামি সাহিত্য ও ইতিহাসকে সহজ বাংলায় ভাষায় মুসলিমদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হজরত উমরের (রা) জীবনী রচনার মাধ্যমে তিনি তৎকালীন মুসলিম সমাজের কাছে হজরত উমরকে (রা) ন্যায়বিচারক, প্রশাসনিক দক্ষ, বীর ও চারিত্রিক দৃঢ়তার একটি জীবন্ত প্রতিমূর্তি রূপে অঙ্কিত করেছিলেন।^{১৭} বস্তুতপক্ষে, মুন্সি মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ তাঁর লেখনীর মাধ্যমে মুসলিম সমাজের বিস্মৃত জাতিসত্তাকে তাঁদের গৌরবময় অতীতের সাথে সংযুক্ত করতে চেয়েছিলেন।

‘সুধাকর’ পত্রিকা নানা বিপর্যয়ের ভেতর দিয়ে বেশ কিছুদিন চলেছিল। এই পত্রিকার মাধ্যমেই বাংলা ভাষায় বাঙালী মুসলমানেরা তাদের ধর্মের মহিমা, তত্ত্ব, তথ্য, জাতীয় ঐতিহ্য ও গৌরব সম্বন্ধে কিছুটা সচেতনতা লাভ করেছিল। সেকালে বঙ্কিম প্রমুখ মুসলিম-বিরোধী লেখক মুসলমানদের বিরুদ্ধে যেসব লেখা লিখতেন, ‘সুধাকর’ এ তার প্রতিবাদ প্রকাশিত হত।^{১৮} সুধাকর দল বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবার পূর্বে আধুনিক

বাংলা সাহিত্য সৃষ্টির পথে বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে কেউ যে অগ্রসর হয়নি, তা কিন্তু বলা যায় না। এই দলের বহু আগে থেকে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে মীর মশাররফ হোসেন বাংলা সাহিত্য সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তার আগে শামসুদ্দীন মুহম্মদ সিদ্দিকীকে দেখা যায়। তার রচনা ‘ভাবনা’ এবং ‘উচিত শ্রবণ’ ১৮৬৫ সালের আগেই রচিত ও প্রকাশিত হয়। কিন্তু বাংলায় মুসলিম জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টির নেশায় ‘সুধাকর’ দল যেভাবে প্রাণ দিয়ে সাধনা করেছিলেন, এঁদের আগে তেমন আর কাউকে দেখা যায় না। তাছাড়া এমন সচেতন জাতীয়তাবোধও তাঁদের আগের কোনও মুসলমান-রচিত সাহিত্যে ফুটে ওঠেনি। এঁরা ইসলাম ধর্মের গৌরব, মহিমা ব্যাখ্যা করেছেন। পরাধীন ও শোষিত বাঙালি মুসলিমদের মনে আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করতে এঁরা আরবী- ফারসী সাহিত্য থেকে অনুবাদ করেছেন হজরত মহম্মদের (সা) ও তাঁর সাহাবীদের বিশেষত হজরত উমরের (রা) এবং অন্যান্য ওলী, পীর-পয়গম্বরের জীবনী লিখেছেন। সৈয়দ আলী আহসান প্রশংসা করে লিখেছেন যে, সুধাকর দলের সদস্য রেয়াজুদ্দীন আহমদের ভাষা ছিল প্রাঞ্জল কিন্তু গভীর, যা হজরত উমর (রা) এর মতো মহান ব্যক্তিত্বের সাথে মানানসই ছিল।^{১৫} এই ভাষা মুসলিম পাঠকদের মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য মীর মশাররফ হোসেন হজরত উমর (রা) এর জীবন থেকে গভীর প্রেরণা লাভ করেছিলেন। তাই মুসলিম সমাজের হীনম্মন্যতা দূর করতে ও আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠার জন্য হজরত উমরকে (রা) নিয়ে একটি কবিতা লিখেছিলেন, যার নাম ছিল ‘হজরত উমরের ধর্মগ্রহণ লাভ’ (১৯০৫ সাল)। তিনি মুসলিম সমাজকে এই কবিতার মধ্যে দিয়ে একথা বলতে চেয়েছেন যে, ধর্ম গ্রহণ বা নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ কেবল আধ্যাত্মিক নয়, এটি মানবিক মনোভাব ও জীবনের গতিপ্রকৃতির সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত।

একটি জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা, তার জীবনের স্পন্দন এবং অন্তর ও বহিজীবনের প্রকাশ যে সেই জাতির জাতীয় বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক, সেই ব্যাপারে সুধাকর দলের বোধ ছিল প্রখর। বাঙালী মুসলমান জাতির ঘোর দুর্দিনে এঁরাই সেই জাতিকে নিজ ঘরমুখো করেছিলেন এবং আত্ম অনুসন্ধানে সহায়তা করেছিলেন।^{১৬} এক কথায় এই ‘সুধাকর’ দল যেভাবে মুসলমানদের জাতীয় সাহিত্যের ভিত্তি রচনা করেছিলেন সে পথেই অর্ধ শতাব্দী ব্যাপী সাধনায় বাঙালী মুসলমানদের জাতীয় সাহিত্য বিকশিত হয়েছে। সুধাকর দল তাদের লেখার মাধ্যমে বাঙালি মুসলিম মানসে যে পরিবর্তন এনেছিল, তাকে এক অর্থে “সাহিত্যিক বিপ্লব” বলা যেতে পারে। সুধাকর পত্রিকার মাধ্যমে তারা যে সাংবাদিকতার ভিত্তি গড়ে দিয়েছিলেন, তার ওপর দাঁড়িয়েই পরবর্তীকালে ‘নবনূর,’ ‘কোহিনূর,’ ‘সওগাত,’ ‘মাসিক মোহাম্মদী,’ ‘শিখা’ র মতো সাহিত্যিক পত্রিকাগুলি সাহসিকতার সাথে সাহিত্যচর্চা করতে পেরেছিল। সুধাকর দলের রচিত সাহিত্যের মূল্য যেমনই হোক না কেন, স্থান-কাল-পাত্র বিচারে বাংলা সাহিত্যে এঁদের সাহিত্যিক ভূমিকার গুরুত্ব অপরিসীম। বস্তুতপক্ষে, মুসলিম জাতি এবং এই জাতির সাংস্কৃতিক জীবনের গতিধারা সুধাকর দলেরই হাতে লালিত ও বর্ধিত হয়েছে। মুসলিম বাংলা সাহিত্যে ‘সুধাকর’ দলের ভূমিকা এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই বিচার করা দরকার। ‘সুধাকর’ পত্রিকার মাধ্যমেই প্রথম বাঙালি মুসলমানরা বুঝতে পারে যে নিজস্ব ধর্মীয় ও জাতিগত পরিচয় বজায় রেখেও উচ্চমানের বাংলা সাহিত্য চর্চা করা সম্ভব। পরবর্তী মুসলিম সাহিত্যিকদের কাছে এদের সাহিত্যচর্চা পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করেছে এবং সেই কারণেই বাংলার মুসলিম জীবনেও নবীন অধ্যায় এসেছে এবং বাঙালী মুসলমানের মনে আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করে নব গৌরবের সূচনা হয়েছে। তাই দেখা যায় যে পরবর্তীকালে কাজী নজরুল ইসলামও হজরত উমর (রা) জীবন থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে ‘উমর ফারুক’ কবিতা রচনা করেছিলেন। এই কবিতার মাধ্যমে তিনি অতীতের এক মহান চরিত্রকে বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে আদর্শ রূপে তুলে ধরেছেন। মুসলিম মননে নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত করার ক্ষেত্রে কবিতাটি আজও সমান প্রাসঙ্গিক।

সহায়ক গ্রন্থ:

১. Maxim Gorky. *On Literature*. Foreign Languages Publishing House, 1953.
২. Hart, Michael H. *The 100: A Ranking of the Most Influential Persons in History*. Hart Publishing Company, Newyork, 1978, p. 218
৩. Qazi, Moin. *Umar Al Farooq: Man and Caliph*. 2015, p. 218.
৪. আহসান, সৈয়দ আলী। বাংলা সাহিত্যে মুসলিম মানস। প্রথম প্রকাশ: ১৯৬৮, পৃ. ৮০-৮৪।
৫. হাই, মুহাম্মদ আব্দুল ও আহসান, সৈয়দ আলী। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (আধুনিক যুগ)। একাদশ সংস্করণ, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ৯০-৯৯।
৬. তদেব, পৃ. ৯০-৯৯।
৭. ছফা, আহমদ। বাঙালি মুসলমানের মন। মাওলা ব্রাদার্স সংস্করণ, ১৯৮১, পৃ. ১১-১৪।
৮. Ahmed, Rafiuddin. *The Bengal Muslims, 1871-1906: a quest for identity*. Oxford University Press, 1996, p 104-106.
- Dey, Amit. *The Image of the Prophet in Bengali Muslim Piety 1850-1947*. Readers Service, 2014, p. 107-123.
৯. আহসান, সৈয়দ আলী। বাংলা সাহিত্যে মুসলিম মানস। প্রথম প্রকাশ: ১৯৬৮, পৃ. ৮২।
১০. আনিসুজ্জামান। মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য (১৭৫৭-১৯১৮)। কলকাতাঃ প্রতিভাষ, ১৯৯৯, পৃ. ২৩২-২৩৬।
১১. Ahmed, Sufia. *Muslim Community in Bengal. 1884-1912'*, Dhaka, 1974, p. 160-161.
১২. কাদির, আবদুল সম্পাদিত। মশহাদী-রচনাবলী। কেন্দ্রীয় বাংলা-উন্নয়ন-বোর্ড, ঢাকা, পৃ. ৫-৬৪।
১৩. Dey, Amit. *The Image of the Prophet in Bengali Muslim Piety 1850-1947*. Readers Service, 2014, p. 107-108.
১৪. আহসান, সৈয়দ আলী। বাংলা সাহিত্যে মুসলিম মানস। প্রথম প্রকাশ: ১৯৬৮, পৃ. ৯০-৯৬।
১৫. Roy, Asim. *The Islamic syncretistic tradition in Bengal*. 1983, p. 246- 254.



রবীন্দ্রনাটকে সাধারণ জনতার বিবর্তনের রূপরেখা

ড. গৌতম চন্দ্র বাড়ে, সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, বান্দোয়ান মহাবিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 23.12.2025; Accepted: 18.02.2026; Available online: 28.02.2026

©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

Abstract

In many of Rabindranath Tagore's plays, the crowd (the masses) plays a distinctive role. Although the thematic concerns vary from play to play, the overall nature of the crowd remains more or less similar across different times and contexts. In his early plays, cowardice and superstition are used as elements of course, rustic humour. In the later plays, however, the crowd gradually becomes more organised.

In *Prakritir Pratisodh*, the position of the common people, in contrast to ascetic life, remains confined to the trivialities of everyday existence. In *Raja O Rani*, although the crowd shows defiance against the king, in reality it remains leaderless and aimless. In *Bisarjan*, the collective traits of the crowd are marked by ignorance, cowardice, and religious fanaticism. In *Malini*, on the other hand, the crowd is not composed of uneducated villagers; rather, they are educated townspeople and Brahmins, yet they do not entirely shed their rustic mindset.

In *Prayashchitta* and *Achalayatan*, the crowd is not leaderless, but it fails due to a lack of discipline. The diversity of the populace in *Raja* lends the play its distinctiveness. In plays such as *Muktadhara*, *Raktakarabi*, and *Rather Rashi*, the nature of the crowd transcends the inertia of the earlier plays and points towards the search for a new path. This very rise of the common people constitutes the subject of the present article.

Keywords: Crowd, Rustic humour, Fear, Doubt, Leader lessness, Disorder, Driving force

রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্বের নাটকগুলিতে জনতা চরিত্রের ব্যবহার ছিল বাইরে থেকে আরোপিত কিন্তু শেষ পর্বের নাটকগুলিতে কাহিনীর অপরিহার্য উপাদান রূপে গ্রহণীয় হয়ে উঠেছে এই জনতা চরিত্র। ফলে তখন আর নাটক থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করে দেখা সম্ভব নয়। প্রথম পর্বের নাটকগুলিতে জনতা চরিত্র ছিল বিশৃঙ্খল। তারা একত্রে মঞ্চে উপস্থিত হলেও তাদের মধ্যে ছিল না কোন সজ্জবদ্ধতা। কিন্তু শেষদিকের নাটকগুলিতে জনতা চরিত্র একটি সজ্জবদ্ধ শক্তি রূপেই আত্মপ্রকাশ করেছে। জনতা সম্পর্কে রবীন্দ্রকথা- 'মানুষ যতক্ষণ আপনাকে প্রকাশ না করিতেছে ততক্ষণ তাহা জনতা, যখন আত্মপ্রকাশ করিল সে ব্যক্তি হইয়া উঠিল।'।

প্রথমপর্বের ‘প্রকৃতির প্রতিশোধ’ নাটকে সন্ন্যাসীর ভ্রম সংশোধন মূলত তার ব্যক্তিগত উপলব্ধি জাত। জনতার চোখে সন্ন্যাসী প্রথমে যেমন অহেতুক পূজাস্পদ ছিল শেষেও তেমনি আছে। নাটকে কৃষকদের কণ্ঠে ‘হেদে গো নন্দরানী’ শীর্ষক গানটি নাটকের মূল ভাবাদর্শের প্রতিনিধিত্ব করতে সক্ষম হয়নি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বহু নাটকেই জনতা চরিত্রের ভাষায় শিষ্ট মানুষের সংলাপ আরোপ করেছেন। ফলে জনতা চরিত্র তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য হারিয়েছে। ‘প্রকৃতির প্রতিশোধে’ দুই ব্রাহ্মণের কথোপকথন-

প্রথম: শাস্ত্রী বলেছেন স্থূল থেকে সূক্ষ্ম উৎপন্ন হয়েছে।

দ্বিতীয়: গুরু বলেছেন সূক্ষ্ম থেকে স্থূল উৎপন্ন হয়েছে।

প্রথম: সে যে অসম্ভব কথা।

দ্বিতীয়: সেই তো বেদবাক্য।

প্রথম: কেমন করে হবে? বৃক্ষ থেকে তো বীজ।

দ্বিতীয়: দূর মূর্খ বীজ থেকেই তো বৃক্ষ।

সাধারণ গ্রাম্য জনতার মুখে সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে এই সূক্ষ্ম দার্শনিক বিশ্লেষণ প্রত্যাশিত নয়। শিষ্ট ভদ্রমানুষের আচরণের সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে গিয়ে জনতা চরিত্র কিছুটা কৃত্রিম হয়ে পড়েছে। নাটকে জনতা চরিত্রের কণ্ঠেও শোনা যায় কাব্যময় সংলাপ। রাজপুত্রের বিবাহ উপলক্ষে ছুটির আনন্দে ও পেট ভরে খাওয়ার আনন্দে উল্লসিত জনতার মুখে কোনো প্রতিবাদের ভাষা নেই।

‘রাজা ও রানী’র জনতা অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সরব। কুঞ্জরলাল কামারের নেতৃত্বে রাজবিদ্রোহে সমবেত হয়েছে জনতা, ‘ভিক্ষে করে কিছু হবে না, আমরা লুণ্ঠ করব।’ কিন্তু রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পরিবর্তে সাধারণ দরিদ্র প্রজারা সামান্য আশ্বাস পেলেই তারা বিদ্রোহের পথ থেকে ফিরে আসে। অশিক্ষিত গ্রাম্য জনসাধারণের এই বিশেষ মানসিকতা জনতা চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য। হরিদীন কুমোরের পরামর্শ, ‘ওরে তোরা মরতে বসেছিস নাকি? বলিস কী রে। আগে রাজাকে জানা, তারপরে যদি না শোনে তখন অন্য পরামর্শ হবে।’ হরিদীন কুমোরের পরামর্শে মুহূর্তের মধ্যে পরিবর্তিত হয়ে গেছে জনতার মন। অবশেষে শ্রীহরের পরামর্শে তারা আবার শাস্ত্র ফেলে অস্ত্র তুলে নিতে চেয়েছে রাজার বিরুদ্ধে। এখানে জনতা চরিত্রের বিশৃঙ্খল, সদা পরিবর্তনশীল মানসিকতাটি ফুটে উঠেছে। আবার চন্দ্রসেনের প্রতি জনতার অভিশাপ বাক্য-‘ধিক ধিক নিপাত যাও। কোটিকোট জন্ম তোমার নরকবাস হোক। সিংহাসনের কীট, সিংহাসনকে জীর্ণ করে তার ধূলির মধ্যে তোমার বিলুপ্তি ঘটুক’-এ ভাষাও জনতার নয়।

‘বিসর্জন’ নাটকে রঘুপতি সাধারণ জনতার ধর্ম ভীরুতাকে কাজে লাগিয়ে তাদের বুঝিয়েছেন যে, ‘তিন মাসের মধ্যে মড়কে দেশ উচ্ছল্লে যাবে।’ রঘুপতি জনতাকে রাজ বিদ্রোহের অংশীদার করতে চেয়েছেন। দেবী ত্রিপুরেশ্বরীর মুখ পিছনদিকে ঘুরিয়ে রেখে সে জনতার সন্দেহকে আরো বেশি বাড়িয়ে দিয়েছে। তবু সাধারণ প্রজারা রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে চায়নি। রঘুপতির কথায় তারা সাময়িকভাবে হয়ত কিছুটা উত্তেজিত হয়েছে কিন্তু সৈন্য আগমনের সংবাদে প্রাণভয়ে ভীত জনগণ পালাতে চেয়েছে-

গণেশ: অস্ত্র কেন ঠাকুর?

রঘুপতি: মায়ের পূজা বন্ধ করার জন্য রাজার সৈন্য আসছে।

হারু: সৈন্য আসছে, প্রভু তবে আমরা প্রণাম হই।

কানু: আমরা কজন সৈন্য এলে কি করতে পারব?

হারু: করতে সবই পারি- কিন্তু সৈন্য এলে এখানে জায়গা হবে কোথায়? লড়াই তো পরের কথা, এখানে

দাঁড়াব কোনখানে?

জনগণের এই ভীত সম্ভ্রান্ত রূপটিই তাদের জীবনের স্বাভাবিক ছবি। ‘মালিনী’ নাটকেও অশিক্ষিত জনতার ধর্মাত্ম রূপটি নাটকে প্রস্ফুটিত হয়েছে। এখানে জনতা চরিত্রকে প্রকাশ্যে মঞ্চে আনা হয়নি। কিন্তু অন্যান্য চরিত্রের সংলাপের মাধ্যমে জনতা চরিত্রের এই অন্ধকারাচ্ছন্ন দিকটির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। মালিনী রাজগৃহ ত্যাগ করে প্রকাশ্যে পথে বেড়িয়ে এলে যে জনগণ তার নির্বাসন চেয়েছিল দেবী জ্ঞানে তারাই আবার তার পূজা আরম্ভ করেছে। ‘প্রজাগণ দরশন যাচে’-মালিনীকে অনায়াসেই দেবী রূপে স্বীকার করে নিয়েছে নিরীহ গ্রাম্য প্রজারা। প্রথম পর্বের রবীন্দ্রনাটকগুলিতে আবেগ তড়িত, অসম্ভবদ্বন্দ্ব, অশিক্ষিত চরিত্রই উপস্থিত হয়েছে বেশি মাত্রায়। কিন্তু রূপকপ্রতীক নাট্যপর্ব থেকে আমূল পাল্টে গেছে জনতা চরিত্র। জনতা তখন আর নাট্য রসসৃষ্টির উপাদান নয়, বরং তারাই হয়েছে নাটকের বিষয় ও আশ্রয়। ‘শারদোৎসবে’ জনতাকে একটু লঘু ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে বটে, কিন্তু জনতা চরিত্রের সংস্কারমুক্ত রূপটিকেই ফুটিয়ে তোলার দিকে সেখানে ঝোঁক পড়েছে বেশি।

১ম ব্যক্তি: ওরে ছোড়াগুলো, সন্ন্যাসী কোথায় গেল রে?

২য় ব্যক্তি: কই বাবা, সন্ন্যাসী কই?

বালকগণ: এই-যে আমাদের সন্ন্যাসী।

১ম ব্যক্তি: ও তো তাদের খেলার সন্ন্যাসী! সত্যিকার সন্ন্যাসী কোথায় গেলেন?

বাস্তবিক এ জনতা পূর্ববর্তী নাটকগুলির জনতার চেয়ে অনেক বেশি পরিণত। তাদের কথার মধ্যেও নেই পূর্বদিনের বাচলতা। চোখে নেই ভাব-বিহ্বলতা। জীবন ও মূল্যবোধ সম্পর্কে তারা অনেক বেশি প্রত্যয়ী।

‘প্রায়শ্চিত্ত’ নাটকের জনতা চরিত্রের কণ্ঠে আরোপিত হয়েছে বিদ্রোহের কাঠিন্য। তাদের প্রিয় নেতা ধনঞ্জয় বৈরাগীর জন্য তারা ততদিনে প্রাণ দিতে প্রস্তুত। প্রকৃতপক্ষে এ জনতাকে আর বলা যাবে না ভীরা কাপুরুষ। ধনঞ্জয় বৈরাগীর নেতৃত্বে তারা ‘মারের সাগর’ পেরিয়ে যেতে উৎসাহ বোধ করেছে।

‘রাজা’ নাটকের জনতা আরো বেশি বুদ্ধিদৃষ্ট। বিভিন্ন শ্রেণির জনতার সমাবেশ ঘটেছে এই নাটকে-বিদেশী পথিক, নাগরিক দল, একদল পদাতিক, একদল স্ত্রীলোক, নাচের দল এবং আরও অনেক। বসন্ত পূর্ণিমার আনন্দ উৎসবের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জুড়ে যাচ্ছেন রাজা- যাকে দেখা যায় না কিন্তু যিনি আছেন। বাস্তবিক, বিচিত্র পর্যায়ের জনতা ছাড়া রাজা নাটকটি কল্পনা করা যায় না। এই নাটকে জনতা শিল্পবস্তুর সঙ্গে অভিন্ন হয়ে উঠেছে। সাত রাজা যখন এক হয়ে লড়াইয়ে নেমেছে তখন তাদের মধ্যে পারস্পরিক সন্দেহ ও ঈর্ষার চিত্রটি ফুটে উঠেছে জনতার সংলাপে-

১ম: ওহে এতগুলো রাজা একত্র হয়ে লড়াই বাঁধিয়ে দিলে, ভাবলুম খুব তামসা হবে। কিন্তু দেখতে দেখতে কি যে হয়ে গেল, ভালো বোঝাই গেল না।

২য়: দেখলে না? ওদের, নিজেদের মধ্যেই গোলমাল বেধে গেল- কেউ যে কাউকে বিশ্বাস করে না।

১ম: ওরা তো লড়াইয়ের দিকে চোখ রাখেনি- ওরা পরস্পরের দিকেই চোখ রেখেছে।

২য়: কেবলই ভাবছিল- লড়াই করে মরবো আমি আর তার ফল ভোগ করবে অন্যজন।

এ নাটকে জনতা সবার আগে যুদ্ধে গিয়ে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। ঠাকুরদা জানিয়েছেন যে, ‘সকলের আগে গিয়ে তারা দাঁড়ালো, সকলের আগেই তারা প্রাণ দিয়ে বসে আছে।’

‘অচলায়তন’র শোনপাংশুরা মাঠে মাঠে ফসল ফলায়। কঠিন ঘুমে অচেতন লোহা দিয়ে তারা লাঙলের ফলা বানায়। কিন্তু এই শোনপাংশুরা আবার যুদ্ধ জানে। অচলায়তনের প্রাচীর ভেঙ্গে স্থবিরকদের জড় আশ্রমে এনেছে প্রাণের প্রবাহ। ‘মুক্তধারা’য় শিবতরাইয়ের প্রজারাও রাজবিদ্রোহী। তাদের পেটের খিদের অন্ন তারা

রাজকোষে জমা দিতে চায়নি। মন্ত্রী রাজা রণজিৎকে পরামর্শ দেন, ‘রাজকার্যে ছোটদের অবজ্ঞা করতে নেই। মনে রাখবেন, যখন অসহ্য হয় তখন দুঃখের জোরে ছোটরা বড়োদের ছাড়িয়ে বড়ো হয়ে ওঠে।’ তারা কারাগার ভেঙ্গে যুবরাজকে মুক্ত করে আনতে যাত্রা করেছে।

বিষণ: কী করে?

সকলে: জোর করে।

বিষণ: রাজার সঙ্গে পারবি?

সকলে: রাজাকে মানিনে।

এই অমান্য করবার ঘোষণাটি খুব সহজ কথা নয়। যে জনতাকে ‘রাজা ও রানী’ তে দেখা গেছে, আবার ‘বিসর্জনে’ও দেখা গেল, তার থেকে আরও অনেকখানি দূরে সরে এসেছে ‘মুক্তধারা’র জনতা যেখানে রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত আমাদের নিয়ে যেতে চান।

‘রক্তকরবী’ নাটকের মূল দ্বন্দ্ব যেখানে রাজার সঙ্গে তার নিজেরই সংঘাত সেখানে জনতার ভূমিকা একটু ভিন্ন রকম। রক্তকরবীর রাজা এত বেশি শক্তিশালী যে তার শাসন ব্যবস্থায় ফাঁক নেই; যেটুকুনিওবা আছে তা মদ, সোনা আর ধর্মের জপমালায় শৃঙ্খলিত। হঠাৎ নন্দিনীর আবির্ভাব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করলেও, মকররাজের ধ্বজা টলিয়ে দিলেও, কিছু জনতাকে আমরা দেখতে পাই সর্দারের অনুগামী। আবার খনিখোদাইয়ের দল ও ফসলকাতার দল রয়ে গেছে নাটকের নেপথ্যে। নন্দিনীর পৌষ ডাকার গান হয়ে উঠেছে বৃহত্তর ভাব ব্যঞ্জনা য় গ্রামীণ কৃষক সমাজের গান। এই নাটকে জনতা প্রচ্ছন্ন, তাদের ক্রিয়া স্পষ্ট। জনতাকে অলক্ষ্যে রেখে ব্যবহার রবীন্দ্রনাটকে প্রথম ও নতুন। শাসক শক্তির সঙ্গে শোষিত জনগোষ্ঠীর পরস্পর বিরুদ্ধ সংগ্রামে জনতার একটা ভূমিকা থাকেই। প্রত্যক্ষ এই আন্দোলনে জনতার যে চরিত্র ধরা পড়ে, সেখানে হয় তারা ভীত বা কোথাও অত্যাচারী। আবার সন্ন্যাসী বা ঠাকুরদার মত এক এক জন জননেতাও রবীন্দ্রনাটকে বারবার দেখা যায়। ধনতান্ত্রিক সভ্যতার নিষ্পেষণে কেমন করে বলি হয় সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ প্রকৃতপক্ষে তারই মূর্তিমান প্রতীক হিসেবে উপস্থিত হয়েছে রক্তকরবী নাটকে।

রবীন্দ্রনাটকে সাধারণ গ্রাম্য জনতার হাস্যরসাত্মক উপস্থিতি থেকে শুরু করে নির্যাতিত জনতা ক্রমশ বলিষ্ঠ ও প্রতিবাদী হয়ে ওঠাতেই আটকে থাকেনি। কালের বিবর্তনে এসকল সাধারণ জনতাই সভ্যতার চালিকা শক্তি রূপে আত্মপ্রতিষ্ঠা করেছে। ‘রথের রশি’তে রুদ্ধ রথের চাকা ব্রাহ্মণ সৈনিক কারো চেষ্টাতেই চলেনি, শূদ্র পাড়া থেকে হাজার হাজার লোক এসে রথের রশিতে হাত দিয়েছে। তাদের স্পর্শেই রথ এগিয়ে চলেছে।

“যারা এতদিন মরেছিল তারা উঠুক বেঁচে,

যারা যুগে যুগে ছিল খাটো হয়ে

তারা দাঁড়াক একবার মাথা তুলে।”

গ্রন্থপঞ্জি:

১. বিশী, প্রমথনাথ। রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ। ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, চতুর্থ সংস্করণ, ২০০৪।
২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্র-নাট্য-সংগ্রহ (২ খণ্ড)। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৪০৬।
৩. মৈত্র, সুরেশচন্দ্র। বাংলা নাটকের বিবর্তন। রত্নাবলী, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১০।

৪. ভট্টাচার্য, আশুতোষ। বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস (২য় খণ্ড)। এ. মুখার্জি অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, সপ্তম সংস্করণ, ২০০৯।
৫. ঘোষ, অজিতকুমার। বাংলা নাটকের ইতিহাস। দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১০।
৬. সেন, সুকুমার। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (চতুর্থ খণ্ড)। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, পঞ্চম মুদ্রণ, ২০০৭।



ছেঁড়াতার: শাস্ত্রের অন্তরালে ভিন্নভাষা

ড. কঙ্কণ দত্ত, রাজ্য সাহায্য প্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক, বাংলা বিভাগ, সামসি কলেজ, সামসি, মালদা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 06.01.2026; Accepted: 09.02.2026; Available online: 28.02.2026

©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

Abstract

Tulsi Lahiri's play *Chheratar* (The Torn String) is set against the backdrop of a contemporary famine. In the drama, the love between Rahim and Fuljan gradually becomes helpless amid the devastating famine, and the artistic portrayal vividly presents how their attempts to resist this helplessness ultimately prove futile. The play highlights how the famine intensifies the familial crisis of Rahim and Fuljan.

In *Chheratar*, both scripture and love are distinctly present. Due to ignorance of religious law, a storm descends upon their love; yet that very love does not remain confined within scriptural boundaries. Even while acknowledging scripture, it blossoms with great intensity. The love between Rahim and Fuljan is marked by crisis, conflict, and emotional oscillation. They had been living a peaceful married life, but rural exploitation combined with a terrible famine devastates their household.

Out of ignorance regarding religious injunctions, Rahim mistakenly divorces Fuljan by pronouncing talaq. However, bound by deep affection, he cannot endure the separation from her. Ultimately, he embraces death. In the lives of Rahim and Fuljan, love emerges as an innovative interpretation beyond the rigid confines of scripture.

Keywords: Modern drama, Rahim, Fuljan, crisis, famine, Hadith, wounded, love, beloved (Dilruba), divorce (talaq), suicide, exploitation, individual crisis, suffering, scripture

তুলসী লাহিড়ী তাঁর 'ছেঁড়াতার' নাটকটি রচনা প্রসঙ্গে কোনো এক সময় জানান তৃপ্তি মিত্রের তাগিদে দুর্ভিক্ষের প্রেক্ষাপটে নাটকটি রচনা করেছিলেন অর্থাৎ 'ছেঁড়াতার' নাটকটিতে দুর্ভিক্ষের প্রেক্ষাপট প্রদর্শিত করাই ছিল নাটককারের মূল লক্ষ্য। কিন্তু এই লক্ষ্যে স্থিত থাকলে নাটকটি শিল্পিত রূপ পেত না। ইতিপূর্বে তিনি 'দুঃখীর ইমান' নাটকে দুর্ভিক্ষের বাস্তব চিত্র অঙ্কন করেছেন ঠিকই কিন্তু তা কেবলমাত্র দুর্ভিক্ষের চিত্রেই সীমায়িত হয়ে রয়েছে। সফল নাটকের রূপায়িত হয়নি। 'ছেঁড়াতার' নাটকটি উদ্দেশ্যমূলক হয়েও রহিম ও ফুলজানের প্রেমের চিত্র ব্যক্তি সংকটের মধ্য দিয়ে নবতর মাত্রা পেয়েছে। নাটকটি ১৯৬০ সালে নিউ এম্পিয়ার থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয়। গণনাট্য আন্দোলন থেকে শব্দ মিত্র সহ বেশ কয়েকজন শিল্পী বেরিয়ে এসে নবনাট্য আন্দোলনের সূচনা করেন। নবনাট্য আন্দোলনের সূচক বহুরূপী ছেঁড়াতার নাটকের মধ্য দিয়ে তাদের আন্দোলনকে চূড়ান্ত রূপ দেয়। নবনাট্য আন্দোলনের মূল কথা শিল্প ও জনগণের মেলবন্ধন ছেঁড়াতার নাটকে স্পষ্ট হয়ে উঠলো। নাটকটির বিষয় সমকালীন দুর্ভিক্ষ নির্বাচিত হলেও রহিম ফুলজানের প্রেম এখানে

শিল্পসূত্রে অঙ্কিত হয়েছে অভিনব মাত্রায়। নাটকটিতে রহিম নায়ক এবং নায়িকা তার স্ত্রী ফুলজান। ফুলজান চরিত্রটির মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বহিসংঘাত নানা মাত্রায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মন্বন্তর নাটকের মূল কথা হলেও রহিম ফুলজানের প্রেম এখানে চিত্রিত হয়েছে ভিন্নভাষ্যে।

তুলসী লাহিড়ী ছেঁড়াতার নাটকে রহিম ও ফুলজানের প্রেম প্রথম অঙ্ক থেকেই একটি ফ্রেমের মধ্যে তুলে ধরেছেন। ক্যানভাসে বিভিন্ন রঙের সমাহার থাকলেও মূল রঙ ফুলজানের প্রেমকে কেন্দ্র করেই ফুটে উঠেছে। নাটকে রহিম ও ফুলজানের প্রেম গড়ে উঠেছে তাদের দুজনের কথপোকথনে, রহিমের ফুলজানকে জুতো পড়ানোর আনন্দে এবং জীবনের অনেকটা সময় নানান প্রতিকূলতায় অন্যভাবে কাটিয়ে দেওয়ার উচ্ছ্বাসের মধ্য দিয়ে। দেখা গেছে নাটকটিতে আকাল একটি অন্য মাত্রা বহন করেছে। মানুষের জীবনে বার বার নেমে এসেছে আকালের মতন বিপর্যয়, মানব জীবনের নানান আনন্দ ও বিচিত্র রঙ স্নান হয়ে যাওয়ার জন্য। বিপর্যয় এখানে অন্য মাত্রা বহন করেছে। এই বিপর্যয়ে বিপর্যস্ত হয়ে অনেকেই আবার নিজের বউকে পর্যন্ত বিক্রি করে দিয়েছে। এত প্রতিকূলতার মধ্যেও রহিম-ফুলজানের প্রেম সুললিত মাত্রায় ফুটে উঠেছে। জীবনের প্রতিকূলতায় রহিমের সুর নানান ভাবে বিধ্বস্ত। তবু তার ভেতরে ফুলজানের জন্য প্রেমের যে সুর প্রতিনিয়ত বেজে চলেছে সেই সুর ধ্বনিত হয়ে উঠেছে জীবনের গানের মধ্যে।

তুলসী লাহিড়ী ছেঁড়াতার নাটকে সংগীতের ব্যবহার করেছেন যথেষ্ট সচেতন ভাবে। এই সচেতনতা থেকেই ছেঁড়াতার নাটকে ছয়টি সম্পূর্ণ গান এবং একটি তিন পংক্তির গান উপস্থাপন করেন। নাটকে প্রধান চরিত্র রহিম সংগীত রসিক। শুধু তাই নয় সংগীত এখানে অর্থনৈতিক দিক থেকেও মূল্যবান সেকথাও নাটকে প্রাধান্য পেয়েছে। অর্থাৎ সংগীত এই নাটকে একটি চরিত্র হিসাবে উপস্থিত হয়েছে। নাটকে দ্বিতীয় গান ‘ফালিচান্দের নাও’ মহিম ও রহিমের আধ্যাত্মিকতার নিদর্শন। ঈশ্বরের প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠা রহিমের জীবনে নতুন ব্যঞ্জন নিয়ে এসেছে। বলা যায় তার জীবনের সংকট গড়ে উঠেছে মূলত তার ঐকান্তিক ভক্তিকে কেন্দ্র করেই। নাটকটিতে প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে একটি তিন পংক্তির গান রয়েছে যেখানে রহিম ফুলজানের নিবিড় ভালোবাসার কথা স্পষ্ট। একই সঙ্গে রয়েছে ভালোবাসা জনিত অতৃপ্তির আকাজক্ষা।

রহিম বিভিন্ন বাধার মাঝেও নিজের জীবনের ক্যানভাসকে সুন্দরভাবে রঙের তুলিতে রাঙিয়ে তুলেছেন। গানের সুরের উচ্ছ্বাসে আনন্দে রহিম উৎফুল্ল থাকলেও এই বিষম সমাজ ব্যবস্থা তার উৎফুল্লতায় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। আর্থিক নানান অভাব তার জীবনের সংকটকে নামিয়ে এনেছে। সেই সংকটে রহিমের সুর বারে বারে কেটে যায়। তবুও তার প্রেমের রঙ কখনো স্নান হয়নি। সেই রঙেই রহিম তার অন্তরের ধ্বনিকে বাজিয়ে তোলেন আনন্দময় সংগীতময়তায়। রহিম মাঝে মাঝে সংগীতের সুর ভুল করে ফেললেও তবু তার প্রেমের রঙ উজ্জ্বল হয়ে থাকে। মূর্ত-বিমূর্তের মধ্যে দাঁড়িয়ে থেকেও ভুল করে ফেলা সুরে অসহায় রহিম। আকালের কারণে দিশেহারা হয়ে রহিম ফুলজানকে তালাক দিলেও পুনরায় তাকে গ্রহণ করতে বাধা পেলে তা সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে হয়। ট্রাজেডির এক করুণ পরিস্থিতি নেমে আসে রহিম ও তার পরিবারে।

নাটকে রহিম প্রথম থেকেই হাকিমুদ্দিন দ্বারা রচিত নানা প্রতিকূল পরিস্থিতির বিরুদ্ধে সক্রিয় থেকেছে। কিন্তু এই বিরুদ্ধ পরিস্থিতি বুঝতে গিয়েই সে ভুল করে ফুলজানকে তিন তালাক দিয়েছে। ধর্মীয় জ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞানতাই ফুলজান ও তার জীবনের ট্রাজেডি বড় আকার ধারণ করেছে। কিন্তু ট্রাজেডির নায়কের মত সে প্রতিরোধাত্মক হয়ে ওঠে এই ‘ভুলের মাশুল’ দেওয়ার জন্য। ট্রাজিডিতে অ্যারিস্টটল Pity ও Fear-এর উপর গুরুত্ব দেন কিন্তু অধ্যাপক অ্যালারডাইস নিকল Pity-র পরিবর্তে মহৎ অনুভূতি জাগরণের কথা বলেন। ছেঁড়াতার নাটকে রহিমের তালাক দেওয়া পাঠক বা দর্শক মনে করুন রসের সঞ্চারণ ঘটায়, ব্যক্তিগত পর্ব-২, বিশেষ সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি, ২০২৬

অজ্ঞাত জনিত ভ্রান্তি ও দুর্বলতার প্রেক্ষিতে রহিমের প্রতিরোধে মহত্ব জাগে না। ছেঁড়াতার নাটকের কাহিনীবৃত্ত কার্যকারণ পরস্পরা সূত্রে বিধৃত। অ্যারিস্টটলের মত অনুযায়ী আদি-মধ্য-অন্ত সমন্বিত। তিনাঙ্ক নাটকের প্রথম অংকের তিনটি দৃশ্যে রহিম ফুলজানের নৈকট্য এবং হাকিমুদ্দির ষড়যন্ত্রে রহিমের বিপর্যস্ত কাহিনীবৃত্ত। আর জটিলতার ভিত্তি মন্বন্তর ও আকালের ফলে রহিমের পারিবারিক ট্রাজেডির সূচনা ঘটেছে দ্বিতীয় অংকে। মন্বন্তর ও শোষণ থেকে বাঁচবার আকাঙ্ক্ষায় রহিমের ফুলজানকে তালাক দেওয়া নাটকটিতে করুণ রসের সৃষ্টি করেছে। নাটকের তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে দেখা যায় রহিম ও ফুলজানের বিচ্ছেদের কারণে মনস্তাত্ত্বিক সংকট প্রবল হয়ে উঠেছে। তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যের প্রথমে এই সংকট দূর করার জন্য কানাকিরের সঙ্গে ফুলজানের বিয়ের ব্যবস্থা করা হয়। আর ঠিক এখান থেকেই দেখা যায় নাটকে ঘটনা বিপরীতমুখী রূপ ধারণ করে। উত্তেজিত রহিম দিলরুবার তাকে সুর লাগাতে গেলে ছেড়ে যায় তার। দ্রুত ঘরে প্রবেশ করে সে আত্মহত্যা করে। রহিমের পারিবারিক জীবন প্রথমে সুখ থেকে দুঃখে, দুঃখের নিবৃত্তির অন্বেষণ থেকে তার প্রতিরোধ স্পৃহা এবং শেষ পর্যন্ত চরম দুঃখে পর্যবসিত হওয়ার মধ্যে রহিম ও ফুলজানের জীবনে করুণ পরিস্থিতি নেমে আসে।

ছেঁড়াতার নাটকটিতে একদিকে রয়েছে ফুলজান অন্যদিকে রহিম। তাদের মাঝখানে রয়েছে একরাশ স্কন্ধতা, যাকে হাদিজের ভয় বলে প্রতিপন্ন করে দেয় কেউ কেউ। আসলে তা হল শাস্ত্র সম্পর্কে এক ধরনের অজ্ঞানতা। তবুও এই অজ্ঞানতা নিয়ে কয়েক মাস পর রহিম নিজের জীবনের সুরকে বাঁধতে চেয়েছিল কিন্তু ততদিনে তার প্রেমের ফ্রেমে নানা ফাটল ধরেছে। নিজেরাই নিজেদের দ্বন্দ্ব টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। কিন্তু তবুও তাদের মধ্যে প্রেম ছিল, নানা আশা আকাঙ্ক্ষা ছিল। নতুন করে তাদের হৃদয়ের দিলরুবার তার বাঁধার দক্ষতা তাদের জানা ছিল না। কানাকিরের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে পুনরায় তাকে নিকে করার পদ্ধতি অবলম্বন করলেও রহিম কিন্তু তার প্রেমকে হৃদয়ের অন্তস্থলে সংরক্ষিত করে রেখেছিল। প্রেমের কারণে সে কানা ফকিরের সঙ্গে ফুলজানের শয্যা-সঙ্গিনীর কথা ভাবতেও পারে না। এখানেই তার প্রেম মহৎ পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে।

ছেঁড়াতার নাটকটিতে ফুলজান চরিত্রটি একটি অন্যতম মাত্রা বহন করেছে। নাটকটিতে প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে তার যে প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে সেখানে তিনি সহজ সাধারণ গায়ের বধু হিসেবেই পরিচিত। তার স্বামী রহিম শহর থেকে তার জন্য জুতো কিনে নিয়ে এলে তার কাছে সেটি বিলাসিতা বলে মনে হয়। তিনি শহরের এই ধরনের অভ্যাসের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে চান না। তার মনে হয়েছে-

“হামরা যে গরীব মানুষ। যে টাকা জুতা কিনতে লাগে তাতে যে কত কিছু হবার পারে।”

সাধারণ গৃহস্থ্য নারীর মতোই তার ভাবনাচিন্তা, সংসারের অভাব অনটন দূর করা যায় কীভাবে তা নিয়েও সে চিন্তিত। সংসারের সম্পদ রহিম সংগ্রহ করে, সংরক্ষণের ফুলজানের সক্রিয়তা অধিক। শাশুড়ির প্রতি সম্ভ্রমবোধ, রহিমের প্রতি নিবিড় প্রেমবোধ এবং সন্তান বাৎসল্য- সাধারণভাবে যেটুকু আশা করা যায় তা ফুলজানের চরিত্রে রয়েছে। ফুলজান সহজ সাধারণ নারী হলেও মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ প্রবল। তাই সে সন্তানের খিদা নিবারণের জন্য হাকিমুদ্দিন বাড়ি গেলেও বাড়ির ভেতরে গিয়ে সে খায়নি। কিন্তু রহিম তালাক দিলে দেখা যায় ফুলজান অসহায় হয়ে শেষ পর্যন্ত হাকিমুদ্দির বাড়িতে খেয়ে মর্যাদা নষ্ট করে। রহিমের বেদনার শুশ্রূষা ফুলজান। তাই অভুক্ত সন্তানের প্রতি দায়িত্বের ব্যাপারে রহিমের থেকে ফুলজানের দায়িত্ব-কর্তব্যই এখানে বড় হয়ে উঠেছে। যন্ত্রণার সমস্ত দায়ভার নিজে সে গ্রহণ করে। হতাশ না হয়ে রহিমকে সান্তনা দেয়। ফুলজানের সঙ্গে রহিমের কথোপকথনে একথা জানতে পারা যায়। বিয়ের পর রহিমের জীবনে সুখ আসে ফুলজানের উপস্থিতিতেই। তবু রহিমের এই তালাক দেওয়ার সিদ্ধান্ত অনুচিত বলেই মনে হয়।

আকালের যন্ত্রণা শুধু রহিমকে কষ্ট দেয়নি, ফুলজানও সেই একই যন্ত্রণার ভাগীদার। সেই যন্ত্রণা ভাগ করে নেওয়ার দায়িত্ব ছিল দুজনেরই কিন্তু নাটকে তা হয়নি। রহিম একতরফা ভাবেই তালাকের সিদ্ধান্ত নেন, ফুলজান অসহায় হয়ে ভেঙে পড়েন-

“কোনটা কল্ল। তার চায়া মারি ফ্যালাও - মারি ফ্যালাও।”^২

ফুলজান আর পাঁচটা নারীর মতোই ধর্মনিষ্ঠ নারী। ধর্ম সম্পর্কে তার জ্ঞান সামান্য। ভুল শাস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞান নিয়ে ধর্মের প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠায় বজায় রাখার চেষ্টা করে। এর ফলে রহিমের তালাক দানের পর সে বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। বলে-

“ঘর আর মর ত’ নয়।”^৩

নাটকের সূচনায় ফুলজানের অনুপস্থিতি থাকলেও ধীরে ধীরে তার উপস্থিতি নাটকটিকে অন্যমাত্রা ফুটিয়ে তুলেছে। বিভিন্ন আঘাতে ফুলজান দীর্ণ হয়ে পড়লেও ছেঁড়াতার নাটকে তার গুরুত্ব অনেকটাই। ফুলজান দ্বন্দ্বময় জীবনচর্চার সংঘাতে স্তান, সন্তানকে ফিরে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা তাকে অনেক বেশি উজ্জ্বল করে তুলেছে। তার চরিত্রের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দ্বন্দ্ব মুহূর্ত দেখা যায় যখন রহিমকে ভালোবাসা সত্ত্বেও কাছে পেয়ে ধর্মীয় কারণে হাদীজের ভয়ে তার সঙ্গে কথা বলতে সে পারেনি-

“রহিমের কথায় ফুলজানের বুকের ভিতর মুচরে উঠতে লাগলো। কথা ক’য়ে পাছে হাদীজ খেলাপ হয়, সেই ভয়ে দাঁতে দাঁত চেপে চুপ করে রইল।”^৪

একদিকে ধর্মের প্রতি তার ঐকান্তিক নিষ্ঠা অন্যদিকে রহিমের প্রতি গভীর ভালোবাসা এই দুইয়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সে ক্ষতবিক্ষত। তবুও তার কাছে প্রেমই বড় হয়ে ওঠে। শাস্ত্রের অন্তরালে প্রেমকে ফিরে পাওয়ার জন্য সে ঈঙ্গিত। রহিম বারবার এই কঠিন সমাজ ব্যবস্থার দ্বারা আক্রান্ত ও ক্ষতবিক্ষত। হাকিমুদ্দির মত ধূর্ত মানুষের দ্বারা আক্রান্ত হয়েও বারবার প্রতিরোধ করবার চেষ্টা করে। প্রথমপর্বে সে প্রতিবাদ করে জয়ী হলেও দুর্ভিক্ষের কারণে দুর্বল হয়ে উঠে। যদিও ফুলজানকে সে তালাক দেওয়ার পর বলে-

“অঁয় যেমন কায়দা করি মাইরবার চায়, মুইও বুদ্ধি করি বাঁইচমো। তুই আর মোর জরু নইস্-লঙ্গরখানায় যা-যেইঠে যা-দুইটা মাস জান বাঁচেয়া রাখ-বছিরক্ নিয়া মুই এলায় চলি যামো-উয়াক্ বাঁচামো-”^৫

অর্থাৎ দেখা যায় রহিমের দুর্বলতা তার শাস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞান না থাকার কারণে আর আর্থিক দিক থেকে অসহায়তার কারণেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই কারণেই সে ফুলজানকে তালাক দিয়ে হাকিমুদ্দির প্রতিবাদ করে উঠে। শেষ পর্যন্ত তা হয়ে উঠে না, ফুলজানের সঙ্গে বিচ্ছেদ হতে বাধ্য হয়। পরবর্তীকালে ফুলজানকে পুনরায় গ্রহণের জন্য নিকা করিয়ে নেওয়ার ব্যাপারটি নিয়ে আসা হলে সে কানা ফকিরকে মানতে পারেনা ফুলজানের নিকার ব্যাপারে। আসলে ফুলজানের প্রতি তার ভালোবাসা অন্তরের অন্তস্থল থেকে প্রস্ফুটিত। যার কারণেই সে বিষয়টি মেনে নিতে পারেনি।

মধুসূদন দত্তের “বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ” প্রহসনে ভক্তপ্রসাদের ধূর্ততা হাকিমুদ্দির তুলনায় কম তীব্র। আসলে মধুসূদনের মূল উদ্দেশ্য ছিল সমকালীন আচার সর্বস্বতার প্রতিনিধি ঈশ্বরনাম জপকারী ভক্ত প্রসাদের নৈতিক অধঃপতন কে তুলে ধরা। ভক্তপ্রসাদের ক্ষেত্রে পরের সম্পত্তি গ্রাস করা, নারীর লোলুপতার চিত্র স্পষ্ট। কিন্তু ছোট প্রহসনে তার চরিত্র বিস্তৃতি সম্ভব হয়নি। ছেঁড়াতার নাটকটি তিন অঙ্কের হওয়ায় হাকিমুদ্দি চরিত্র অনেকটাই প্রসারিত হয়েছে। তার চরিত্রের প্রতিটি দিক ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে প্রকট হয়ে উঠেছে। নিজ স্বার্থে আঘাতকারীকে নানা বিপদে সে ফেলেছে। এমনকি রহিমকে ডাকাতির মামলায় বিপর্যস্ত করেছে।

তুলসী লাহিরির ছেঁড়াতার নাটকে দ্বন্দ্ব ও নাট্যিক বৈচিত্র্যময়তা সূচিত হয়েছে রহিমের জীবনে হাকিমুদ্দির উপস্থিতিতে। রহিম নাটকে শোষিত শ্রেণীর প্রতিনিধি। এখানে একদিকে যেমন হাকিমুদ্দির শোষণের চিত্র স্পষ্ট তেমনি রহিম ও ফুলজানের প্রেমের চিত্র নাটকটিকে অন্য মাত্রা প্রদান করেছে। নাটকটিতে নাট্যকাহিনীর সঙ্গে মন্বন্তরের যোগস্থাপন গ্রামীণ সূত্রে নানাভাবে বিধৃত। সাধারণ কৃষক শ্রেণির প্রতিনিধি গোবিন্দ, শ্রীমন্তর মতন মানুষরা ধান নিতে যায় হাকিমুদ্দির কাছে। এই চিত্র বাংলার কৃষক শ্রেণীর কাছে পরিচিত। আবার এই মন্বন্তরের কারণেই ঘটে রহিম ও ফুলজানের বিচ্ছেদ।

ছেঁড়াতার নাটকের সমাপ্তি অংশ লক্ষ্য করলে দেখা যায় রহিমের মৃত্যু নাটকটিকে একটি অন্যমাত্রা বহন করেছে। ফুলজান সেই মৃত্যু যন্ত্রণায় চুরমার হয়ে যায়। হঠাৎই স্বামীকে হারিয়ে প্রেমিককে হারিয়ে সে একেবারে নিঃশ্ব হয়ে পড়ে। তার চাওয়া পাওয়ার আর কিছুই থাকেনা। নাটকটির পরিসমাপ্তি ফুলজানের এক যন্ত্রণাদায়ক পরিস্থিতির মধ্য দিয়েই ঘটে। ফুলজান বলে-

“জুড়াইছে? জুড়াইছে? আল্লা অয়্য কি জুড়াইছে?”^৬

সুতরাং সার্বিকভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় এক ভয়ানক পরিস্থিতি নাটকে মুখ্য হয়ে ওঠে। কেউ গ্রামে না খেয়ে মরে আবার কেউ শহরে ছুটে খাদ্যের আশায় প্রভৃতি চিত্র এখানে স্পষ্ট। তুলসী লাহিড়ী ছেঁড়াতার নাটকে মন্বন্তরের পটভূমিকে প্রয়োগ করে ব্যক্তির সংকটকে প্রাধান্য দিলেও সুকৌশলে রহিম ও ফুলজানের প্রেমের চিত্রকে বড় করে তুললেন। যেখানে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তাদের ব্যক্তি-সংকট, ছোটখাটো চাওয়া-পাওয়া ও তাদের ভালোবাসা। আর তাই নাটকটি উদ্দেশ্যমূলক হয়েও রহিম ও ফুলজানের প্রেমের চিত্র ব্যক্তিসংকটের মধ্য দিয়ে নতুন মাত্রা পায়। দুর্ভিক্ষ এখানে চিত্রায়িত হলেও প্রাধান্য পেয়েছে রহিম ফুলজানের প্রেম এবং শেষ পর্যন্ত আকাল থেমে গেলেও রহিম ফুলজানের সংকট নাটকটিকে পরিণতি দিয়েছে। এই সংকট ব্যক্তিসংকট। অর্থাৎ দুর্ভিক্ষ মূল কারণ হলেও রহিম ফুলজানের প্রেম তার মধ্য দিয়ে শিল্পিত রূপ পেলে।

তথ্যসূত্র:

১. গোস্বামী, সনাতন সম্পাদনা। তুলসী লাহিড়ী-র ছেঁড়াতার। ষষ্ঠ সংস্করণ- আশ্বিন ১৪১৩/অক্টোবর ২০০৬, প্রকাশক-জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৪ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা ৯, পৃ. ৫১।
২. তদেব, পৃ. ৯৪।
৩. তদেব, পৃ. ৯৫।
৪. তদেব, পৃ. ১১৮।
৫. তদেব, পৃ. ৯৪।
৬. তদেব, পৃ. ১২০।

সহায়ক গ্রন্থ:

১. গোস্বামী, সনাতন সম্পাদনা। তুলসী লাহিড়ী-র ছেঁড়াতার। ষষ্ঠ সংস্করণ- আশ্বিন ১৪১৩/অক্টোবর ২০০৬, প্রকাশক-জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৪ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা ৯।
২. ভোজ, মনোজ। শাস্ত্রে প্রেমে যন্ত্রণায় ছেঁড়াতার। দ্বিতীয় পরিবর্তিত সংস্করণ- বইমেলা ২০১২, প্রকাশক-বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা ৯।

৩. ঘোষ, জগন্নাথ সম্পাদনা। তুলসী লাহিড়ীর হেঁড়াতার। পুনর্মুদ্রণ -জুলাই ২০১৭, প্রকাশক- প্রজ্ঞা বিকাশ, ৯/৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা ৯।
৪. ঘোষ, অজিত কুমার। নাটকের কথা। সংশোধিত পঞ্চম সংস্করণ মাঘ ১৪১২, প্রকাশক- সাহিত্যলোক, ৫৭- এ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন, কলকাতা ৬।



সূর্য-দীঘল বাড়ি একটি আখ্যানের বিনির্মাণ

রঞ্জিত সরকার, রাজ্য সাহায্য প্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক, বাংলা বিভাগ সামসি কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 24.12.2025; Accepted: 25.02.2026; Available online: 28.02.2026

©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

Abstract

Surya Dighal Bari is a novel written by the renowned fiction writer of East Bengal, Abu Ishaq. Set against the backdrop of the Partition of India, famine, and communal riots, the novel vividly portrays how these historical realities emerged as curses in the lives of ordinary people.

Alongside this, the author shows how, under the pressure of social authority, Muslim women are compelled to live lives of terror behind the veil, and how these rigid codes are eventually challenged and broken—particularly through the character of Joygun. The novel highlights how women struggle for their existence and self-respect, and also draws attention to the terrifying consequences of child marriage within Islamic society.

Behind the façade of a seemingly folktale-like narrative, the novel realistically depicts how figures like Gadu Pradhan carry out social exploitation. Furthermore, the story illustrates how the young boy Hasu is broken by the daily struggle for survival, yet simultaneously reshapes and rebuilds himself. All these aspects are explored through an analytical discussion of the novel's narrative structure.

Keywords: Partition, Famine, Communal Violence, Women's Oppression, Struggle for survival

‘সূর্য দীঘল বাড়ি’ শুধু একটি উপন্যাস নই, জীবন-যুদ্ধের আখ্যান। আর এই আখ্যানের বিনির্মাণ-নির্মাণের সাক্ষী স্বয়ং উপন্যাসিক আবু ইসহাক। উপন্যাসটি ১৯টি পরিচ্ছেদে বা অধ্যায়ে বিভক্ত। এই উপন্যাসে এক দিকে যেমন দেখানো হয়েছে শহর কেন্দ্রিক নাগরিক সভ্যতা, তেমনি দেখানো হয়েছে গ্রামীণ সভ্যতা। তাই উপন্যাসের শুরুর অংশেই উপন্যাসিক দেখালেন শহর থেকে তারা গ্রামে প্রবেশ করছে। লেখকের ভাষায়-

“আবার তারা গ্রামে ফিরে আসে। পেছনে রেখে আসে স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, মা-বাপ, ভাই-বোন। ভাতের লড়াইয়ে তারা হেরে গেল।”

একদিকে যারা শহর কেন্দ্রিক জীবনে আশার আলো দেখেছিল, তারাই আজ নিঃস্ব হয়ে নতুন জীবনের স্বপ্ন নিয়ে গ্রামের বাস্তুভিটা আঁকড়ে থাকার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ উভয় ক্ষেত্রেই প্রতাপ নামক ব্যক্তির নিকট যারা শোষিত তাদের জীবন রূপকথার আড়ালে অন্য এক ইঙ্গিত দেয়, তার সাক্ষী এই উপন্যাস। আর এই উপন্যাসের এরকম চরিত্র সমাজ থেকে বঞ্চিত যারা, তাদেরকে কেন্দ্র করেই উপন্যাসের আখ্যানের বিশ্ববিক্ষা।

উপন্যাসের প্লট বা বৃত্তকে কেন্দ্র করে যারা আবর্তিত বা বিবর্তিত তারা হলেন- জয়গুণ, জব্বার মুন্সী, শফির মা, করিম বকস, ফকির জবেদ আলী, গ্রামের মাতব্বর গদু প্রধান, গেলির মা, লালুর মা, খুর্সিদ মোল্লা (ফুড কমিটির সেক্রেটারি) রশিদ, মেহেরণ, ফাতিমা, আঞ্জমান, হাসু, কাসু ও মায়মুন।

জয়গুণ এর প্রথম স্বামী- জব্বার মুন্সী (মৃত্যু) দ্বিতীয় স্বামী- করিম বকস (তালাক) উভয়ের সন্তান- হাসু, কাসু ও মেয়ে মায়মুন। করিম বকস এর প্রথম স্ত্রী- মেহেরণ (আত্মহত্যা)। দ্বিতীয়স্ত্রী- জয়গুণ (তালাক)। দুর্ভিক্ষের অজুহাতে। ফাতিমা বা আঞ্জমান পুরুষ নামক প্রতাপের নিকট অসহায়।

জয়গুণের সঙ্গী- গেলির মা, লালুর মা। (ট্রেনে করে সন্তায় চাল কিনে বিক্রি করা)। শফির মা ভিক্ষা করে দিন যাপন করে। উভয়ের বাস সেই সূর্য দীঘল বাড়িতে। নৌকা করে মাছ ধরে হারুন ও করিম বকস। মায়মুন এর বিয়ে হয় ওসমান এর সাথে। এছাড়াও উপন্যাসে উল্লেখিত হাতেম ও খাদেম দুই ভাই।

এই উপন্যাসে একদিকে যেমন রয়েছে রূপকথার অন্তরালে প্রান্তিক স্বর, অন্যদিকে পঞ্চাশের আকাল, দেশ ভাগের পর বিপর্যয়, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, তালাক প্রসঙ্গ, নারীর প্রতি সামাজিক অভিশাপ ইত্যাদি ইত্যাদি। যেহেতু উপন্যাসটি লেখাই হয়েছিল ১৯৪৬-৪৭ এর প্রেক্ষাপট এবং দেশ ভাগের পর সাধারণ মানুষের ওপর সামাজিক অভিশাপ কিভাবে আঘাত হেনেছিল তারই ইতিবৃত্ত।

যেহেতু উপন্যাসটির প্রকাশ সাল ১৯৫৫। তাই এই উপন্যাসে দুই বঙ্গের ছায়া সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে। ‘ছায়া’ শব্দটি এই কারনেই এখানে উল্লেখ করলাম যে অস্তিত্বের সংগ্রাম, স্বাধীনতার অধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য যে জাতি এক সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিল, কিন্তু কিছু স্বার্থান্বেষী, ক্ষমতালোভী ব্যক্তির জন্যই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে দাঙ্গা সৃষ্টি করে দেশবিভক্ত হতে বাধ্য হয়। সেই ব্যক্তির নামও উল্লেখ করেছেন, গান্ধী বা জিন্নার মতো ব্যক্তিদের কথা সাহিত্যিক। দাঙ্গায় অসংখ্য নিরীহ মানুষের প্রাণ বেঘোরে চলে যায়। সেই স্মৃতিই এখন লেখকের কাছে ছায়া। যাদের যন্ত্রনা এখনও লেখককে বিদ্ধ করে। আর এরকম এক অসহায় নারীর বীরত্বসংগ্রাম, অস্তিত্বের লড়াই ধর্মের খোলস উপড়ে ফেলে মানবতার লড়াইয়ে সামিল হলেন তিনি আর কেউ নন, জয়গুণ নামক চরিত্র সৃষ্টি করে সমকালীন উপন্যাসের জগতে জেহাদ ঘোষণা করেন। একদিকে মৌলবি শাসনতন্ত্র অন্যদিকে বাঁচার লড়াই এই দুইয়ের মধ্যে তিনি নিজেকে মুক্ত মননে ভাসিয়ে দিলেন। ভেঙ্গে দিলেন সেই প্রথাকে। লেখকের ভাষায়-

“জয়গুণ বাধ্য হয়েই ঘরের বার হয়েছে আজকে অনেক দিন। সে বাড়ী ঘর লেপে, ধান ভানে, চিড়া কোটে। সন্তায় চাল কিনতে যায় উত্তরে।...তাদের নিষেধ মেনে চললে না খেয়ে শুকিয়ে মরতে হবে, সে জানে।”^২

অর্থাৎ সে নিয়মতান্ত্রিক ঘেরাটোপে তিল তিল করে মরতে চাইনি। তাই সে সিদ্ধান্ত নেই- “খাইটা খ্যামু।” অথচ সে স্বামীর নিকট শূন্যে, এগুলো করলে পাপ হবে। তাও রাস্তায় পুরুষদের সাথে বেপর্দা হয়ে হেঁটে বেড়ায়। সে জানে দোজখের শাস্তির বিবরণ। তা স্বত্বেও এ সমস্ত বিধানকে আড়াল করে বাঁচার তাগিদে মুক্ত বাতাসে নিজেকে ভাসিয়ে দেয়। প্রথম স্বামী জব্বার মুন্সীর মৃত্যুর পর জয়গুণ তার মান ইজ্জতের ভার তুলে দিয়েছিল করিম বকশের ওপর। কিন্তু দুই বছর পর দুর্ভিক্ষের কারণ দেখিয়ে জয়গুণকে করিম বকশ তালাক দেয়। যা জয়গুণের নিকট ছিল জীবনের দ্বিতীয় বড় ধাক্কা। সেই সময় তার সন্তান ছিল হাসু, কাসু এবং মেয়ে মায়মুন ও কোলের একটি সন্তান। কিন্তু কোলের সন্তানটি অভাবের তাড়নায় সেই বছর মারা যায়। করিম বকশ কাসুকে রেখে জয়গুণকে তাড়িয়ে দেয়। কারণ করিম বকশ এর ধারণা-

“পুত্র সে হাতের লাঠি বংশের চেরাগ। / কন্যা সে মাথার বোঝা কুলে দেয় দাগ।”^৩

সমাজের এই নীতি আদর্শ মেনে তিন বছরের ছেলে কাসু থেকে যায় করিম বকশের কাছে। এক্ষেত্রে উপন্যাসিক চমৎকার ভাবে সেই গ্রামীণ লোককথা ব্যবহার করলেন তার এই উপন্যাসে। এই লোককথার মধ্যদিয়েই প্রমাণ হয় যে করিম বকশ নিজেই যেন একটা রাষ্ট্রতন্ত্র শাসকে রূপান্তরিত। কারণ তিনি যেভাবে মেহেরন, জয়গুণ, ফাতিমা বা আজ্জমানকে নিজের নিয়ন্ত্রনে বশ করে রাখতে চেয়েছেন; সেক্ষেত্রে করিম বকশ সফল হয়েছেন। একমাত্র ব্যতিক্রম জয়গুণ। তাকে দুর্ভিক্ষ বা অভাবের তাড়না দেখিয়ে ‘তালাক’ একটা কৌশল। তাই তার বর্তমানে বা অবর্তমানে সেই ধারা কাসু বজায় রাখুক। আর এই কারনেই মায়মুনকে জয়গুণের নিকট ছেড়ে দেয়। আর এভাবেই সমাজের আধিপত্যতা কায়ম রাখার প্রতিযোগিতায় ভূমিকা পালন করেছে- গদু প্রধান, মৌলবি, খুরশিদ মোল্লা, রশিদ, সলেমান এর মতো প্রতাপশালী ব্যক্তিরা। দেশভাগ হলেও সেই হতভাগা মানুষের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন হয়নি। তাই জয়গুণের আক্ষেপ অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই ভুলিয়ে দিয়েছে- “ধর্মের অনুশাসন।”^৪ লেখকের ভাষায়-

“জীবন ধারণের কাছে ধর্মের বারণ তুচ্ছ হয়ে যায়, মিথ্যে হয়ে যায় তার কাছে।”^৫ (৩য় অধ্যায়)

জয়গুণের একদিকে অস্তিত্বের লড়াই অন্যদিকে সামাজিক অপশাসন বা আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে মোকাবিলা। এই দুই সমন্বয় তার ব্যক্তিসত্তার নিকট কতটা চ্যালেঞ্জ ছিল, তা এ উপন্যাসের আখ্যান প্রমাণ করে। এরই মধ্যে শফির মা বার্তা নিয়ে আসে ওসমানের সাথে মায়মুনের বিয়ের প্রস্তাব। ওসমানের আগের বৌ মারা যাওয়ার পর তার বাবা মায়মুনের সাথে বিয়ে দিতে প্রস্তুত। কিন্তু জয়গুণ এখনই মেয়ে মায়মুনের বিয়ে দিতে আগ্রহী নয়, মায়ের কাছে মায়মুন এখনও ছোট বাচ্চা। সামাজিক চাপের নিকট নতি স্বীকার করে মায়মুনের বিয়ে দেই কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই তাকে শ্বশুর বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। অন্যদিকে কাসুর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় একপ্রকার বাধ্য হয়ে করিম বকশের বাড়িতে যায় এবং অসুস্থ কাসুকে চিকিৎসার জন্য ডাক্তারের ব্যবস্থা করেন। ডাক্তারের চিকিৎসায় কাসু সাড়া দেয় ও সুস্থ হয়ে ওঠে। করিম জয়গুণকে পুনরায় ফিরে পেতে চাইলেও তাতে জয়গুণ সাড়া দেয়নি। কারণ জয়গুণ চাইনি আর কোন নারী যেন তার মত জীবন অতিবাহিত না করুক। এখানেই জয়গুণের মানবিক হৃদয়-সত্তা বড় হয়ে ওঠে। জয়গুণ ভালো করেই জানে মেহেরন কেন আত্মহত্যা করেছিল? কিংবা ফাতিমা বা আজ্জমান এর জীবন কিভাবে অতিবাহিত। ইত্যাকার সকল প্রশ্ন জয়গুণকে বার বার তাড়িত করে। সেই কারণেই জয়গুণ নিজ গৃহে ফিরে এসেছে। কিন্তু করিম বকশও পিছুটান হয়ে কাসুকে দেখার কৌশলে জয়গুণের দ্বারে উপস্থিত। মেয়ে মায়মুন বসার জন্য পিঁড়ি দিলেও করিমের হাত শরীর কাঁপতে থাকে। সেই দৃশ্য জয়গুণের নজর এড়িয়ে যাইনি। সেই সূর্য দীঘল বাড়ীর চক্রান্ত যে গদু প্রধান সেই রহস্য উদ্ঘাটন করে করিম বকশ নিজের প্রাণ দিয়ে।

সমগ্র উপন্যাসের আখ্যানভাগ জুড়ে রয়েছে সূর্য দীঘল বাড়ীর রহস্য। আর এই বাড়িতেই সর্বস্ব হারিয়ে শফির মা ও জয়গুণ এর বসবাস। যে বাড়িকে কেন্দ্র করে সূর্য ওঠে এবং অস্ত যায় তার নাম ‘সূর্য দীঘল বাড়ী’। অর্থাৎ লেখকের ভাষায়- পূর্ব ও পশ্চিম প্রসারী বাড়ীর নাম। তাই সূর্য দীঘল বাড়ি। বাড়িটির পূর্ব ইতিহাস রয়েছে, এই ভিটায় হাতেম ও খাদেম নামক দুই ভাই থাকত। একদিন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে তাদের দুই সন্তান জলে ডুবে মৃত্যু হয়। সেই থেকেই এই বাড়ীর রহস্য কারও অজানা নয়। আর এই বাড়িতেই থাকতে এসেছে জয়গুণরা। সেই ভিটায় রয়েছে পুরন একটি তাল গাছ। ফকির জবেদ আলির তন্ত্র-মন্ত্র সাধনায় জয়গুণদের বেশ কয়েক বছর নিশ্চিন্তে থাকার বসবাস হয়ে উঠেছে। ফকির জবেদ আলির শ্যেন দৃষ্টি জয়গুণের নজর এড়িয়ে যাইনি। একদিকে গদু প্রধান জয়গুণকে হাসিল করার নানান ফন্দি কৌশল করেই চলেছে। তা স্বত্ত্বেও জয়গুণ নিজ সিদ্ধান্তে অটল থেকেছে। অভাবের তাড়নায় সন্তানদের দুমুঠো অল্প

সংস্থানের জন্য জয়গুণকে ট্রেনে করে সস্তায় চাল কেনার জন্য উত্তরে যেতে হয় এবং ট্রেনে গুনতে পায় দেশ স্বাধীন হবে। জয়গুণের মনে হয় দেশ স্বাধীন হলে চাল সস্তা হবে। মায়ের দারিদ্রতার লড়াই দেখে হাসুও নিজেকে মোট বহন করার কাজে যুক্ত হয়। হাসুর ব্যক্তিত্বে লক্ষ্য করা যায় ভাইয়ের প্রতি স্নেহ ও সততা। আর এই দুর্বলতার সুযোগে রশিদ কন্ট্রাক্টর তাকে স্বল্প মূল্যে বেশি পরিশ্রম করিয়েছে। দেশ স্বাধীন হল পূর্ব পাকিস্থানের পতাকা আসমানি শহর থেকে গ্রামে পতপত করে উড়ছে। হাসুও সেই আসমানি পতাকা লাগিয়ে দেয়। কিন্তু জয়গুণের মতো স্বপ্ন ছিল; সলেমান খাঁ, লোকমানের মতো ব্যক্তিদের দেশ স্বাধীন হলে চাল সস্তা হবে। সলেমান খাঁর কথা প্রসঙ্গে বলে উঠেন-

“সাদীন যে অইল হের কোন নমুনাই পাইলাম না আইজও। দিন দিন যে খারাপের দিগেই চলল।”^৬

সলেমানের ভাই লোকমানের বক্তব্য প্রায় কাছাকাছি-

“কত আশা ভরসা আছিল। সাদীন অইলে ভাত কাপড় সাইয়্য অইব। খাজনা মুকুব অইব।”^৭

এই আশা নিরাশা জয়গুণ কিংবা সলেমান বা লোকমানের মতো একক ব্যক্তির নয় সমগ্র বাংলাদেশের সেই প্রান্তিক, মেহেনতি, খেটে খাওয়া মানুষের স্বর। আর যারা প্রতাপ তারাতো চিরকাল ক্ষমতার অলিন্দে কিভাবে টিকে থাকতে হয় সেই কৌশল একই থেকে গেছে। শুধু সময় আর প্রেক্ষিতে তাদের শাসন ও শোষণের পথ আলাদা হয়েছে। তার প্রমাণ গদু প্রধান, ফুড সেক্রেটারি খুরশিদ কিংবা রশিদ কন্ট্রাক্টর এর মতো ব্যক্তির। আর সেই দৃশ্যর বাস্তবরূপ অঙ্কিত করেছেন কথাকার আবু ইসহাক।

সূর্য দীঘল বাড়ি উপন্যাসে একদিকে যেমন রয়েছে ইতিহাস অন্যদিকে রূপকথা। ইতিহাস ও রূপকথার অন্তরালে রয়েছে গ্রামীণ সভ্যতার, সংস্কৃতি ও সেই জনপদ জীবনের প্রান্তিক স্বর। শহর কেন্দ্রিক সভ্যতায় আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা রয়েছে। গ্রামীণক্ষেত্রে রয়েছে, তাবিজ, কবজ, ঝাড়-ফুক, তন্ত্র-মন্ত্র। তাই ফকিরের কাজে কিছুটা হলেও তার আধুনিক মনন মেনে নিতে পারেনি। এই দুইয়ের পার্থক্য জয়গুণ বোঝে। যেহেতু জয়গুণ জব্বার মুন্সীর সাথে বেশ কিছু দিন শহর কেন্দ্রিক জীবন কাটিয়েছে। তাই তার দৃষ্টিকোণ আধুনিকতাকে এড়িয়ে যায়নি। সেই প্রমাণ উপন্যাসের পরিসরে উপন্যাসিক দিয়েছেন। ইসলাম ধর্মের বেশ কিছু নিয়মের বাইরে গিয়ে সংসার ও সন্তানের দায়িত্ব পালন করার জন্য বেপর্দা হয়ে পুরুষের মধ্যে নিজেকে সমতুল্য করে তুলেছেন। গদুপ্রধান কিংবা মৌলোভীর নির্দেশকে তোয়াক্কা না করেই বাড়ীর বাইরে বেরিয়েছেন। কিংবা অল্প বয়সে মায়মুনের বিয়ে দিতে আগ্রহী নয় বা কাসুর চিকিৎসা ব্যবস্থায় আধুনিক মননে ডাক্তার পরামর্শ। অর্থাৎ এ উপন্যাসে আবু ইসহাক সমাজ ব্যবস্থার প্রতি, নির্মম অন্যায়ের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছেন এবং সামাজিক প্রথার শেকল ভেঙে ধর্মের উর্ধ্বে মানবতার দিকগুলির আখ্যানের মধ্যদিয়ে বিনির্মাণ করেছেন।

‘সূর্য দীঘল বাড়ি’ উপন্যাসটি শুধু উপন্যাসিকের লিখনে জীবন-যুদ্ধের আখ্যানের উর্ধ্বেও যে প্রথাগত ঐতিহ্য বা সংস্কৃতি ছিল, সেই দিকটিও উল্লেখ করতে ভুলেননি। তাই এই উপন্যাসে মন্বন্তর কিংবা দেশভাগের আখ্যান হলেও, যেমন রূপকথা বা লোকবিশ্বাস এর দিকটিও আলেখ্য লেখনী সৃজনে ধরা পড়েছে। হাদেম ও খাদেম নামক দুই ভাইয়ের সেই ভিটে মাটি ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়ার সেই ইঙ্গিত বহন করে। এই লোকবিশ্বাসের অন্তরালে গদু প্রধান নামক ব্যক্তির সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ক্ষমতা প্রদর্শনই আসলে উঠে আসে। ডক্টর আশরাফ সিদ্দিকী ‘লোকসাহিত্য’ প্রথম খণ্ডে উল্লেখ করেছেন-

“আদিম মানুষ যা যা ভয় করত, আধুনিক মানুষ হয়ত তার সবটাকে ভয় করে না। ভয়ের পাত্র বদলে গেছে, ভয় কিন্তু রয়ে গেছে। ভক্তি, ঘৃণা, ভালোবাসা, বিশ্বাস প্রভৃতি মনের ভাবগুলি সম্বন্ধেও এই কথা খাটে।”^৮

আধুনিক ব্যক্তিমননের বদল হাদেম ও খাদেম দুই ভাই না পারলেও সফির মা, জয়গুণ তা করে দেখিয়েছে। এক্ষেত্রে উপন্যাসিক পুরুষ তান্ত্রিক সমাজের আধিপত্যবলয় ভেঙে জয়গুণ এর মত নারী চরিত্র সৃষ্টি করে সমকালীন সমাজেই শুধু নয়, আধুনিক সমাজেও সেই বার্তা পৌঁছে দেওয়ার ইঙ্গিত এই ‘সূর্য দীঘল বাড়ি’ নামক উপন্যাস।

উপন্যাসিক এ উপন্যাসে দেশভাগের আড়ালে বা স্বাধীনতার নামে এক শ্রেণীর ভণ্ড বা শোষণকারীর মুখোশ খুলে দিয়েছেন। যারা ধর্মের নামে বেসাতি করে কিংবা মুখোশের আড়ালে নিজেকে মোড়ল বা বিবেকবান বলে প্রতিষ্ঠা পান। সে ফকির হোক বা গদু প্রধান কিংবা খুরসিদ মোল্লা বা রাসিদের মত ব্যক্তিবর্গ। এরা প্রত্যেকেই শোষণ করেছে সেই, মাটির মানুষকে। কখনো বিনা পারিশ্রমিকে বেগার খাটিয়ে হাসুর মত একটি শিশুকে রাশিদ সাহেব যথাযথ পাওনা না মিটিয়ে অপমানজনক ভাবে শরীর মালিশ করিয়েছে। এবং তাকে সারারাত ফুটপাতে মশার কামড়ে রাত কাটাতে হয়। কখনো বা রেশনের নামে লাইনে দাড় করিয়ে খালি হাতে ফিরিয়ে দিতেও তাদের বিবেককে দংশন করেনি। কখনো বা বাস্তুভিটা মস্তুর নামে বেঁধে দেওয়ার টোটকা। বিনিময়ে পিতলের বাসনপত্র বা টাকা পয়সা নেওয়ার নতুন নতুন ফন্দি ফিকির কৌশল বার করেছে, এই মুখোশধারীরা। বরঞ্চ এ তাদের উল্লাস বা আনন্দের উপহার।

‘সূর্য দীঘল বাড়ি’ উপন্যাসের আখ্যানের অন্যতম দৃষ্টি আকর্ষণকারী চরিত্র হল জয়গুণের কন্যা মায়মুন। অল্প বয়স থেকেই মায়ের অনুপস্থিতিতে সংসারে যাবতীয় দ্বায়িত্বকর্ম নিজের হাতে তুলে নিয়েছে। তাই তার মায়ের মতে বয়স দশ হলেও মেয়ে মায়মুনকে সাত বছরের মনে হয়। উপন্যাসিকের লেখনীতে ফুটে উঠেছে; রোগা পাতলা ছিপছিপে হাড় ক্ষয় শরীর মায়মুনের। তাই মেয়েকে নিয়ে চিন্তিত জয়গুণ। সফীর মা উদ্যোগের সাথে মায়মুনের বিয়ে দিতে আগ্রহী বিবিহারী ওসমানের সাথে। কিন্তু জয়গুণ এই বিয়েতে প্রথমে সম্মতি দেননি। কারণ এই অল্প বয়সে বিয়ে দিলে শারীরিকভাবে মেয়ের ক্ষতি হবে কিন্তু সামাজিক চাপ ও অর্থনৈতিক অভাবের তাড়নায় মায়মুনকে ওসমানের সাথে বিয়ে দিতে সম্মত হন। তাই জয়গুণ সামাজিক বয়কটের ভয়ে, সামাজিক বিধি মেনেই মেয়ের বিয়ে দিলেন। কিন্তু ওসমানের পরিবার যে মেয়ে নয় কাজের দাসী আনবেন সেই বক্তব্যই ধরা পড়েছে ওসমানের পিতা সোলেমানের বাচনে- “দুই মাসের মইদ্যেই দ্যাখবা বউ আমাগ লায়েক অইছে।”^৯ মায়মুন শাশুড়ি জরিনা বিবির অত্যাচার সহ্য করতে একপ্রকার অভ্যস্ত হয়েই গিয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার শাশুড়ি তাকে সেই তাল গাছের নিশানায় অর্থাৎ সেই সূর্য দীঘল বাড়িতেই একপ্রকার ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেয়। যে অল্প বয়সের মেয়ে তার এক প্রকার খেলার বয়স যে এখনো মায়ের আঁচল ছাড়তে পারেনি, বাল্য বিবাহ দিলে কি ভয়ঙ্করতম ক্ষতি হতে পারে, সেই দৃশ্য তুলে ধরতে ভুলেননি কথাকার আবু ইসহাক। বিশেষ করে ইসলামিক সমাজেও যে অল্প বয়সে বিয়ে সামাজিক অভিশাপ হতে পারে সেই চিত্র মায়মুনের মধ্য দিয়ে অঙ্কিত করেছেন।

হাসু চরিত্রটিও উপন্যাসের কেন্দ্রীয় পটভূমির অন্যতম। উপন্যাসিক এই চরিত্র সৃষ্টি করে সামাজিক পরিসরে এক বিপ্লব ঘটিয়েছেন। মায়ের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সাংসারিক দ্বায়িত্ব পালনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। হাসুর মধ্যে একদিকে মাতৃপ্রেম অন্যদিকে ভাই ও বোনের প্রতি স্নেহ লক্ষ্য করা যায়। জীবন ও যুদ্ধের সংগ্রামে প্রাণের বাজি রেখে ভরা গাঙে ঝাঁপ দিয়ে লঞ্চে ওঠে, মোট বহন করার কাজে যুক্ত হয়, কিন্তু নম্বরহীন হওয়ায় তাকে অন্যান্য শ্রমিকের হাতে আঘাতপ্রাপ্ত হতে হয়। তা স্বত্ত্বেও সে সংসারে দুমুঠো

অল্প তুলে দেওয়ার জন্য সে এ ধরনের ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত। সে চায় সৎ পথে উপার্জন করে বাঁচতে। কিন্তু খুরসিদ মোল্লার মত ব্যক্তির বিনা পয়সায় পরিশ্রম করিয়ে উপযুক্ত মূল্য না দিয়ে অপমান করে তাড়িয়ে দেওয়ার নতুন নতুন কৌশল খোঁজে। সেই চিত্র যেমন ধরা পড়েছে, তেমনি হাসুর সৎ ও নিষ্ঠাবান দ্বায়িত্বের দিকও লক্ষ্য করা যায়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর যেমন গাছের উপর আসমানি পতাকা অর্থাৎ পাক পতাকা লাগানোর দৃশ্য, তেমনি ভাই কাসুর প্রতি স্নেহ ও ভালোবাসা, এমনকি বোন মায়মুনের বিয়ের বাজার থেকে, কাসুর চিকিৎসার জন্য বাড়ীতে ডাক্তার আনার ব্যবস্থা সবই দৃশ্য এ উপন্যাসের আখ্যানভাগে ফুটিয়ে তুলেছেন উপন্যাসিক।

হাসু চরিত্রের পাশাপাশি এ উপন্যাসে সফী চরিত্রটিও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। সফী চরিত্র ছাড়া হাসুর অস্তিত্ব অসম্পূর্ণ। তাই ক্ষেত্র বিশেষে সফী, হাসুর এগিয়ে যাওয়ার দিকই ইঙ্গিত করে।

এ উপন্যাসে দেশভাগ প্রেক্ষিত, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, আকাল, মন্বন্তর মহামারীর করালরূপ ছাড়াও উপন্যাসিক আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রতি জোর দিয়েছেন। তাইতো উপন্যাসিক দেখালেন প্রাচীন কবিরাজ প্রথা, ঝাড়-ফুক, তাবিজ-কবজ, যে কত ভয়ঙ্কর রূপে গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থাকে গিলে ফেলেছে, সেই প্রথাকে বাদ দিয়ে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান দ্বারা মানুষকে সুস্থ করা যায় তার সেই দিকটাই জয়গুণ দ্বারা ডাক্তারের আগমনকেই ইঙ্গিত করে। কাসু অসুস্থ হওয়ার ফলে করিম বকশ প্রথমে ফকির দ্বারা ঝাড়ফুকের ব্যবস্থা করেন কিন্তু এতে কাসুর শারীরিক অবস্থার অবনতি দেখা দেয়। এই সংবাদ জয়গুণের নিকট পৌঁছতেই সে প্রাচীন প্রথার বিরুদ্ধে একপ্রকার বিপ্লব করে নিজস্ব ব্যক্তিত্বেরবলে এলপ্যাথিক ডাক্তার আনার ব্যবস্থা করেন এবং সেই ব্যক্তিত্বে সফলও হোন। ধীরে ধীরে কাসু সুস্থ হয়ে ওঠে। নিউমেনিয়া রোগে আক্রান্ত কাসু একথা জানতেই ডাক্তার বলে ওঠেন—

“দেশের শাসন ক্ষমতা আমার হাতে থাকলে ব্যাটাদের ফক্করবাজি দেখিয়ে ছাড়তাম ফাঁসি দিতাম ব্যাটাদের। এ নরহত্যা ছাড়া কিছু নয়।”^{১০}

এখানে উপন্যাসিক অন্ধকারময় জগত থেকে আলোর দিকে এগিয়ে যাওয়ার বার্তা দিয়েছেন সময়ের সাথে সাথে। অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার যে সামাজিক অভিশাপ সেই দৃশ্যই এই উপন্যাসে নতুন করে দেখা দিল।

এ উপন্যাসের আখ্যানভাগে পুরুষতান্ত্রিকতার আধিপত্যবিধি বা লিখনবানী যাদের হাতে সেই দিকগুলিও উল্লেখ করতে ভুলেননি উপন্যাসিক। তাদের মধ্য উল্লেখ্য রহমত কাজী যার দ্বারা পরিচিতি ঘটছে সূর্য দীঘল বাড়ী নামক বাস্তুভিটার। রহমত কাজী স্বয়ং জানিয়েছেন—

“সূর্য দীঘল বাড়ীর গাব গাছের টিকিতে চুল ছেড়ে দিয়ে একটি বউ দুপা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে।”^{১১}

অর্থাৎ এবাচনই মনে করিয়ে দিচ্ছে আর যেন কেউ সেই ভিটের দিকে ফিরে না তাকায়। এই ধরনের কুসংস্কার ঘেরাটোপ বন্দীতে ঐ ভিটাতে যেন কেউ প্রবেশ করতে না পারে, এই মনোভাব নিয়ে এগিয়ে এসেছে গদুর মতো ক্ষমতাবান ব্যক্তির। যার অঙ্গুলি হেলেনেই সমাজের ব্যবস্থা চলে। আর উপন্যাসের আখ্যানেও সেই দৃশ্যই বার বার ফুটে উঠেছে। এই বাস্তুভিটায় একরাশ আশা নিয়ে ঘর বাঁধার জন্য গ্রামে ফিরেছে জয়গুণ ও সফীর মা। কিন্তু নিজস্ব ব্যক্তিত্বের জোরেই জয়গুণরা সেই ভিটেতে থাকার ব্যবস্থা করে। কিন্তু উপন্যাসের শেষে করিম বকশের মৃত্যুই সেই বাস্তুভিটার অলৌকিক রহস্য প্রকাশ করে।

শুধু তাই নয়, এ উপন্যাসের আখ্যান জানান দেয় পিতৃতন্ত্র প্রতাপ কিভাবে নিজেদের বশ্যতায় নারীদের পণ্য মনে করে সেই দিকও উল্লেখিত। ফকির, গদু প্রধান, করিম বকশ, সোলেমান, ওসমান, খুরশিদ মোল্লা তার দৃষ্টান্ত। ফকির জবেদ আলীর কাজ ঝাড়ফুক, তাবিজ কবজ এর মাধ্যমে নিজের অল্পসংস্থান করা। জয়গুণদের পর্ব-২, বিশেষ সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি, ২০২৬

বাস্তুভিটেতে থাকার ব্যবস্থা করার মাধ্যমে তার নজর পড়েছে। তাই সে গোপনে তার কামনার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে জয়গুণের শরীরে। গদু প্রধানও জয়গুণের একাকিত্বের সুযোগ কাজে লাগাতে চেয়েছে। কিন্তু জয়গুণের ব্যক্তিত্বের নিকট এরা প্রত্যেকেই বিফল হয়েছে। করিম বকশের নিকটতো নারী ভোগ্য হয়ে উঠেছে। এক স্ত্রীর মৃত্যুর পর আরেক বিয়ে তার যৌন লালসার ইঙ্গিতই বহন করে। সোলেমান এর মত ব্যক্তির নিকটও নারী হচ্ছে ভোগ্য দাসী। ওসমানের প্রথম স্ত্রীর বিয়োগের পর দ্বিতীয় বিয়ে এবং সেই মায়মুনকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেওয়া যেন তার কাছে উৎসব বা আনন্দের মত। খুরসিদ মোল্লার কোলকাতায় থাকাকালীন তার শরীর মালিশ যেন সেই যৌনতার ইঙ্গিত দেয়। অর্থাৎ এরাই সেই সমাজের আধিপত্যতা কায়ম করে রেখেছে। আর সেই সমাজের সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন জয়গুণ। তাই এই প্রতাপরাই আবার ধর্মের দোহাই দিয়ে জয়গুণকে আটকানোর ব্যবস্থাও করেছেন।

জরিলা বিবিকে এ উপন্যাসে একটি পুতুল চরিত্র বললেও হয়ত ভুল হবেনা। জরিলা বিবিকে নিয়ন্ত্রন করেছে সোলেমান এর মত ব্যক্তির। তানাহলে মায়মুনের মত একটি অল্প বয়সের ফুটফুটে মেয়েকে বাড়ী থেকে বের করে দিতে একটুও দ্বিধা করেনি। নারী হয়ে নারীর আত্ননাদ বুঝেনি। বুঝেনি সে নারীর যন্ত্রণা, দুঃখ কষ্ট। উপন্যাসিক একদিকে জয়গুণের মত প্রতিবাদী নারী চরিত্র সৃষ্টি করেছেন; তেমনি অপরদিকে পুরুষতন্ত্র বলয়ে নারী কিভাবে নিজেকে সেই জালে জরিয়ে নিজেই যন্ত্রে রূপান্তরিত হচ্ছেন সেই চিত্র।

উপন্যাসিক আবু ইসহাক এই উপন্যাসে দেখিয়েছেন; প্রাচীন প্রথা কিভাবে আধুনিক মনন ভাবনাকে ক্ষমতার অলিন্দে থাকা ব্যক্তির নিজস্ব কৌশল দ্বারা পরিচালনা করে অন্ধকার জগতে ঠেলে দেয় সেই দৃশ্য। আবার সেই প্রথার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালে ধর্মের নামে ভয় দেখিয়ে কিভাবে সামাজিক বয়কট করে একঘরে করে দেওয়া হয় সেই দৃশ্যও। তাইতো উপন্যাসিক প্রথমেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়েছেন শহর থেকে গ্রামের মধ্যে প্রবেশ। জয়গুণ শহর অর্থাৎ আধুনিকতার ছোঁয়া যে পেয়েছিলেন তা উপন্যাসের আখ্যানে স্পষ্ট। তাই সে আলোর জগত থেকে ফিরে সেই বাস্তুভিটেতে অর্থাৎ সূর্য দীঘল বাড়ীতেই নয় গ্রামের মধ্যে আলোর বিচ্ছুরণ ঘটাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সমাজের মাতব্বরা সেই পথের বাধা হয়ে, ভূত প্রেত নামক ছায়া অশরীরী আত্মার খেলায় মেতে উঠলেন। আর এই অন্ধ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে একা নারী হয়ে সেই লড়াইয়ে সামিল হোন। একদিকে দারিদ্রতার লড়াই অপরদিকে আত্মসম্মানের লড়াই এই দুই সংগ্রাম তাকে নানান সময় পিছুটান করলেও লক্ষ্যে কিন্তু অবিচল ছিলেন। অবশেষে তার চিন্তা ও চেতনার সাফল্য এসছিল। অর্থাৎ আলো থেকে বৃহত্তর জগতে উজ্জ্বল আনার লক্ষ্যেই এই উপন্যাসের আখ্যানভাগ নির্মিত।

সুতরাং দেশভাগ প্রেক্ষিত ও দ্বিতীয়বিশ্বযুদ্ধ, সাম্প্রদায়িকদাঙ্গা এবং আকাল, মহামারীর পরিসরে সূর্য দীঘল বাড়ী একটি উপন্যাসই শুধু নয়, ধর্মের উর্ধ্ব মানবতার অস্তিত্বের সংগ্রাম এবং প্রান্তিক শ্রেণীর চিহ্নায়কও বটে। উপন্যাসিক এ উপন্যাসে অবলা থেকে সবলা কিভাবে হতে হয় সেই দিকগুলি তুলে ধরেছেন যেমন, তেমনি তার আত্মসম্মানের লড়াই কিভাবে সামাজিক পরিসরে টিকিয়ে রাখতে হয় সেই দিকগুলোও দেখিয়েছেন।

তথ্যসূত্র:

১. ইসহাক, আবু। সূর্য দীঘল বাড়ি। ঢাকা, বাংলাদেশ প্রথম সংস্করণ (১৯৫৫), চিরায়ত প্রকাশন, গ্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।
২. তদেব, পৃ. ৯২২।
৩. তদেব, পৃ. ২৩। তদেব, পৃ. ৮৫। তদেব, পৃ. ৮৬। তদেব, পৃ. ১০৪। তদেব, পৃ. ১১৬।

৪. তদেব, পৃ. ১১।

৫. রায়, দেবেশ। উপন্যাস নিয়ে। কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০৩।

৬. চক্রবর্তী, সুধীর (সম্পাদক)। বুদ্ধিজীবীর নোটবই। পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ২০০৫।

৭. সিদ্দিকী, আশরাফ। লোকসাহিত্য। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, মল্লিক ব্রাদার্স, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০৭।

৮. তদেব, প্রথম খন্ড, পৃ. ১৪।

৯. আলম, খুরশিদ। সমাজ গবেষণা পদ্ধতি। কবির পাবলিকেশন্স, বাংলাবাজার, ঢাকা, তৃতীয় প্রকাশ, ২০১২।

১০. ভট্টাচার্য, তপোধীর। প্রতীচ্যের সাহিত্য তত্ত্ব। অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা বইমেলা, ২০০২।

১১. ভট্টাচার্য, তপোধীর। বাখতিন তত্ত্ব ও প্রয়োগ। পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৯৬।



শেরশাবাদিয়া সমাজে প্রচলিত কিস্সা-কাহিনী বা লোককথা: লোককিস্মদন্তির ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্য অনুসন্ধান

মসিউর রহমান, রাজ্য সাহায্য প্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক-১, ইংরেজি বিভাগ, সামসি কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 05.02.2026; Accepted: 21.02.2026; Available online: 28.02.2026

©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

Abstract

'Kissa-kahini', which is the traditional folk narratives of the Shershabadia community, refers to the legends told by parents or ancestors to their children, upholding their cultural, moral, and historical significance. The functions of these kissa-kahini are not only entertainment but also living documents of collective memory, social values, belief systems, and the formation of Shershabadia identity. These are part of the Shershabadia literature uplifting the community's past struggles, social, cultural, and moral significance. According to historians and various records, the Shershabadias were mostly members of Sher Shah's army. They hailed from the Shershababad pargana; later, mostly engaged in cultivation and a few with various other professions. As a representation, five Kissa-kahini are taken, covering from humourous satire like "Fus Padri O Bhonk Padri" to narratives of intelligence and survival like "Bugburhi". "Nilasman", "Nati, Burhi, Daini O Pithar Golpo" are the depiction of deception, destiny, and moral retribution. "Ganak Jolhar Nin" is about luck, intelligence, and circumstances utilising effectively, a person's unfortunate situation changes, leading to success and respect. These are analysed in different perspectives for their symbolic structure, characterization, narrative strategy, and ethical implications. This research article attains certain observations drawing upon oral accounts collected from the Shershabadia community's elders, storytellers, and the author's parents. Thus, writing aims to constitute an essential cultural archive that reflect the moral structure, social psychology and community consciousness of the Shershabadia, offering valuable insights for scholars of folklore anthropology and cultural studies.

Keywords: Literature, Shershabadia, Kissa-kahini, Culture, Community etc

প্রচলিত কিস্সা-কাহিনী বা লোককথা হলো এমন কথা বা গল্প যা পিতামাতা বা ঠাকুরদা-ঠাকুর মা, নানা-নানি, মাসি-মেসো বহু বছর ধরে কথার মাধ্যমে তাদের পোতা-পুতিন, নাতি-নাতনী, ভাগ্না ভাগ্নি ও সন্তানদের কাছে হস্তান্তর করেছেন। এটিকে একটি বৈশিষ্ট্যগতভাবে বোনামী, কালহীন এবং স্থানহীন গল্প হিসাবেও বর্ণনা করা যেতে পারে, যা বিভিন্ন সত্য বা কখনও আজগুবি ও কুসংস্কারের উপর ভিত্তি করে গঠিত এবং সাধারণ মানুষের মৌখিক ঐতিহ্যের অংশ। প্রায়শই, আমরা দেখে থাকি, লোককথা বা কিসসা-কাহিনির একটি গভীর অর্থপূর্ণ তাৎপর্য থাকে, যার মৌলিক উদ্দেশ্য হলো শ্রোতা বা পড়ুয়াদের একটি ইতিবাচক নৈতিক বার্তা দেওয়া। প্রতিটি

দেশের যুগ যুগ ধরে নিজ নিজ লোককথার প্রচলন রয়েছে যা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে চলে আসছে। এই লোককথা বা কিস্সা-কাহিনীগুলি ওই দেশের সম্প্রদায়ের শুধুমাত্র বিনোদনমূলক সাহিত্য নয় বরং এগুলি সেই সম্প্রদায় ও জনগোষ্ঠীর ইতিহাস, মূল্যবোধ, বিশ্বাস ও সাংস্কৃতিক সচেতনতা ঐ সম্প্রদায়ের সামাজিক জীবন্ত কাঠামো ও দলিল, যা সম্প্রদায়ের লোক-কিস্মদন্তির ঐতিহ্য। লিখিত ইতিহাসের সীমাবদ্ধতায় দাঁড়িয়ে লোককথাই বহু ক্ষেত্রে একটি সামাজ্যের অতীত, আত্ম-সংগ্রাম, ও বিবর্তন, সেই সমাজের পরিচয়ের অনুলিখন হয়ে ওঠে। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে মুখ থেকে নির্গত এই লোককথা বা কিস্সা-কাহিনীগুলির মধ্যে নিহিত থাকে মানুষের জীবন সংগ্রাম, দর্শন, নৈতিক শিক্ষা, বিনোদন ও লোকবিশ্বাসের বহুমাত্রিক প্রকাশ। শেরশাবাদিয়া সমাজের ক্ষেত্রেও লোককথা বা কিস্সা-কাহিনীগুলি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বহন করে। শেরশাবাদিয়াদের দৈনন্দিন জীবন, প্রকৃতি-নির্ভরতা, ধর্মীয় বিশ্বাস, সামাজিক আচরণবিধি এবং নৈতিক আদর্শ এই লোকায়ত কাহিনির মধ্য দিয়েই প্রতিফলিত হয়েছে। নদী, বন, পীর-মাজার, অলৌকিক শক্তি, পূর্বপুরুষের আত্মা কিংবা শুভ-অশুভ ধারণা; সবই এসব কাহিনিতে প্রতীকী ও বর্ণনামূলক রূপ লাভ করেছে। অন্যান্য সম্প্রদায়ের মতোই শেরশাবাদিয়াদের মধ্যেও আজও অসংখ্য বা অজস্র অশেষ কিস্সা-কাহিনী বা লোককথা যা লোককিস্মদন্তীর আধার তার জোর প্রচলন ও প্রসারণ বিদ্যমান।

এই গবেষণামূলক প্রবন্ধে সংকলিত কিস্সা-কাহিনী ও লোককিস্মদন্তীগুলি মূলত শেরশাবাদিয়া সমাজে প্রচলিত মৌখিক ঐতিহ্যের ওপর ভিত্তি করে রচিত। প্রাথমিক নিজে এই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় অনেক কাহিনী তাঁর কাছে মুখস্ত হলেও, সেগুলিকে গবেষণার দৃষ্টিভঙ্গিতে পুনর্গঠন ও সংরক্ষণের প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন প্রবীণ ব্যক্তি, লেখক, লোকগায়ক ও গ্রামবাসীর কাছ থেকে সংগৃহীত কাহিনীগুলিকেও এখানে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। অতএব, এই প্রবন্ধটি কেবল স্মৃতিচারণ নয়; বরং শেরশাবাদিয়া সমাজের লোকসংস্কৃতি সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণের একটি আন্তরিক প্রয়াস। প্রায় পাঁচটি লোককথা বা কিস্সা-কাহিনীর মধ্য দিয়ে শেরশাবাদিয়া সমাজের যে লোককিস্মদন্তী তা জীবনবোধ, সামাজিক নৈতিকতা, বিশ্বাস ও সংস্কৃতিগত পরিচয়ের মাধ্যমে পাঠকের সামনে উন্মোচিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। আশা করা যায়, এই সংকলন ভবিষ্যৎ গবেষক, লোকসংস্কৃতি-অনুরাগী এবং সমাজ-ইতিহাসচর্চায় আগ্রহী পাঠকদের কাছে একটি মূল্যবান দলিল হিসেবে বিবেচিত হবে। শেরশাবাদিয়া লোককথা বা কিস্সা-কাহিনীগুলো আলোচনা করার আগে শেরশাবাদিয়া ভাষা ও জনগোষ্ঠীর সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল। শেরশাবাদিয়া, একটি কৃষি প্রধান জনগোষ্ঠী, নদীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। মধ্যযুগ থেকে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ করে গৌড়ীয় অঞ্চল মালদা ও মুর্শিদাবাদে এদের আধিক্য বেশি। এছাড়াও দুই দিনাজপুর, বিহারের কাটিহার, পূর্ণিয়া, কিশানগঞ্জ, সুপুল, আরাড়িয়া জেলায়, ঝাড়খণ্ডের সাহেবগঞ্জ ও পাকুড় জেলায় এদের বসবাস লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে বাংলাদেশের কিছু অংশ রাজশাহী, চাপাই-নবাবগঞ্জে এদের বসবাস পরিলক্ষিত হয়েছে। তবে এই জনজাতির উৎস ও বিস্তার সম্পর্কে নানাবিধ মতামত আছে। মহসিন আলী, একজন বেসরকারি মাদ্রাসার শিক্ষক ও সাহিত্য অনুরাগী, তার ‘শেরশাহবাদ পরগণার অবস্থান’ বইতে তিনি বিভিন্ন জনের মতামত আলোচনা করে সিদ্ধান্তে আসেন, সেই সিদ্ধান্তগুলো হুবহু উল্লেখ করা হলো।

প্রথম সিদ্ধান্ত: সর্বপরি কাগজে বা সরকারী কাজ কর্মে কখনই সরসাবাদ লেখা হয়নি। সরসাবাদ বই থেকে বই- এ এসেছে কিন্তু শেরশাহাবাদ কথাটা সরকারী কাগজ পত্রে অনেক বার পাওয়া গেছে সুতরাং শেরশাহাবাদ শব্দটি বেশি গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হওয়া উচিত।

দ্বিতীয়ত: উইলিয়াম হান্টার লিখেছেন শেরশাহাবাদ পরগণা শিবগঞ্জ থানায় অবস্থিত। ল্যামবর্ণ লিখেছেন শিবগঞ্জ থানায় শেরশাহাবাদ পরগণাতে রয়েছে। সরসাবাদ পরগণা বলে লেখেন নি। অতএব শেরশাহাবাদ পরগণা ও শিবগঞ্জ থানা একই এলাকা একই অবস্থান।

তৃতীয়ত: শিবগঞ্জ থানা এখন বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার উপজেলা। এই জেলায় শিবগঞ্জ নামে এক পৌরসভা ১৫ টি ইউনিয়ন পরিষদ এবং দুইশোটি মৌজা রয়েছে। তাদের কারো নাম সরসাবাদ নেই-জলপূর্ণ এলাকার জন্য তার নাম সরসাবাদ হয়নি। তার উপরে কোন তথ্য পাওয়া যায় না। শেরশাহাবাদ বলেও কোন স্থানের নাম নেই। এ নাম থাকার কথা নেই কারণ এ নাম শেরশাহের দেওয়া ইচ্ছাধীন নাম। কাগজ বই পত্র ছাড়া এ নামের কোন অস্তিত্ব নেই।

চতুর্থত: আইন-ই-আকবরী সরসাবাদ শব্দ নিয়ে যারা লিখেছেন তারা সকলেই সরসাবাদ লিখেছেন আর যে সব লেখক সরকারী নাম পত্র দেখে লিখেছেন তারা লেখেন শেরশাহাবাদ। এস. কে. লাহিড়ী তার Criminal science and crime Delection গ্রন্থের ২৮৭ পাতায় বলেছেন, “He (Shersha) left behind him a large number of Pathan soldiers who settle in the pargana called Shershabad. These pathan came to be known as shershabadia.” ডঃ মহঃ শহীদুল্লাহ তার সম্পাদিত গ্রন্থ বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধাপ গ্রন্থের ৭৫২ পাতায় বলেছেন, বাদিয়া শেরশাবাদ পরগনার অধিবাসী। M.O. Cartar তার Settlement Report গ্রন্থের ৪৩ পাতায় বলেছেন, “Shershabadiyas or more generally known as the Badiyas. The name is derived from shershabad pargana.”

এই সকল ঐতিহাসিকদের কথায় জানা যায় শেরশাবাদিয়াগণ শেরশাহের সেনাবাহিনীর অধিকাংশ লোক এবং তারা শেরশাহাবাদ পরগণা থেকে এসেছে। কোন লেখক লেখেন নাই যে তারা সরসাবাদ থেকে এসেছে এবং শেরশাহের সেনাবাহিনী নয়। আলোচনার আলোকে বলা যায় যে ঐতিহাসিক দলিল, সরকারি নথি ও প্রামাণ্য গবেষকদের বক্তব্য অনুযায়ী শেরশাহাবাদ নামটিই অধিক গ্রহণযোগ্য ও যথার্থ। শেরশাবাদিয়ারা শেরশাহ সূরীর সেনাবাহিনীর উত্তরসূরি এবং তাঁদের পরিচয় শেরশাহাবাদ পরগণার সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত।

এই শেরশাবাদিয়া লোককথা বা কিস্সা কাহিনীগুলিকে একে একে textual- cultural lens-এ আলোচনা করা হলো, যেখানে রাখা হয়েছে শেরশাবাদিয়া ভাষায় লোককথা বা কিস্সাগুলো এবং তার বাংলা ভাষায় অনুবাদ। তারপর সেগুলোকে বিভিন্ন আলোকে বিচার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই ব্যাখ্যা ও বিচার বিশ্লেষণে; বিষয়বস্তু, চরিত্র নির্মাণ, প্রতীক ও রূপকের ব্যবহার, নৈতিক শিক্ষা এবং সমাজচিত্রকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাই শেরশাবাদিয়া সমাজের নানান দিক, জীবনদর্শন, সামাজিক মূল্যবোধ এবং নৈতিক শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রজন্মান্তরে সংরক্ষণ অবসম্ভবী প্রয়োজনীয়তা বরং শেরশাবাদিয়া কিস্সা-কাহিনীগুলির ভেতরে লুকিয়ে আছে সমাজের নৈতিক কাঠামো, পারিবারিক সম্পর্ক, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য, লোকবিশ্বাস, ভাগ্যচক্র এবং মানুষের বুদ্ধি ও কৌশলের মাধ্যমে বিপদ মোকাবেলার বর্ণনা। এসব উপাদান সমাজবিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব ও লোকসাহিত্য গবেষণার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহ করে। এই আলোচনার মাধ্যমে শেরশাবাদিয়া সমাজের লোকজ জ্ঞান, বিশ্বাস ও জীবনদর্শনকে একাডেমিক আলোচনার কেন্দ্রে আনার জন্য একটি প্রয়াস নেওয়া হয়েছে, তা নিচে বিবৃত হলো।

শেরশাবাদিয়া লোককথা বা কিস্সা-কাহিনী-১:

ফুস্ পাদড়ি ও ভুঁক্ পাদড়ি:

অ্যাক্ রাজা আছিল। রাজার অ্যাক্খান ম্যালাই সুন্দরী, টকটকা বহু বিহা কইরা আনলো। বহু সব দিক দিয়া ভালোই আছিল। কিনতো একখান খুত আছিল তার; সে বেজায় ফুস্ ফুস্ কইরা পাদতো। আর সেই পাদের পর্ব-২, বিশেষ সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি, ২০২৬

গন্ধে রাজবাড়ী শুদ্ধ সবাই ছি! ছি! কইরা উঠতো। এতে রাজার মন বেজায় ব্যাজার হইয়া গেল। তার ভীষণ লজ্জা লাগতো। শেষে একদিন রাজা সেই বউ রাণীটাকে রাজবাড়ী থাইকা তাড়াইয়া দিল আর আরেকখান তেমনই সুন্দরী বহু বিহা কইরা আনলো। এই লতুন বহু রাণী আগকারটার মতো সারাক্ষণ ফুস্ ফুস্ কইরা পাদতো না। সে বছরে খালি একবারই পাদতো, তাও ভঁক্ কইরা জোরসে। গন্ধও প্রায় হইতো না। তাই রাজা আর রাজ্যের প্রজা, সবাই খুব খুশী। দিন যাইতে যাইতে দেখা গেল, সেই একবারের পাদের সময় ঘনাইয়া আসতেছে। তখন গোটা রাজবাড়ী শুদ্ধ সবাই ভয় পাইয়া গেল। যে য়েদিকে পারলো, দৌড় দিয়া পালাইলো। কিনতো পাশের ঘরে শুইয়া আছিল রাজার খুব বুড়হা বাপ। বার্ষিক্যের ভারে সে আর কোনো দিকেই পালাইতে পারলো না। ঠিক এমনি সময় আকাশ-পাতাল কাঁপাইয়া বহু রাণী ভঁক্ কইরা পাদ দিল। আর সেই বিকট আওয়াজে রাজার বুড়হা বাপটা তাৎক্ষণিক অক্কা পাইয়া গেল। এই দৃশ্য দেইখা রাজা তখন ক্ষেদে কাঁদিয়া উঠলো আর কইলো, “ভঁক্ পাদড়ি থিকা ফুস্ পাদড়ি বোহু হামার ভালুই আছিলো। কিনতো, এই ভঁক্ পাদড়ি বোহু অ্যাস্যা হামার বুড়হা বাপটাকে ম্যারাই ফেললো।”

শেরশাবাদিয়া লোককথা বা কিস্সা-কাহিনীর বাংলা অনুবাদ: এক রাজা ছিল রাজার একখানা সুন্দর বউ ছিল বউটি সব দিক থেকেই ভালো কিন্তু বড় দোষ ছিল তার এই যে সে প্রায় ফুসফুস করে বাদ দিতো। এই পাদের বেজায় দুর্গন্ধ হত তাই রাজবাড়ী সভায় তাকে নিয়ে ছি! ছি! করতো। এতে রাজার ভীষণ মন খারাপ ছিল। রানীর এই কাজে সে ভীষণ লজ্জিত ছিল, ফলে একদিন সে বিরক্ত হয়ে লজ্জায় বৌরানী কে তাড়িয়ে দিল নিজের বাড়ি থেকে এবং তৎক্ষণাৎ আরো একটা সুন্দর বউ বিয়ে করে আনলো। তবে ইনি আগের মত সারাক্ষণ ফুসফুস করে পাদতো না। বরং বছরে সে একবার করে পাদ দিতো। তাও আবার করে খুব জোরে ভাঁক করে। তার ফলে গন্ধ হয় না বললেই চলে। তাই রাজা প্রজা সবাই খুশি এবার। কিন্তু দেখতে দেখতে এরই মধ্যে তার অর্থাৎ ওই দ্বিতীয় বৌরানীটির পাদার সময় ঘনিয়ে আসে। গোটা এটা শুদ্ধ সকলেই তটস্থ হয়ে ওঠে যে য়েদিকে পারলো পালালো ভয়ে। কিন্তু পাশের ঘরে শুয়ে থাকা রাজার বৃদ্ধ পিতা বয়সের কারণে সে পালাতে পারল না, নিরুপায় হয়ে শুয়ে থাকতে হলো ঘরের মধ্যে। বার্ষিক্যের কারণে পালাতে না পারায় রানী খুব জোরে, আকাশ পাতাল কাঁপিয়ে পাদ দিলে রাজার বৃদ্ধ পিতার মৃত্যু ঘটলো। তাই দেখে রাজা তখন এই বলে ক্ষেদ করে কেঁদে ওঠে যে, ‘ভঁক্ পাদড়ি’ থেকে ‘ফুস্ পাদড়ি’ বউ আমার বেশি ভাল ছিল। কিন্তু ‘ভঁক্ পাদড়ি’ বউ থেকে ‘ফুস্ পাদড়ি’ অনেক ভালো হল কারণ ‘ভঁক্ পাদড়ি’ বউ এসে আমার বৃদ্ধ পিতাকে মেরেই ফেলল।

শেরশাবাদিয়া লোককথা বা কিস্সা-কাহিনীর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ: উপরের লোক কাহিনীতে সামাজিক নৈতিকতা, রসবোধ, ক্ষমতা-কাঠামো, মানবিক দুর্বলতা, এবং দৈনন্দিন জীবনের বাস্তবতা ব্যঙ্গ রসিকতার মাধ্যমে প্রকাশ পায়। আলোচ্য কাহিনীটি প্রথম দর্শনে অশালীন ও হাস্যকর মনে হলেও এর অন্তর্নিহিত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্য গভীরভাবে বহন করে যে কারনে হাস্যরস ও ব্যঙ্গাত্মক লোক-ধারায় অন্তর্ভুক্ত হয়। শেরশাবাদিয়া লোকো কথাই শারীরিক আচরণ দৈহিক দুর্বলতা কিংবা তথাকথিত অশোভন বিষয়কে কেন্দ্র করে গল্প রচনা প্রবণতা দেখা যায়, যার উদ্দেশ্য কেবল হাস্যরস সৃষ্টি নয় তার সাথে সাথে সমাজের ভণ্ডামি ও কৃত্রিম স্বাধীনতার মুখোশ খুলে দেওয়া। এখানে ‘ফুস্ পাদড়ি’ ও ‘ভঁক্ পাদড়ি’ -এই দ্বৈত প্রতীকের মাধ্যমে তুলনামূলক বিচার ও মানবিক সীমাবদ্ধতাকে তুলে ধরা হয়। কাহিনীটি পরিণাম বনাম তীব্রতা (frequency vs intensity) ধারণাকে ব্যঙ্গাত্মকভাবে তুলে ধরে।

এই কাহিনীতে অতিশয়েক্তি (hyperbole), ব্যঙ্গ (satire) ও লোক রস (folk humour) প্রধান নান্দনিক উপাদান দিয়ে ভরা আছে। এখানে তুলনামূলক বিচার ও অনুশোচনা মনস্তত্ত্বকে সম্মুখে উদ্ভাসিত করে। রাজা

প্রথম রানী কে তার ছোট ছোট ভুলের জন্য ত্যাগ করে দ্বিতীয় রানী কে গ্রহণ করে। এই দ্বিতীয় রানী অনেক গ্রহণযোগ্য হলেও সময়ের সঙ্গে বোঝা যায় দ্বিতীয় রাণীর যে বড় ভুল সেটা আগের রানীর ছোট ছোট ভুলের থেকে অনেক মারাত্মক এবং ক্ষতিকর। এই কাহিনীতে বোঝানো হয়েছে, মানুষ প্রায়ই তো পরিচিত সমস্যার চেয়ে অজানা ও সম্ভাব্য ভয়ংকর সমস্যাকে বেছে নেই, যার ফল আরো মারাত্মক হয়। বৃদ্ধ পিতার মৃত্যু এই ঘটনাটা নিছক হাস্যরসের স্তর থেকে তুলে এনে নৈতিক শিক্ষার স্তরে নিয়ে যায়। আমরা যেখানে দেখতে পাচ্ছি বৃদ্ধ পিতা আসলে সমাজের দুর্বল অক্ষম শ্রেণীর প্রতীক। যারা সব সময় বিপদের সম্মুখীন হয় এবং নিজের জীবন দিয়ে বিপদকে রক্ষার চেষ্টা করে। কর্তব্য দায়িত্ব ও সিদ্ধান্তের ইঙ্গিত বহন করে।

অবশেষে বলা যায়, এই শেরশাবাদিয়া কাহিনীটি সমাজে লোককিস্মদন্তির স্বভাব সুলভ বৈশিষ্ট্য, রসিকতা, ব্যঙ্গ, অতিশয়িত ও নৈতিক শিক্ষা সমন্বিত একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ, এটি শুধু বিনোদনের জন্য নয় বরং সমাজের অন্তর্গত সত্য, মানবিক দুর্বলতা ও সাংস্কৃতিক বোধকে প্রজন্মান্তরে বহন করে একটি গুরুত্বপূর্ণ লোকসাহিত্যিক দলিল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শেরশাবাদিয়া লোককথা বা কিস্সা-কাহিনীর নীতিকথা: জলদি করে নেওয়া সিদ্ধান্ত বড় অনুশোচনার কারণ হয়।

শেরশাবাদিয়া লোককথা বা কিস্সা-কাহিনী-২:

বাগ-বুড়িহি:

নানি যে কিনা বুড়িয়া গেছে, যাইবে নাতনির বাড়ি, তো পার হিয়া যাইতে হইবে বনবাদাড়। তো ডহারে বাঘের সাথে দেখা। বাগ তো কহিছে বুড়ি তোর গোস খাবো। কিন্তু বুড়িহি গা এত রোগা আর জীর্ণশীর্ণ, যে খালি হার হাড়-মাসটুকু পাইবে। তাও বাঘ খাইতে চাহিছে, তখন বুড়িহি বাগ কে বুঝান দিয়া কহিলো, সে এখন নাতনির বাড়ি যাইছে সেখানে ভালো-মন্দ খেয়া টাইয়া মোটা হইয়া আসবে, তখন হাকে খাইস। বাগ এবার রাজি হইলো। নাতনির বাড়ি থৈইক্যা ফিরার ওয়াঙে নানি কহিলো যে, ডহরে বাগ-ভাল্লুকের মসিবত। ওয়াকে কদমা ভ্যাঙো তার ভিতরে ভরইয়া পা দিয়া ঠেইলা জোরসে গড়িয়ে দিলে সে উদ্ধার পাবে ও বাড়িহি যাইতে সক্ষম হবে। নাতনী তাই করল, কদমা গড়িয়া চললো- ‘কদমা গড়হ গড়হ’, ‘কদমা গড়হ গড়হ’। বুড়িহি আরো জোরে চল্লো, ‘টাই-টুই চল কদমা টাই-টুই’। বাগ দেখতে পাইয়া পা দিয়ে ভেঙে ফেললে বুড়িহি ব্যাহির হলো। এবারকার তো বাগ বুড়িহির গোস খাইবে। বুড়িহি কহিলো, যে গোস খাইলে মুখ-হাত ধুয়ার দরকাজ পড়বে তাই লন্দীর কানধাই গিয়া খাইলে ম্যাল্লাই ভালো হইবে। বাগ এটাইতেই রাজি হইলো। সেখানে বুড়িহি একমুঠা বালু লিয়া জোরসে ফেললো বাগের চোখের ভিত্রে। বাগ তখন অন্ধ হইয়া চোখ রগড়াইতে লাগলো। বুড়িহি লিচিন্দে নিজের বাড়িহি গিয়া পৌঁছালো।

শেরশাবাদিয়া লোককথা বা কিস্সা-কাহিনীর বাংলা অনুবাদ: নানি যে এখন বৃদ্ধ, যাবে নাতনির বাড়ি। মাঠ তারপর জঙ্গল পেরিয়ে যেতে হবে। পথে বাঘের সঙ্গে দেখা, বাঘ বুড়ির মাংস খেতে চায় কিন্তু বুড়ি এতই রোগা আর জীর্ণশীর্ণ। যে তার শরীরে শুধু হাড় আছে। একটুকুও মাংস নেই, তাই সে বাঘকে বুঝিয়ে বলল যে সে নাতনির বাড়ি থেকে ভাল ভাল খাবার খেয়ে মোটাসোটা হয়ে আসুক, তারপর খাবে। বাঘ তাতেই রাজি হল। নাতনির বাড়ি থেকে ফেরার সময় নানি বলল যে পথে বাঘ-ভাল্লুকের বিপদ। তাকে কদমা ভেঙে তার ভিতর ভরে পা দিয়ে ঠেলে জোরে গড়িয়ে দিলে সে উদ্ধার পাবে ও বাড়ী যেতে সক্ষম হবে। নাতনী তাই করল, কদমা গড়িয়ে চলল- ‘কদমা গড় গড়’, ‘কদমা গড় গড়’। বাঘ দেখতে পেয়ে পা দিয়ে ভেঙে ফেললে কদমাটা, আর সেখান থেকে বুড়ি বের হল। এবার তো বাঘ বুড়ির মাংস খাবে। বুড়ি বলল যে মাংস খেলে মুখ-হাত ধোয়ার

প্রয়োজন পড়বে, তাই নদীর ধারে গিয়ে খেলে অনেক ভাল হবে। বাঘ তাতেই রাজি হল। সেখানে বুড়ি একমুঠো বালি নিয়ে জোরে ফেলল বাঘের চোখের ভিতর। বাঘ তখন অন্ধ হয়ে চোখ রগড়াতে লাগল। বুড়ি নিরাপদে, নিজের বাড়ি গিয়ে পৌঁছাল।

শেরশাবাদিয়া লোককথা বা কিস্সা-কাহিনীর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ: এই শেরশাবাদিয়া লোককাহিনিগুলো মৌখিকভাবে সমাজে প্রচলিত আছে, যেখানে সমাজের বিভিন্ন দিক, গ্রামীণ বাস্তবতা, বোন জঙ্গল কেন্দ্রিক যে ভয়, লোকোজো বুদ্ধি ও কৌশল এর মাধ্যমে বিপদকে মোকাবেলা করা ইত্যাদির বর্ণনা থাকে। এখানে দেখা যায় যে বাঘ হিংস্র ও শক্তিশালী প্রাণী থাকা সত্ত্বেও মানুষের বুদ্ধির কাছে তাকে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে। তাই এখানে বৃদ্ধা নারীর অসম সাহসিকতা, বুদ্ধিমত্তা ও প্রজ্ঞার পরিচয় পেয়েছে। শারীরিকভাবে দুর্বল হলেও নানী মানসিকভাবে শক্তিশালী ছিল। এই কাহিনীটি লোকসাহিত্যের সেই দিকটা বর্ণনা করেছে, যেখানে শক্তির থেকে বুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পেয়েছে।

শেরশাবাদিয়া সমাজে বাঘ একটি বিপদের প্রতীক, অশুভ শক্তির প্রতীক। কিন্তু এখানে বাঘকে সহজ সরল ভাবে প্রকাশ করা হয়েছে, যেখানে বিশ্বাস ও নিষ্পাপের সারল্যতা লোকসাহিত্যেরই রসবোধ ও কল্পনার বৈশিষ্ট্য বহন করে। কদমার ভিতর ঢুকে গড়িয়ে যাওয়া দৃশ্যটি শেরশাবাদিয়া সমাজের একটি রূপক। এটিতে দেখানো হয়েছে গ্রামীণ জীবনে কিভাবে আশেপাশের উপাদানকে ব্যবহার করে বড় বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। নদীর ধারে নিয়ে যাওয়া এবং চোখে বালি ছিটিয়ে দেওয়া বাস্তব উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় বহন করে। এই লোক কাহিনীর মধ্য দিয়ে বোঝানো যায় বাচ্চাদের যে, কিভাবে বুদ্ধি ও কৌশলের মাধ্যমে জীবন যুদ্ধে জয়ী হওয়া যায়। সাথে সাথে এখানে বয়স্কদের অভিজ্ঞতাকে সম্মান দেওয়া হয়েছে। তাই, এটি শেরশাবাদিয়া সমাজের নৈতিক পরীকঠামো হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শেরশাবাদিয়া লোককথা বা কিস্সা-কাহিনীর নীতিকথা: বুদ্ধি, সতর্কতা ও উপস্থিতমন, দুর্বল মানুষকে ভয়ংকর বিপদ থেকে রক্ষা করে।

শেরশাবাদিয়া লোককথা বা কিস্সা-কাহিনী-৩:

নাতি, বুড়ি, ডাইনি ও পিঠার গাছ:

নানির কাছে নাতির হ্যাঁঠা জিদ, সে ধরাইছে যে পিঠা খাইবেই। চাইল আর সিননির পিঠা, খাইতে ম্যালাই টেস্ট, মন্দ লয়। খাইতে খাইতে অ্যাকটা পিঠা ব্যাঁচা গেলছে। নানি কহিলো, যে মাটির ভিতরে পুঁইত্যা দিতে। পিঠার গাছ হল। মাঝে মাঝে বুড়ির নাতি গাছে চড়া পিঠা খায়। একদিন ডাইনি বুড়ি এসে পিঠা চাহিলো। গাছের নীচে নেমে যেই ডাইনি বুড়িকে পিঠা দেওয়া, অমনি বুড়ি ছেলেটাকে বস্তাতে লিয়া চলল জঙ্গলে নিজের বাড়ি, সেখানে তাকে কেটে তার মাংস খাবে। রাস্তাতে ডাইনি বুড়ি বস্তা রেখে একটা ঝোপঝাড়ে পায়খানায় বসেছে। আশেপাশে ছিল গরুর রাখাল। ওরা বস্তা খুলে বুড়ির নাতিকে উদ্ধার করল আর বস্তার ভিতর ইট-পাথর- কাঁটা ভরে বস্তার মুখ যেভাবে বাঁধা ছিল ঠিক সেইভাবে বেঁধে দিল। ডাইনি বুড়ি এসে বস্তাটাকে মাথায় নিয়ে ছুটে চলল। ইট-পাথর আর কাঁটার যন্ত্রণাকে সে মনে করল যে ছেলেটা লাথির গুঁতো দিচ্ছে আর চিমটি কাটছে। জঙ্গলে গিয়ে বস্তা খুলতে ডাইনি বুড়ির খুব দুঃখ হল। অনেকদিন কেটে গেল। ডাইনি বুড়ি একদিন সুযোগ বুঝে ছেলেটাকে আবার বস্তাবন্দি করে জঙ্গলে নিয়ে এল। সেখানে ডাইনি বুড়ির এক মেয়ে ছিল। বুড়ির নাতি মেয়েটাকে বলল যে আমার পোশাক তোমাকে খুব মানাবে। মেয়েটা তাই করল। মেয়ের শাড়ি পরে ছেলেটা ডাইনির মেয়ে সেজে বলল মা মাংস খাবো। ডাইনি বুড়ি ছেলেটাকে কেটে, স্নান করে আসতে বলল,

আসলেই মেয়েটা কাটা পড়ে গেছে। আর কি মেয়ে ফিরে আসে, সে তো আসলে ছেলে। নদীতে গিয়ে বুড়ির নাতি হেল্যা নিজের বাড়ি ফিরা গেলো।

শেরশাবাদিয়া লোককথা বা কিস্সা-কাহিনীর বাংলা অনুবাদ: নাতি নানির কাছে জেদ ধরেছে, পিঠা খাবে। চাল আর গুড়ের পিঠা, খেতে মন্দ নয়। খেতে খেতে একটা পিঠা বেঁচে গেল। নানি বলল যে মাটিতে পুঁতে দাও। পিঠার গাছ হল। মাঝে মাঝে বুড়ির নাতি গাছে চড়ে পিঠা খায়। একদিন ডাইনি বুড়ি এসে পিঠা চাইল। গাছের নীচে নেমে যেই ডাইনি বুড়িকে পিঠা দেওয়া অমনি বুড়ি ছেলেটাকে বস্তাতে নিয়ে চলল জঙ্গলে নিজের বাড়ি, সেখানে তাকে কেটে তার মাংস খাবে। রাস্তাতে ডাইনি বুড়ি বস্তা রেখে একটা ঝোপঝাড়ে পায়খানায় বসেছে। আশেপাশে ছিল গরুর রাখাল। ওরা বস্তা খুলে বুড়ির নাতিকে উদ্ধার করল আর বস্তার ভিতর ইট-পাথর-কাঁটা ভরে বস্তার মুখ যেভাবে বাঁধা ছিল ঠিক সেইভাবে বেঁধে দিল। ডাইনি বুড়ি এসে বস্তাটাকে মাথায় নিয়ে ছুটে চলল। ইট-পাথর আর কাঁটার যন্ত্রণাকে সে মনে করল যে ছেলেটা লাথির গুঁতো দিচ্ছে আর চিমটি কাটছে। জঙ্গলে গিয়ে বস্তা খুলতে ডাইনি বুড়ির খুব দুঃখ হল। অনেকদিন কেটে গেল। ডাইনি বুড়ি একদিন সুযোগ বুঝে ছেলেটাকে আবার বস্তাবন্দি করে জঙ্গলে নিয়ে এল। সেখানে ডাইনি বুড়ির এক মেয়ে ছিল। বুড়ির নাতি মেয়েটাকে বলল যে আমার পোশাক তোমাকে খুব মানাবে। মেয়েটা তাই করল। মেয়ের শাড়ি পরে ছেলেটা ডাইনির মেয়ে সেজে বলল মা মাংস খাব। ডাইনি বুড়ি ছেলেটাকে কেটে, স্নান করে আসতে বলল, আসলেই মেয়েটা কাটা পড়ে গেছে। আর কি মেয়ে ফিরে আসে, সে তো আসলে ছেলে। নদীতে গিয়ে বুড়ির নাতি সাঁতরিয়ে নিজের বাড়ি ফিরে গেল।

শেরশাবাদিয়া লোককথা বা কিস্সা-কাহিনীর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ: আমাদের দেশের আদিবাসী অস্ট্রিক ও মঙ্গোলীয় জাতির ডাইনি প্রথা ও বিশ্বাস, নরমাংস ভক্ষণ ইত্যাদি স্থান পেয়েছে গল্পটিতে। পিঠার গাছ হওয়ার বিষয়টা অবাস্তব হলেও আমাদের খাদ্যবস্তুর মূলে বয়েছে মাটি, জল, আলো ও বাতাস। মানুষের বুদ্ধি কলা-কৌশলের কাছে শুধু ডাইনি বুড়ি নয় পৃথিবীর সবকিছুকেই হাতের মুঠোয় করতে পেরেছে এই মানুষ। নানি চরিত্রটি স্নেহ ভালোবাসা ও আদরের প্রতিভু নাতির কাছে, অন্যদিকে নাতি সহজ সরল বুদ্ধিদীপ্ত। এখানে ডাইনি এক অশুভ শক্তি সামাজিক ভয় ও শিশুকে চুরি করা, তাই বিপদের প্রতীক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে, আর এর ফলে গ্রামীণ সমাজে শিশুদের সতর্ক করার উদ্দেশ্য নিয়ে সংযোজিত হয়েছে।

রাখালদের ভূমিকা আমাদের সমাজে দায়িত্ববোধ ও সহযোগিতা ধারণা প্রকাশ করে। দ্বিতীয়বার ডাইনির হাত থেকে ছেলেটার আত্মরক্ষা ছলনার মাধ্যমে মুক্তি, শিশু বুদ্ধি ও তার উপস্থিত কৌশলকে গুরুত্ব দেয়। নারীর পোশাক গ্রহণ ও পরিচয়-বদলের কাহিনী লোকো কথার প্রচলিত রূপান্তর কৌশলের অংশ। সবশেষে বলা যায় এই কিস্সাটি শেরশাবাদিয়া সমাজে প্রচলিত নৈতিক শিক্ষা, ভয় নিয়ন্ত্রণ শিশুদের সামাজিকীকরণ এবং লোকবিশ্বাসভিত্তিক জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রতিফলন হিসেবে বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ।

শেরশাবাদিয়া লোককথা বা কিস্সা-কাহিনীর নীতিকথা: ভয় অশুভ শক্তির সামনেও সতর্কতা মানবিক সহযোগিতা ও বুদ্ধিই মানুষকে বিপদের হাত থেকে রক্ষা করে।

শেরশাবাদিয়া লোককথা বা কিস্সা-কাহিনী-৪:

গনক জোলাহ-র নিন্:

অ্যাকটা আনকোরা গাঁয়ে, এক জোলাহ কিছু চাষযোগ্য জমিন লিয়া বসবাস করছিল। মাঠে হাইল-বলদ লিয়া চাষ করতে যায়, আর তার বোহু পঁহাতে লাহরি হিসাবে একটা হাতের উটি আর ধৈনার চাটনি লিয়া হাজির। এ্যাতে কিন্তু প্যাট ভরে না। উটি গড়হা হয় ম্যালাই অখচ বেশির ভাক খ্যায়া লাই ওর বোহু, জোলাইন। পরের

দিন জোলাহ মাঠে গিয়া হাইল র্যাইখা ও বলদজোড়া বাবলা গাছে ব্যাঁইক্ষ্যা তড়িঘড়ি বাড়ীর কান্টা থাইকা হাঁইসালঘরের একটা ফুটা দিয়া সব দেখলো, উটি গড়হার সংখ্যা সাত। তারপর সে লককইরা তাড়াহুড়া কৈরা মাঠে পৌঁছা গেলো হাল বাহিতে এবং চালু কৈরা দিলো। সেদিনকেও ওর বহু সময়মত একটা উটি আর ধৈনার চাটনি লিয়া হাজির। তার স্বামী উটি দেইখা উঁচু গলায় বলল, “থপ থপ্যাতে সাত উটি, হাকে দিব্যাহ একটা উটি।” স্ত্রী ভাবল নিশ্চয় তার স্বামী গণকঠাকুরের মত অনেক বিদ্যা, তাই সে জ্যানা লেছে। বাড়ী গিয়া সে একথাটা পাড়াহ-প্রতিবেশীদের কাছে কানফুসড়াইলছে। কয়েকদিন পর ওই গাঁয়ে এক ধোপার গাধা চুরি হৈয়া গেলছে। ধোপা গণনা করার জন্য আসে জোলাহ-র বাড়ি। তার আগের দিন সন্ধ্যায় জোলাহ ধোপার গাধাটাকে দেখেছিল গাঁয়ের পশ্চিম দিকে একটা গোঁড়হার পাশে গো-ভাগাড়ে। ধোপা আসলে সে তার অ্যাগনায় ধূপধূনা জ্বাইলা বিভিন্ন নক্সা আঁকা গাধার দিক নির্দেশ কৈরা ধোপাকে জানিয়ে দিল। গাধার প্রান্তিতে ধোপা বেজাই খুশি হইলো। একজন ভাল গণকদার হিসাবে জোলাহ-র সুনাম চারিসাইডে ছোড়িয়ে পইড়লো। এইবার ওরঘি দ্যাশের রাজকন্যার হার চুরি হইলো। হারখান চুরহা যে দিতে পারবে সে অনেক টাকা পুরস্কার পাবে কিন্তু কেউ খোঁজখবর দিতে পারে না। শেষে রাজার সেপাইহি সেই নামকরা গণকদার জোলাহর কাছে হাজির। সাত দিনের মধ্যে রাজকন্যার গলার হারের সন্ধান না দিলে জোলাহসহ আর স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের কচুকাটা করে ম্যাইরা ফেলা হবে। জোলাহ কোন গণকদার নয়, সে মহা চিন্তায় পড়লো। রাইতে তার নিন্ হয় না, সে সারা রাইত নিন্কে ডাকতে থাকে, “নিন আয়সেক”, “নিন আয়সেক” কিন্তু কিছুতেই নিন্ আসে না। ওই দ্যাশের কোন এক গ্রামের নিন নামের এক মহিলা হার চুরি করেছিল। সে চুপি চুপি নিশ্চি রাইতে জোলাহর বাড়ির পিছনে এসে শুনছে গণকদার তার নাম ধইরা হাঁকছে। নিন মনে মনে ভাবল যে রাজার হাতে পড়লে তার রেহাই নেই, তাই সে খার্বাহখারি জোলাহর পায়ে পড়ে বলল যে সে রাজকন্যার হার চুরি কইরা রাজ অটালিকার পাছাদিকে উত্তর-পশ্চিম কোণে ছাইয়ের স্তূপের ভিতরে লুকিয়ে রেখেছে, কিন্তু খবরদার রাজার কানে তার নাম যেন উচ্চারণ করা না হয়। জোলাহ এবার হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। সাতদিন গত হইলে তার পরদিন সকালবেলা সে স্যাজাঙজা একেবারে রাজদরবারে হাজির। ধূপধূনা জ্বালিয়ে, তেলপড়াহ, জলপড়াহ করে অনেক রকমের মন্ত্র আওড়ালো, তারপর সেখান থেকে উঠে ছাইয়ের স্তূপের ভিতর থৈকা রাজকন্যার হার বের করে দিল। রাজা-রানী, রাজকন্যা, রাজদরবারের অন্য সবাই খুব খুশি। জোলাহকে রাজদরবারে নিয়োগ করা হল। তার পরিবারের থাকার জন্য দালানঘর তৈরী হল। জোলা তার বৌ ও ছেলেমেয়েদের নিয়ে সুখে-শান্তিতে দিন কাটাইতে লাগলো।

শেরশাবাদিয়া লোককথা বা কিস্সা-কাহিনীর বাংলা অনুবাদ: কোনো এক গ্রামে, জোলা কিছু চামযোগ্য জমি নিয়ে বসবাস করছিল। মাঠে হাল-বলদ নিয়ে চাষ করতে যায়, আর তার বৌ সকালবেলার জলখাবার হিসাবে একটা হাতের রুটি আর ধনে পাতার চাটনি দিয়ে আসে। এতে কিন্তু পেট ভরে না। রুটি তৈরী হয় বেশি অথচ বেশী ভাগ খেয়ে ফেলে তার বৌ, জোলাইন। পরের দিন জোলা মাঠে গিয়ে হাল রেখে ও বলদজোড়া বাবলা গাছে বেঁধে তড়িঘড়ি বাড়ীর পিছনে রান্নাঘরের একটা ছিদ্র দিয়ে সব দেখল, রুটি তৈরির সংখ্যা সাত। তারপর সে দ্রুতবেগে মাঠে পৌঁছে চাষ করতে শুরু করল। সেদিনও তার বৌ সময়মত একটা রুটি আর চাটনি নিয়ে হাজির। তার স্বামী রুটি দেখে উঁচু গলায় বলল, “থপ থপ্যাতে সাত উটি, হাকে দিব্যাহ একটা উটি।” স্ত্রী ভাবল নিশ্চয় তার স্বামী গণকঠাকুরের মত অনেক বিদ্যা, তাই সে জেনে ফেলেছে। বাড়ী গিয়ে সে একথাটা পাড়াপ্রতিবেশীদের কাছে প্রচার করে। কয়েকদিন পর ওই গ্রামের এক ধোপার গাধা চুরি যায়। ধোপা গণনা করার জন্য আসে জোলাহর বাড়ি। তার আগের দিন সন্ধ্যায় জোলা ধোপার গাধাটাকে দেখেছিল গ্রামের পশ্চিম দিকে একটা জলাশয়ের পাশে গো-ভাগাড়ে। ধোপা এলে সে তার আঙিনায় ধূপধূনা জ্বালিয়ে বিভিন্ন নক্সা আঁকে

গাধার দিক নির্দেশ করে ধোপাকে জানিয়ে দিল। গাধার প্রাপ্তিতে ধোপা খুব খুশি হলো। একজন ভাল গণকদার হিসাবে জোলায় সুনাম চারদিকে ছাড়িয়ে পড়ল। এবার ওই দেশের রাজকন্যার হার চুরি হলো। হারের সন্ধান যে দিতে পারবে সে অনেক টাকা পুরস্কার পাবে কিন্তু কেউ খোঁজখবর দিতে পারে না। শেষে রাজার সেপাই সেই নামকরা গণকদার জোলায় কাছে হাজির। সাত দিনের মধ্যে রাজকন্যার গলার হারের সন্ধান না দিলে জোলাসহ তার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের কচুকাটা করে মেরে ফেলা হবে। জোলা কোন গণকদার নয়, সে মহা চিন্তায় পড়ল। রাতে তার ঘুম হয় না, সে সারা রাত ঘুমকে ডাকতে থাকে, “নিন আয়সেক”, “নিন আয়সেক” অর্থাৎ ঘুম আয়, ঘুম আয় কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসে না। ওই দেশের কোন এক গ্রামের নিন নামের এক মহিলা হার চুরি করেছিল। সে চুপি চুপি নিশ্চুতি রাতে জোলায় বাড়ির পিছনে এসে শুনছে গণকদার তার নাম ধরে ডাকছে। নিন মনে মনে ভাবল যে রাজার হাতে পড়লে তার রেহাই নেই তাই সে সোজাসুজি জোলায় পায়ে পড়ে বলল যে সে রাজকন্যার হার চুরি করে রাজ অটালিকার পিছনে উত্তর-পশ্চিম কোণে ছাইয়ের স্তূপের ভিতর লুকিয়ে রেখেছে, কিন্তু খবরদার রাজার কানে তার নাম যেন উচ্চারণ করা না হয়। জোলা এবার হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। সাতদিন গত হলে তার পরদিন সকালবেলা সে সেজেগুজে একেবারে রাজদরবারে হাজির। ধূপধুনা জ্বালিয়ে, তেলপড়া, জলপড়া করে অনেক রকমের মন্ত্র আওড়ালো তারপর সেখান থেকে উঠে ছাইয়ের স্তূপের ভিতর থেকে রাজকন্যার হার বের করে দিল। রাজা-রানী, রাজকন্যা, রাজদরবারের অন্য সবাই খুব খুশি। জোলাকে রাজদরবারে নিয়োগ করা হল। তার পরিবারের থাকার জন্য দালানঘর তৈরী হল। জোলা তার বৌ ও ছেলেমেয়েদের নিয়ে সুখে-শান্তিতে দিন কাটাতে লাগল।

শেরশাবাদিয়া লোককথা বা কিস্সা-কাহিনীর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ: উপরের শেরশাবাদিয়া কিস্সাটি মূলত মানুষকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা দৈনন্দিন জীবনের প্রতিচ্ছবি যেখানে ভাগ্য বুদ্ধি খুব পরিস্থিতির কাকতালীয় মিশ্রণ আছে। এখানে যে জোলা আসলেই গণকদার নয়, আকস্মিক ঘটনাকে কাজে লাগিয়ে কাকতালীয়ভাবে রাতারাতি সমাজে বিখ্যাত হয়ে ওঠে। স্ত্রী কর্তৃক রুটি বণ্টনের ঘটনায় তার বলা উক্তিটি লোকবিশ্বাসের মাধ্যমে অলৌকিক জ্ঞানের রূপ পায়, যা সমাজে গণকদার হওয়ার ভিত্তি তৈরি করে। আমাদের দেশে জোলাকে সাধারণত মূর্খ বা বোকা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। গোয়ালা বা ঘোষও তাই। শোনা যায় ষাট বছর বয়সে গোয়ালার বুদ্ধি হয় কিন্তু লোককথায় এরাই আবার এক উন্নত মর্যাদার অধিকারী। চরিত্রের এরূপ বৈপরীত্যের মধ্যে এক বিশেষ গুণ ও চমক আমাদের মুগ্ধ করে তাছাড়া একই ধরনের অতি সাধারণ নিরীহ দুঃখময় আর্থিক জীবনের পরিবর্তন আমাদের জীবনের গতিময়তা আর উন্নত ও সভ্য জগতের অনুগামী হয়েছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

এখানে এই কিসসা কাহিনীতে যে ধোপার গাধা চুরির ঘটনাও কাকতালীয় জ্ঞান ও লোকাচারের সাহায্যে সমাধান হয়, ফলে জোলায় খ্যাতি আরও বিস্তৃত হয়। রাজকন্যার হার চুরির ঘটনায় লোকবিশ্বাস, ভয় ও মানসিক চাপ কাহিনীর মোড় ঘুরিয়ে দেয়। “নিন আয়সেক” উচ্চারণের ভুল ব্যাখ্যা চোরের মনে ভয় সৃষ্টি করে এবং সে নিজেই সত্য প্রকাশ করে দেয়। এই কাহিনীর মাধ্যমে শেরশাবাদিয়া সমাজের লোকবিশ্বাস, গণকদারি সংস্কৃতি, ভাগ্যনির্ভরতা ও সাধারণ মানুষের আকস্মিক সামাজিক উত্তরণের চিত্র ফুটে ওঠে। একই সঙ্গে এতে ক্ষমতা ও আতঙ্কের সম্পর্ক, ধর্মীয় আচার ও সামাজিক মনস্তত্ত্বের প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। হাস্যরসের আড়ালে কাহিনিটি মানুষ ও সমাজের বিশ্বাসপ্রবণতাকে সূক্ষ্ম ব্যঙ্গের মাধ্যমে তুলে ধরে, যা শেরশাবাদিয়া লোককথার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।

এছাড়াও শেরশাবাদিয়া কিস্সা-কাহিনি জোলাকে নিয়ে আরও অনেক তৈরি হয়েছে। যেমন কিছু লোককথা প্রচলিত আছে, হাটে গিয়ে কদমাকে ঘোড়ার ডিম মনে করে কেনা, পাগলা হাতিকে বিষ খাইয়ে মেরে রাজার কাছে বীর বলে পরিচিতি। বনের বাঘ মাঠে ঢুকে গ্রামের রাখাল ও চাষীদের খেয়ে ফেলে। রাজা ওই বীর

জোনাকে পাঠাল বাঘ মারতে। হাতে তরবারি নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ল। সন্ধ্যার পর বাঘের সঙ্গে তার দেখা। ভয়ে গাছে ওঠে সে কাঁপতে লাগল। গাছের নীচে বাঘ হঠাৎ হাত থেকে তরবারি খসে পড়ল একেবারে বাঘের গলায়। বাঘ মারা পড়ল। মৃত বাঘের কান কেটে জোলা নিয়ে এল রাজদরবারে। রাজা খুব খুশি। জোলার বীরত্ব দেখে রাজা তার একমাত্র সুন্দরী রাজকন্যার সঙ্গে তার বিয়ে দিল। জোলা রাজকন্যাকে নিয়ে সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে লাগল।

শেরশাবাদিয়া লোককথা বা কিস্সা-কাহিনীর নীতিকথা: ভাগ্য, বুদ্ধি ও পরিস্থিতিকে সঠিক কাজে লাগালে, মানুষের খারাপ অবস্থা পরিবর্তন হয়, আসে সফলতা ও সম্মান।

শেরশাবাদিয়া লোককথা বা কিস্সা-কাহিনী-৫:

নীলাসমান:

অ্যাকখান দ্যাশ আছিল, সেই দ্যাশে এক রাজা বাস করত দুই রানী লিয়া। বড় রানীটার নাম বোড়কি আর ছোট রানীটার নাম ছোটকি। রাজা ছয় মাসের লাইগা শিকারে বাহার হইয়া গেল। রাজা ছোটকিকে খুব পিয়ার করতো, এই দেইখা বোড়কির বুকের ভিতর আগুন জ্বলত। বোড়কি একদিন মিথ্যা কথা বানাইয়া লিখল যে ছোটকি চরিত্রহীন আর কলঙ্কিনী। সেই খাত বোড়কি এক সিপাহির হাতে দিয়া বনে রাজার কাছে পাঠাইল। চিঠি পড়হা রাজা বেজাই গোসাঁ করলো। সে সিপাহিকে হুকুম দিল, ছোটকিকে বনে লিয়া গিয়া জাল্লাদ দিয়া তার হাত কাইট্যা ফেলবি। রাজার দেওয়ান ছোটকিকে নিজের মাইয়া মতো পিয়ার করতোক। বনবাসে যাওয়ার সময় দেওয়ান ছোটকির হাতে দুইটা খুব দামী হীরে-খোঁচিৎ অলংকার দিল। জল্লাদের কাছে একখানা লাল দিয়া নিজের জান বাঁচাইল আর আরেকখানা ছোটকি নিজের খরচের লাইগা রাখল। ছোটকি তখন পুঁয়াতি আছিল। বনের ভিতরেই তার দুইটা পুত জন্ম নিল; নাম তুইলো নীল আর আসমান। রাইত-দিনে দুই ভাই বড় হইতে লাগল। এক বছরেই দশ বছরের মতো হইয়া গেল। একদিন দুই ভাইয়ের মনে হইল; বনের মাঝখানে একখানা নগর পাতব। তারা মন্টু আর বন্টুকে ব্যাগাততা কইরলো। মন্টু-বন্টু বনের ভিতর নগর বানাইয়া দিল। তারা নীল-আসমানকে আশি মনের পুত্তি আর চুরাশি মনের ডান্ডা বানাইয়া দিল। খেলাধুলায় দুই ভাইয়ের সঙ্গে আর কেউ পাইরা উঠতো না। খেলা করত করতে করতে দুই ভাই দূর-দূর দ্যাশে ঘুইরা পড়ল। মা ছোটকি দক্ষিণ কোণে যাইতে মানা করছিল, কিন্তু তারা শোনে নাই। এক দেশে গিয়া ছোট ভাই আসমানের খুব ভোক লাগলো আর তিস্সা ম্যালাই লাগল। বড় ভাই নীল ঘোড়া গাছে বাইক্কা দিয়া পানি-খাবার আনতে বাহির হইল। সেই ফাঁকে বড় ভাই আরেক দেশে গিয়া বিহা কইরা ফেলল, আর ছোট ভাইয়ের কথা একখিবারে ভুইলা গেলো। এইদিকে নীল-আসমানের বাপের জাহাজ সমুদ্রের এক চরে আটকাইয়া গেল। নরবলি না দিলে জাহাজ নড়ে না। আসমান এক গাছের তলায় ঘুমাইয়া আছিল। পাশের গাছে ঘোড়া বাঁধা আছিল। রাজ্যের চারজন সিপাহি ভাবল- ঘোড়াচোর। তারা আসমানকে ধইরা নরবলি দিতে লিয়া গ্যালো। শহরে ঢোল-ঢাক পিটাইয়া ঘোষণা দিলো, সকাল দশটায় ঘোড়াচোরের বলি দেওয়া হৈবে। ঠিক সময়ে বড় ভাই নীল হাজির হইল। সে যুদ্ধ কইরা ছোট ভাই আসমানকে উদ্ধার কইরা মায়ের কাছে লিয়া আইল। এরপর তার বাপু আর বোড়কির অবস্থা দিন দিন খারাপ হইতে লাগল। তারা কাজের লাইগা ছুটোছুটি করত। শেষে তারা ছোট রানীর বাড়িতেই কাজ পাইয়া গেলো। অনেক দিন পরে সবাইর পরিচয় হইলো। সব সত্য বের হইলো। রাজা নিজের ভুল বুইঝা অনুতপ্ত হইয়া পসতাইতে লগলো, সকলে মিলে একসঙ্গে সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে লাগল। নীল হল রাজা আর দেওয়ান হল মন্ত্রী।

শেরশাবাদিয়া লোককথা বা কিস্সা-কাহিনীর বাংলা অনুবাদ: কোন এক দেশে, এক রাজা বসবাস করতেন দু-রানী নিয়ে, বড় রানী যাকে বোড়কি আর ছোট রানীকে ছোটকি বলতো। রাজা ছয় মাসের জন্য শিকারে বের হয়। রাজা ছোট রানীকে ভালবাসত বলে ছোট রানীর ওপর বড় রানীর খুব হিংসা। ছোট রানী একজন দুশ্চরিত্রা ও কলোঙ্কিনী এই বলে একটা অভিযোগপত্র লিখে বড় রানীকে নিয়ে আর সেই পত্র সিপাহিকে দিয়ে পাঠাল বনে রাজার কাছে। রাজা সিপাহিকে আদেশ দিল রানিকে বনবাসে নিয়ে গিয়ে জল্লাদ দিয়ে হাত কেটে ফেলতে। রাজার দেওয়ান ছোট রানীকে মেয়ের মত ভালবাসতেন। বনবাস যাওয়ার সময় তিনি ছোট রানীর হাতে অতি মূল্যবান দুটো হীরে খোঁচি তো অলংকার লাল দিলেন তার মধ্যে একটা লাল জল্লাদকে দিয়ে নিজের প্রাণরক্ষা করলেন আর অন্যটা নিজের খরচের জন্য ছোটকি রেখে দিলেন। গর্ভবতী ছিলেন, বনে ছোট রানীর দু ছেলের জন্ম হয়। তাদের নাম নীল ও আসমান। দু-ভাই দিনে রাতে বাড়ে। এক বছরেই দশ বছরের সমান হল। তাদের ইচ্ছা হল বনে নগর পত্তন করবে। তারা মোন্টু আর ঝোন্টুকে অনুরোধ করলে সেখানে নগর স্থাপন হল। মোন্টু ও ঝোন্টু তারা দু-ভাইকে আশিমনের পুত্তি ও চুরাশি মনের ডান্ডা বা লাঠি তৈরি করে দিলেন। খেলাধুলায় দু-ভায়ের সঙ্গে কেউ পারে না। খেলা করতে করতে দু-ভাই দূর দেশ পর্যন্ত চলে গেল। ওদের মা দক্ষিণ কোণে যেতে বারণ করল। কোন এক দেশে ছোট ভাইয়ের ক্ষিধা ও পিপাসা পেয়েছে। বড় ভাই ঘোড়াকে বেঁধে জল ও খাবার আনতে বেরিয়ে পড়ল। এদিকে বড় ভাই অন্য একদেশে বিয়ে করে ছোট ভাইয়ের কথা সম্পূর্ণ ভুলে গেল। নীল ও আসমানের বাবার জাহাজ সমুদ্রের একটা চরে ঠেকেছিল। নরবলি না দিলে জাহাজ চলবে না। নীল গাছের তলায় ঘুমিয়ে ছিল, পাশে গাছে বাঁধা ঘোড়াকে দেখতে পেয়ে ঘোড়াচোর বলে রাজার চারজন সিপাহি তাকে ধরে নিয়ে গেল নরবলি দিতে। শহরে ঢোল ঢাক পিটিয়ে ঘোষণা করা হলো, সকাল দশটায় ঘোড়াচোরকে বলি দেওয়া হবে। সময়মত তার বড় ভাই নীল এসে হাজির। শেষে ছোট ভাই আসমানকে উদ্ধার করে নিয়ে গেল মায়ের কাছে। তার বাবা ও বড় রানীর অবস্থা দিন দিন মন্দের দিকে যেতে লাগল। কাজের জন্য ছুটে বেড়ায়। তারা ছোট রানীর বাড়িতে কাজ পেল। বছরদিন পরে পরিচয় প্রকাশ পেলে সত্য সামনে এলো। রাজা নিজের ভুল বুঝে অনুতপ্ত হলেন, সকলে মিলে একসঙ্গে সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে লাগল। নীল হল রাজা আর দেওয়ান হল মন্ত্রী।

শেরশাবাদিয়া লোককথা বা কিস্সা-কাহিনীর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ: এই শেরশাবাদিয়া লোকো-কাহিনীতে বড় রানির ইর্ষা (jealousy), ষড়যন্ত্র (conspiracy) ও রাজার অবিশ্বাস (disbelief), যাচাই-বাছাই না করে জল্লাদের মাধ্যমে বনবাস ও হত্যার আদেশ, যারা আমরা শ্রোতা (audience) তাদের কাছে অসহনীয় হলেও কাহিনীর অগ্রগতিতে দৈবিক কৃপায় জাস্টিসের পথে গেলে, ছোট রানী রক্ষা পায়। বনে ছেলের জন্ম, লাঠি-পুত্তি খেলা, বিশ্বকর্মা ও তার ছেলে কর্তৃক নগর পত্তন তৎকালীন সমাজচিত্রের অনুসারী। এইধরনের বহু ঘটনা মঙ্গলকাব্যেও বর্তমান। লোকসংস্কার ও লোকবিশ্বাস অনুযায়ী দৈবকৃপা আর ভাগ্যকে স্বীকার করা হয়েছে। রাজা ও বড় রানী নিজেদের দুষ্কর্মের ফলভোগের পর পুনরায় সুখ ও শান্তি প্রাপ্তির ধারা আধুনিক ছোটগল্প, উপন্যাস আর লোকসাহিত্যের (folk literature) ইঙ্গিতবাহী। দেশের রাজার বিনা তদন্তে লোকের কথা বিশ্বাস (blind faith) করে যে বিচার দিয়েছে আসলে রাজকীয় বিচার ব্যবস্থার দুর্বল থাকে উদ্ঘাটন করে। জল্লাদের মাধ্যমে বনবাস ও কেটে ফেলার আদেশ শ্রোতার কাছে দুঃখজনক ও condemnable হলেও ভাগ্যচক্রে দেওয়ানের সহায়তায় ছোট রানীর রক্ষা পাওয়া লোকবিশ্বাসে প্রচলিত divine grace ও destiny-র ধারণাকে শক্তিশালী করে। বনে সন্তানের জন্ম, লাঠি-পুত্তি খেলা, বিশ্বকর্মা ও তার পুত্রের দ্বারা নগর প্রতিষ্ঠা, এসব ঘটনা social imagination ও folk realism, এর সঙ্গে যুক্ত। মঙ্গলকাব্যের মতো এখানেও moral justice কাজ করে, যেখানে দুষ্কর্মের ফল হিসেবে রাজা ও বড় রানী শাস্তি পায় এবং পরিণামে সুখ-দুঃখের চক্র সম্পূর্ণ হয়। তাই বলা যায়, এই

narrative structure আধুনিক short story, novel ও folk drama-র পূর্বাভাস বহন করে, আগেকার বিচার ব্যবস্থা ও পাওয়ার মেকানিজম- কিভাবে কাজ করে তারই জ্বলন্ত ধরনের হিসেবে দাঁড়িয়েছে।

শেরশাবাদিয়া লোককথা বা কিস্সা-কাহিনীর নীতিকথা: অন্যায়, হিংসা ও অন্ধবিশ্বাসের খারাপ পরিণতি অবসম্ভবী।

উপসংহার:

শেরশাবাদিয়া সমাজে প্রচলিত লোককথা বা কিস্সা-কাহিনীগুলি শুধুমাত্র entertainment বা বিনোদনের জন্য নয় বরং ওই সম্প্রদায়ের ইতিহাস, সামাজিক বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির আধারের এক জীবন্ত দস্তাবেজ। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে oral transmission বা মৌখিকভাবে ছড়িয়ে পড়া কিস্সা-কাহিনীগুলো মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সাহসিকতা, ভয়, কুসংস্কারের জন্য, বিভিন্ন পাহাড়সম সমস্যা সমাধান ইত্যাদির খন্ড চিত্র ফোক উইসডামের মাধ্যমে তার বহুমাত্রিক প্রকাশ ঘটেছে। এগুলোতে সমাজের বিশ্বাস, ভীতি, আনন্দ এবং মানবিক দুর্বলতার পাশাপাশি রসবোধ ও হাস্যরসও মিশ্রিত রয়েছে।

প্রথম কিস্সা-কাহিনী ‘ফুস্ পাদড়ি ও ভুঁক্ পাদড়ি’ মূলত মানবিক দুর্বলতা, সামাজিক লজ্জা এবং পরিবারের অভ্যন্তরীণ সম্পর্কের গভীরতা প্রকাশ করে। যদিও কিস্সা-কাহিনী প্রথম দর্শনে হাস্যকর বা অশালীন মনে হতে পারে, তবুও এর আড়ালে রয়েছে সমাজের মূল্যবোধ এবং নৈতিক শিক্ষা। কিস্সা-কাহিনীটি দেখায় যে ছোট ছোট ক্রটি ও দৈহিক সীমাবদ্ধতাকে উপেক্ষা করে মানুষের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য, ধৈর্য ও সহনশীলতার মান গ্রহণ করা উচিত। এছাড়া এটি প্রমাণ করে যে পরিচিত সমস্যার তুলনায় অজানা বিপদ কখনো বেশি ক্ষতিকর হতে পারে। দ্বিতীয় কাহিনী ‘বাগ-বুড়িহি’ এবং তৃতীয় কাহিনী ‘নাতি, বুড়িহি, ডাইনি ও পিঠার গাছ’ মানব বুদ্ধি ও কৌশলের মাধ্যমে বিপদ মোকাবেলার দৃষ্টান্ত দেয়। এখানে দেখা যায়, শক্তিশালী ও হিংস্র প্রাণী যেমন বাঘ বা ডাইনি মানুষের বুদ্ধি ও সতর্কতার কাছে পরাজিত হতে বাধ্য হয়। এই কাহিনীগুলো সমাজে বুদ্ধি, সতর্কতা এবং সহযোগিতার মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করে। বয়স্ক ও শিশুদের অভিজ্ঞতা এবং প্রজ্ঞা কাহিনীর মূল ভিত্তি হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে, যা সমাজের নৈতিক কাঠামো ও সতর্কতা প্রদর্শনের একটি শক্তিশালী মাধ্যম। চতুর্থ কাহিনী ‘গনক জোলাহ-র নিন্’ ভাগ্য, কাকতালীয় ঘটনাবলী এবং সাধারণ মানুষের প্রতিক্রিয়ার সংমিশ্রণ প্রদর্শন করে। জোলাহর চরিত্রে দেখা যায় যে সাধারণ মানুষও পরিস্থিতি অনুযায়ী বুদ্ধি ও সাহস প্রদর্শন করে সমাজে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অর্জন করতে পারে। লোকবিশ্বাস ও আধ্যাত্মিক উপাদান যেমন ‘নিন্ আয়সেক’ উচ্চারণের মাধ্যমে গল্পে অলৌকিকতা ও প্রজ্ঞা মিশ্রিত হয়েছে। এটি শেরশাবাদিয়া সমাজে ভাগ্য, বিশ্বাস ও সামাজিক উত্তরণের মধ্যে সম্পর্কের চিত্র ফুটিয়ে তোলে। পঞ্চম কাহিনী ‘নীলাসমান’ শিশুদের দ্রুত বয়স বৃদ্ধির গল্পের মাধ্যমে সাহস, উদ্যোগ ও ক্ষমতার গুরুত্ব নির্দেশ করে। এখানে কল্পনাসঞ্চার ও অতিপ্রাকৃত উপাদান সমাজের নৈতিক ও শিক্ষামূলক দিককে শক্তিশালী করে। কাহিনীটি দেখায় যে, সঠিক পরিকল্পনা, সতর্কতা ও পরিবেশের সঠিক ব্যবহার মানুষের জীবনে সাফল্য এবং সামাজিক মর্যাদা অর্জনে সহায়ক। শেরশাবাদিয়া কিস্সা-কাহিনীগুলিতে দেখা যায় যে মানুষের দৈহিক দুর্বলতা, ভয় বা সামাজিক সীমাবদ্ধতা থাকলেও বুদ্ধি, সাহস, সতর্কতা এবং মানবিক সহযোগিতা মানুষের উপর অশুভ শক্তির প্রভাবকে প্রতিহত করতে পারে। গ্রামীণ জীবনের বাস্তবতা, নদী, বন, পশু-পাখি এবং দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত প্রতীক ও রূপক কাহিনীগুলিতে গভীরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এগুলো শুধু রম্য বা বিনোদনমূলক নয়, বরং সমাজের নৈতিক শিক্ষা, আত্মরক্ষা, এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের ধারণা প্রজন্মান্তরে বহন করে। শেরশাবাদিয়া কিস্সা-কাহিনী ও লোককথাগুলোর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, এগুলো মানুষের আধ্যাত্মিক বিশ্বাস, প্রাকৃতিক সচেতনতা এবং সাংস্কৃতিক অভ্যাস সংরক্ষণে ভূমিকা রাখে। লোককথার মাধ্যমে শিশুদের সতর্কতা, বুদ্ধি ও নৈতিক শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে।

এছাড়া সমাজের অভ্যন্তরীণ সম্পর্ক, পরিবার ও সম্প্রদায়ের বন্ধন এবং সামাজিক নৈতিকতার ধারণাও এগুলোর মাধ্যমে প্রজন্মান্তরে প্রতিফলিত হয়েছে। উপরন্তু, কিস্সা-কাহিনী ও লোককথাগুলোতে হাস্যরস, ব্যঙ্গাত্মক উপাদান এবং অতিশয়করণ ব্যবহার করে সমাজের ভঙ্গি, অজানা ভয় এবং মানুষের সীমাবদ্ধতা তুলে ধরা হয়েছে। এগুলো মানুষের মানসিক ও সামাজিক চেতনা উজ্জীবিত করে, যা কেবল বিনোদন নয় বরং চিন্তাশীল ও শিক্ষামূলকও। সর্বশেষে বলা যায়, শেরশাবাদিয়া কিস্সা-কাহিনী ও লোককথা সমাজের ইতিহাস, নৈতিক শিক্ষা, বিশ্বাস, সাহসিকতা, বুদ্ধি এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের এক সমৃদ্ধ ভাণ্ডার। এগুলো প্রজন্মান্তরে সংরক্ষিত একটি জীবন্ত ইতিহাস হিসেবে কাজ করে, যা ভবিষ্যৎ গবেষক, সমাজবিজ্ঞানী, লোকসাহিত্য-অনুরাগী এবং পাঠকদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। এই সংকলনের মাধ্যমে শেরশাবাদিয়া সমাজের লোকসংস্কৃতি, দৈনন্দিন জীবন, নৈতিক কাঠামো এবং সামাজিক মূল্যবোধকে অনন্যভাবে তুলে ধরা সম্ভব হয়েছে।

তথ্যসূত্র:

১. অহাব, আব্দুল। শেরশাবাদ ও শেরশা বাদিয়া। ২য় প্রকাশ, শেরশাবাদিয়া বিকাশ পরিষদ, জুলাই ২০২১।
২. আহম্মদ, মৌলভী সেখ ইদ্রিস। বঙ্গদেশের সরল সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। ইস্টবেঙ্গল পাবলিশিং হাউস, ১৯২০।
৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখাল দাস। বাংলার ইতিহাস: দ্বিতীয় ভাগ। দেশ পাবলিশিং, ১৩২৪ বঙ্গাব্দ।
৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, পাঁচকড়ি। আইন-ই-আকবরী ও আকবরের জীবনী। ২য় সংস্করণ, দে বুক স্টোর্স, ১৪০১ বঙ্গাব্দ।
৫. ভট্টাচার্য, মলয় শংকর। মালদহ চর্চা। বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা মঞ্চ, জানুয়ারি ২০১১।
৬. হান্টার, ডব্লিউ ডব্লিউ। স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যাকাউন্ট অব দ্য ডিস্ট্রিক্ট মালদাহ। ট্রুবনার অ্যান্ড কো., ১৮৭৬।
৭. Cartar, M. O. Settlement Report. Calcutta: Government Press.
৮. ল্যামবোর্ন, জি. ই। বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার্স: মালদা। এন. এল. পাবলিশার্স, ১৮৯৫/১৯১৮।
৯. সামাদ, আব্দুস। বাদিয়া বার্তা। ৩২ বর্ষপূর্তি সংখ্যা, এপ্রিল ২০১১, বাদিয়া বার্তা প্রকাশনী।
১০. সামাদ, আব্দুস। শেরশাবাদিয়াদের কথালেখ্য। ১৬ই আগস্ট ২০০৩, বাদিয়া বার্তা প্রকাশনা।

ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার/মৌখিক তথ্য:

১. বাসেদ, আব্দুল। ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার/মৌখিক তথ্য। তালগাছি, হরিশ্চন্দ্রপুর, মালদা পশ্চিমবঙ্গ।
২. বিবি, আবেদা। ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার/মৌখিক তথ্য। তালগাছি, হরিশ্চন্দ্রপুর, মালদা পশ্চিমবঙ্গ।
৩. সাবিনা ইয়াসমিন। ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার/মৌখিক তথ্য। বালুয়াঘাট, হরিশ্চন্দ্রপুর, মালদা, পশ্চিমবঙ্গ।
৪. রহমান মতিউর। ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার/মৌখিক তথ্য। বালুয়াঘাট, হরিশ্চন্দ্রপুর, মালদা, পশ্চিমবঙ্গ।



রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন: সাহিত্যে নারীমুক্তি ভাবনা

রোকেয়া পারভীন, রাজ্য সাহায্য প্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক-১, বাংলা বিভাগ, সামসি কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 25.12.2025; Accepted: 31.01.2026; Available online: 28.02.2026

©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

Abstract

Rokeya Sakhawat Hossain's name is permanently inscribed in golden letters in the history of Bengali literature and the narrative of the Bengali people's modern awakening. Her invaluable literary creations, efforts in spreading education, and work for social reform helped the Bengali nation attain fulfillment in many ways. At the core of her social and literary pursuits lay a steadfast commitment to women's liberation and awakening.

She was born into a backward Muslim society in Bengal, and the plight of women within that society deeply disturbed her. With the aim of remedying their miserable condition, she not only took up the pen but also actively engaged in building institutional and social frameworks. However, it would not be entirely accurate to say that her efforts were confined only to Muslim women; transcending religion, caste, and community, she dedicated her entire life and body of work to the liberation of all Bengali women.

Keywords: Women's Liberation, Social Reform, Feminist Thought, Educational Empowerment, Bengali Modernity

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের নাম বাংলা সাহিত্য ও বাঙালির আধুনিক উত্তরণের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে চিরস্থাবীভাবে লেখা আছে। বাঙালি জাতিকে নানাভাবে পূর্ণতা পেতে সাহায্য করেছে তাঁর অমূল্য সাহিত্য সৃষ্টি, শিক্ষাবিস্তার ও সমাজসংস্কার কাজ। তাঁর সামাজিক- সাহিত্যিক কর্ম সাধনার কেন্দ্রবিন্দু ছিল নারীমুক্তি ও জাগরণের ব্রত। তিনি বাঙলার পশ্চাৎপদ মুসলমান সমাজে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সেই পশ্চাৎপদ মুসলমান সমাজের নারীদের দুর্দশা তাঁকে বিচলিত করেছিল। তার দুরবস্থার প্রতিকারের উদ্দেশ্যেই একদিকে তিনি যেমন কলম হাতে তুলেছিলেন, তেমনি প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক গঠন কর্মেও হাত লাগিয়েছিলেন। তবে শুধু মুসলিম নারীদের জন্য বলা পুরোপুরি সত্য হবে না, তিনি ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায় নির্বিশেষে সমস্ত বাঙালি নারীর মুক্তি সাধনায় উৎসর্গ করেছেন তাঁর জীবন ও সমগ্র কর্ম প্রবাহকে।

বর্তমান সময়ে তাঁকে 'বেগম রোকেয়া' নামেই সবাই চেনে। তাঁর সমকালে তিনি 'মিসেস আর. এস. হোসেন' নামেই পরিচিত ছিলেন। এই নামেই তিনি লেখালেখি বা সাহিত্য চর্চা করেছেন। তাঁর পারিবারিক নাম ছিল রোকেয়া খাতুন। ১৮৮০ খ্রীঃ বর্তমান বাংলাদেশের রংপুর জেলার মিঠাপুর থানার অন্তর্গত পায়রাবন্দ গ্রামে এক জমিদার পরিবারে তাঁর জন্ম। যদিও রোকেয়ার জন্মের সময় জমিদারির জৌলুসে অনেকটা ভাটা পড়ে গিয়েছিল। রোকেয়ার বাবার নাম জহিরুদ্দিন মুহম্মদ আবু আলী হায়দার সাবের ও

মায়ের নাম রাহাতুল্লেসা। রোকেয়ার মা ছাড়াও আবু আলী সাবেরের আরো তিন স্ত্রী ছিলেন। রাহাতুল্লেসার গর্ভে ইব্রাহিম সাবের, খলিল সাবের, করিমুল্লেসা, রোকেয়া ও হোমায়রা জন্মগ্রহণ করেন। রোকেয়ার শৈশব কেটেছে কঠোর পর্দা বা অবরোধের মধ্যে। মেয়েদের লেখাপড়া শেখার সুযোগ একেবারে ছিল না বললেই চলে। সেই সময় মুসলমান পরিবারে স্ত্রীশিক্ষা বলতে টিয়া পাখির মতন কোরাণ শরীফ পাঠ, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান বিষয়ে জ্ঞান, রান্না, সেলাই বড়জোর দু-একটি উর্দু ফার্সি পুঁথি পড়া। এমনকি বাঙালি মুসলমান পুরুষরাও তৎকালে উর্দু ভাষায় কথা বলাকেই আভিজাত্য মনে করত। এমত অবস্থায় মেয়েদের জন্য বাংলা শেখা তো ছিল হারাম (নিষেধ)। রোকেয়ার বড়বোন করিমুল্লেসার বাল্যকালে বাংলা বই পড়ার প্রতি ভীষণ আগ্রহ ছিল। করিমুল্লেসা ছোট ভাইয়ের বাংলা পড়া শুনে শুনে তা মুখস্ত করতেন। মাটিতে আঁক কেটে কেটে বাংলা লিখতেও শিখেছিলেন। আবু আলী সাবেরের জমিদারসুলভ নানা দোষ থাকলেও, বিদ্যার প্রতি অনুরাগী ছিলেন। দুই পুত্র ইব্রাহিম সাবের ও খলিল সাবেরকে তিনি কোলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি করেছিলেন। কিন্তু মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে সমাজের প্রচলিত মতেরই অনুসারী ছিলেন।

রোকেয়ার শৈশব জীবন শুরু হয়েছিল দিদি করিমুল্লেসার কাছে। তাঁর কাছে বাংলা বর্ণপরিচয় শিখেছিলেন। দিদি করিমুল্লেসার আগ্রহ ও দাদা ইব্রাহিম সাবেরের উৎসাহ ও সহায়তায় পিতৃগৃহেই রোকেয়ার বিদ্যাচর্চার সূত্রপাত। এই দাদাই বোনকে ছবির বই, ইংরেজি বই, বাংলা বই এনে দিতেন। বোন সেই বইগুলো আগ্রহ ভরে লুকিয়ে লুকিয়ে পড়তেন। শুধু তাই নয়, দেশ-বিদেশের শিক্ষিত মেয়েদের গল্প তাদের কঠিন পরিশ্রম করে উন্নত হওয়ার কথাও শুনাতেন। রোকেয়ার মধ্যে জ্ঞানের তৃষ্ণা ও সমাজ মনস্কতা তৈরির পেছনে দাদা ইব্রাহিম সাবেরের অবদান অনেক। শামশুন নাহার মাহমুদ অন্তরঙ্গ চিত্রের বর্ণনা দিয়েছেন-

“পিতা বাংলা বা ইংরেজি শিক্ষার ঘোর বিরোধী। দিনের বেলা সকল সময় পড়াশোনার সুযোগ হয় না। ভ্রাতা-ভগ্নি অপেক্ষায় থাকেন কখন দিন গিয়া রাত্রি আসিবে। খাওয়া-দাওয়ার পর পিতা শুইতে গেলে দুই ভাই-বোনে বসেন পুঁথিপত্র লইয়া। গভীর রাতে পৃথিবী অন্ধকারে ঢাকিয়া যায় আর সেই সঙ্গে জ্বলিয়া উঠে দুটি কিশোর-কিশোরীর শয়নকক্ষে স্থিমিত দীপশিখা। চোখ মুছিয়া সেই নীরব নিশীথে দুই ভাই-বোনে মোমবাতির পাশে বসেন। জ্ঞান দান করেন ভাই আর বালিকা ভগ্নী সেই জ্ঞানসুধা আকর্ষণ পান করেন।”^২

রোকেয়ার বিদ্যাচর্চার দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু হয় বিয়ের পর। মাত্র ষোল বছর বয়সে বিয়ে হয় বিহারের ভাগলপুর অধিবাসী বিপ্লবীক উর্দুভাষী সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনের সঙ্গে। তিনি ছিলেন উচ্চশিক্ষিত, স্পষ্টবাদী, তেজস্বী, আত্মমর্যাদাসম্পন্ন, কুসংস্কারমুক্ত উদার ও শিক্ষানুরাগী মানুষ। তিনি পেশায় ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। ফলে এই রকম একজন মানুষের সংস্পর্শে এসে রোকেয়ার বিদ্যাচর্চা নতুনভাবে নতুন উদ্যমে শুরু হয়। স্ত্রীর শিক্ষার পথে তিনি তো বাধা ছিলেন না বরং স্ত্রীর মধ্যে যে বিরাট সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে তার বিকাশে সহায়তা করা তাঁরই কর্তব্য, এটা তিনি গভীরভাবে অনুভব করেছিলেন। ডেপুটি সাহেব হওয়ায় বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে যে সমস্ত ইংরেজি চিঠিপত্র পেতেন, প্রায় সবগুলি চিঠি রোকেয়াকে পড়াতেন এবং চিঠির উত্তর নিজে Dictate করে তাঁকে দিয়ে লেখাতেন। স্বামী সাখাওয়াত হোসেনের সান্নিধ্যে ও উৎসাহে তাঁর সাহিত্যচর্চা, লেখায় হাতে খড়ি এবং সফলতাও। রোকেয়া তা নিজেও স্বীকার করেছেন,-

“আমার শ্রদ্ধেয় স্বামী অনুকূল না হইলে আমি কখনোই প্রকাশ্যে সংবাদপত্রে লিখিতে সাহসী হইতাম না।”^৩

রোকেয়ার দাম্পত্য জীবন ছিল মাত্র ১৩ বছরের। স্বামীর জীবদ্দশাতেই প্রধান প্রধান গ্রন্থগুলি রচিত হয়। এমনকি রোকেয়ার কৃতিত্বে যে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুল তৈরি হয়, সেটাও সাখাওয়াত হোসেনেরই

পরিকল্পনা। পরিকল্পিত বালিকা বিদ্যালয়টির জন্য তিনি দশ হাজার টাকাও রেখে যান। রোকেয়ার রোকেয়া হয়ে ওঠার পেছনে দাদা ইব্রাহিম, দিদি করিমুন্নেসা ও স্বামী সাখাওয়াত হোসেনের ভূমিকা অনেকটা অংশ জুড়ে রয়েছে। তিনি নিজেও বার বার সেটার সক্রিয় উল্লেখ করেছেন।

রোকেয়ার একমাত্র লক্ষ্য ছিল নারীমুক্তি। সে সময় তিনি ভালোভাবে বুঝে ছিলেন যে, নারীকে তার নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে মুক্তি অর্জন করতে হবে। আর শিক্ষাই হলো তার স্বনির্ভরতার চাবিকাঠি। স্বভাবতই তাঁর প্রতিটি রচনার মধ্যে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে নারীমুক্তি, সমানাধিকার ও প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনা প্রতিফলিত হয়েছে। বাঙালি মুসলিম সমাজে সমাজ সংস্কারক ও লেখক-চিন্তক পাশাপাশি এই দুই ভূমিকায় সমান সফলতার পরিচয় রোকেয়া ছাড়া আর তেমন কাউকে খুঁজে পাওয়া যায় না। রোকেয়ার সাহিত্যচর্চা শুরু করার আগেই মীর মোশারফের ‘জমিদার দর্পণ’, ‘বিষাদ সিন্ধু’, ‘উদাসীন পথিকের মনের কথা’, ‘গাজী মিয়াবস্তানী’র মত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়ে গেছে। তাঁর সম সময়ে সেখ আবদুর রহিম, মোজাম্মেল হক, মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, সৈয়দ ইসমাইল প্রমুখ বিশিষ্ট লেখকগণ সাহিত্যচর্চায় রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে কোন কোন লেখক তাঁদের লেখায় মুসলমান সমাজের নানা কুসংস্কার জড়তাকে কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করেছেন। এমনকি নারীর অবরোধমুক্তি ও তাদের শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনীয়তার কথাও উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তাঁরা কেউ রোকেয়ার মতো করে সেই বিষয়গুলি অনুধাবন করে উপস্থাপন করতে পারেননি। একজন নারীর অবস্থান একজন নারী যেভাবে বুঝতে পারবে, তা বোঝা একজন পুরুষের পক্ষে সম্ভব নয়। পুরুষের দৃষ্টিতে পুরুষের কলমে রচিত হয়েছে তাঁর কর্মজগৎ, প্রেমের জগৎ, আনন্দ-বিষাদের জগৎ, হয়তো বা সে সব জগৎ গড়া হয়েছে পুরুষের সুবিধাবাদের বিধিনিষেধ দিয়েই। মেয়েরা কি নিজের কলমে লিখে রেখেছে নিজেদের অনুক্রমিক ইতিহাস? তাই অন্দের এই ইতিহাস লেখার জন্য অবরোধ ঘোমটার আড়াল থেকে সাহিত্যিকের কলম হাতে তুলে নিয়েছিলেন রোকেয়া।

রোকেয়ার মোট গ্রন্থের সংখ্যা প্রকাশ কাল অনুযায়ী এইগুলি হল যথাক্রমে মতিচূর (প্রথম খন্ড), সুলতানাজ ড্রিম, মতিচূর (দ্বিতীয় খন্ড), পদ্মরাগ, অবরোধবাসিনী। এইগুলো ছাড়াও পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর আরও কিছু প্রবন্ধ, নকশাজাতীয় রচনা ও কয়েকটি কবিতা বাংলা একাডেমি প্রকাশিত ও আবদুল কাদির সম্পাদিত ‘রোকেয়ার রচনাবলী’তে স্থান পেয়েছে। এছাড়াও রয়েছে বিভিন্নজনকে লেখা রোকেয়ার বাংলা-ইংরেজি চিঠি-পত্র। তাঁর জীবন সাধনাকে বোঝার জন্য চিঠিগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম।

রোকেয়ার প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ ‘মতিচূর’ (প্রথম খন্ড)। এই গ্রন্থেই রয়েছে নারীজাতির দুরবস্থা ও অধিকার বিষয়ে সবচেয়ে বিতর্কিতমূলক প্রবন্ধ ‘স্ত্রীজাতির অবনতি’। ১৯০৩ সালে প্রবন্ধটি প্রথম ‘অলংকার না Badge of Slavery’ শিরোনামে গিরিশচন্দ্র সেন সম্পাদিত মাসিক ‘মহিলা’ পত্রিকায় পরপর তিন সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। নারীমুক্তি সম্পর্কিত ধারণাকে তিনি প্রথম এই প্রবন্ধেই তুলে ধরেন। পরবর্তী অন্যান্য রচনায় তাঁর এই মূল বক্তব্যেরই পুনরাবৃত্তি ও সম্প্রসারণ করেছেন। পরে ১৩১১ সালের ভাদ্র সংখ্যায় সৈয়দ একদাদ আলী সম্পাদিত ‘নবনূর’ পত্রিকায় ‘আমাদের অবনতি’ নামে পুনর্মুদ্রিত হয়।

সভ্যতার জন্মলগ্ন থেকেই স্ত্রীজাতির অবনতি লক্ষ্য করা যায়। নারীরা পুরুষের সহচারী বা সহধর্মিণী না হয়ে দাসী হয়েছে। এদের অক্ষম ও অকর্মণ্য ভেবে পুরুষজাতি এদের সাহায্য করতে থাকে। সাহায্য পেতে পেতে ক্রমে তারা আরও অকর্মণ্য হতে থাকে এবং অনুগ্রহ গ্রহণ করতে সংকোচবোধ করে না। প্রচলিত মনগড়া ধর্মের ব্যাখ্যা নারীজাতির উন্নতি ও প্রকৃত শিক্ষায় বাধা হয়েছে। রোকেয়া ধর্ম সম্পর্কিত অভিমত ব্যক্ত করে বলেছেন-

“আমাদিগকে প্রতারণা করিবার নিমিত্ত পুরুষগণ ঐ ধর্মগ্রন্থগুলিকে ‘ঈশ্বরের আদেশপত্র’ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। ধর্মগ্রন্থগুলি পুরুষ রচিত বিধি-ব্যবস্থা ভিন্ন আর কিছু নহে।”^৩

তাঁর মনে হয়েছে নারীদের উচিত নিজ হাতে নিজের উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত করা। তাই নারীদের জাগ্রত হতে হবে। সাংসারিক জীবনে পুরুষের পাশাপাশি চলার ইচ্ছা ও দৃঢ় সংকল্প আবশ্যিক। তারা যে গোলাম জাতি নয়, এই কথায় বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। নারীরা সমাজেরই অর্ধাঙ্গ। যেমন কোন মানুষের এক পা বেঁধে রাখলে সে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে কতদূর চলবে? পুরুষের স্বার্থ ও নারীদের স্বার্থ একই। যেমন একটি শিশুর জন্য বাবা-মা দুজনেরই সমান দরকার। নারীদের পুরুষের সমকক্ষ করে গড়ে তোলার জন্য রোকেয়া নারীদের শিক্ষা, অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী ও বিশেষ করে নারীদের চেষ্টার উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন। সে সময় এই দৃঢ় মনোভাব পোষণ করা কতটা সাহসিকতার পরিচায়ক, তা হয়তো আমরা এখন উপলব্ধি করতে পারব না। এমন সত্য তীক্ষ্ণ বাক্যবান সমকালীন সমাজ সহ্য করতে পারেনি বলেই প্রবন্ধটি এতটা বিতর্ক সৃষ্টি করেছিল।

“অর্দ্ধাঙ্গী” প্রবন্ধে লেখিকা স্ত্রীদের সম্পর্কে বিস্তারিত বলেছেন। ইংরেজিতে স্ত্রীকে পার্টনার বা বেটার হাফ বলে থাকে। আবার শাস্ত্রকারগণ পতি ও পত্নীকে একই শরীরের অঙ্গ স্বরূপ ভাবেও, সমাজ কি তা মনে করে? যদিও নারী ও পুরুষ উভয়েই একই বস্তুর অঙ্গ বিশেষ। একটা গাড়ির দুই চাকা। তাই একটিকে ছেড়ে অপরটি সম্পূর্ণ উন্নতি লাভ করতে পারে না।

কিন্তু সমাজে নারীদের মানসিক ও শারীরিকভাবে দমিয়ে রাখে। তারা নতমস্তকে বিশ্বাস করে ফেলে যে, তারা এসবে উপযুক্ত নয়। আবার শিক্ষা, উপার্জন যখন যেখানেই তারা নিজেদের প্রকাশ করতে উদ্যোগী হয়েছে, তখনই সমাজ কড়া হাতে তাদের নিরুৎসাহিত করেছে। কিন্তু নারী জীবনের এসব বাস্তব বাধার কথা যখন ভুলে যান সমালোচকেরা, তখন বলেন- মেয়েদের বুদ্ধিই নেই পুরুষের মতো। এমনকি রবীন্দ্রনাথও বলেন রাণী চন্দকে-

“হাজার হোক, এটা মানতেই হবে, পুরুষের ও মেয়েদের build সব দিক থেকেই আলাদা। পুরুষের brain, তার শক্তি ঢের বেশি মজবুত। ধর না কেন, আমি যদি আমার ন’দিদি হতুম, তবে কি এমনি আমার জায়গায় আমি উঠতে পারতুম? সংসারের বাধাবিল্ল ছেড়ে দে, তা না হলেও, মেয়েদের brain এতটা কাজ করতেই পারে না।”^৪

ভারতীয় সমাজ নারীকে আরাধ্য দেবতায় অসীন করলেও নারীকে তার প্রাপ্য সম্মান পুরুষ আজও কি দিতে পেরেছে? আদিকাল থেকেই সমাজে নারী-পুরুষের মধ্যে পার্থক্য থেকেই গেছে। সমাজ রামচন্দ্রকে আদর্শ স্বামী আর সীতাকে আদর্শ স্ত্রী বললেও, তা আমাদের চোখে এক প্রকার ছলনা ছাড়া কিছু নয়। তার কারণও প্রাবন্ধিক যুক্তি দিয়ে বলেছেন-

“সীতা রামচন্দ্রের অর্ধাঙ্গী রাণী, প্রণয়নী এবং সহচরী। আর রামচন্দ্র প্রেমিক, ধার্মিক-সবই। কিন্তু রাম সীতার প্রতি যে ব্যবহার করিয়াছেন, তাতে প্রকাশ পায় যে একটি পুতুলের সঙ্গে কোন বালকের যে সম্বন্ধ, সীতার সঙ্গে রামের সম্বন্ধও প্রায় সেইরূপ। বালক ইচ্ছা করিলে পুতুলকে প্রাণপণে ভালোবাসতে পারে; পুতুল হারাইলে বিরহে অধীর হইতে পারে; পুতুলের ভাবনায় অনিদ্রায় রজনী যাপন করিতে পারে; পুতুলটা যে ব্যক্তি চুরি করিয়েছিল, তাহার প্রতি খড়গহস্ত হইতে পারে; হারান পুতুল ফিরিয়া পাইলে আত্মদে আটখানা হইতে পারে; আবার বিনা কারণে রাগ করিয়াও পুতুলটা কাদায় ফেলে দিতে পারে- কিন্তু পুতুল বালকের কিছুই করিতে পারেনা, কারণ হস্তপদ থাকা সত্ত্বেও পৌত্তলিকা অচেতন পদার্থ ! বালক

তাহার পুতুল স্বেচ্ছায় অনলে উৎসর্গ করিতে পারে, পুতুল পুড়িয়া গেল দেখিয়া ভূমে লুটাইয়া ধূলি ধূসরিত হইয়া উচ্চস্বরে কাঁদিতে পারে!! রামচন্দ্র স্বামীত্বের ষোল আনা পরিচয় দিয়েছে। আর সীতা? কেবল প্রভু রামের সহিত বন যাত্রার ইচ্ছা প্রকাশ দেখাইয়াছেন যে, তাঁহারও ইচ্ছা প্রকাশের শক্তি আছে। রাম বেচারিা অবোধ বালক, সীতার অনুভব শক্তি আছে, ইহা তিনি বুঝিতে চাহেন নাই, কেননা, বুঝিয়া কার্য করিতে গেলে স্বামীত্বটা পূর্ণমাত্রায় খাটান যাইতো না; সীতার অমন পবিত্র হৃদয়খানি অবিশ্বাসের পদাঘাতে দলিত ও চূর্ণ করিতে পারা যাইতো না!”^৫

পুরুষের এহেন আচরণে নারীরা ধীরে ধীরে অন্ধ কূপে ডুবে গেছে। এখান থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় শিক্ষা। আর তার জন্য চাই উপযুক্ত বহুল পরিমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সমকালে তার বড় অভাব ছিল। আধুনিক শিক্ষার সুযোগ বাঙালি, খ্রিস্টান, ব্রাহ্ম ও উচ্চবর্ণের হিন্দু মেয়েদের থাকলেও, বাঙালি মুসলমান মেয়েদের সেই সুযোগ তেমন ছিল না। যদিও পশ্চিমাঞ্চলের (লাহোর, মুম্বাই, আলিগড়) মুসলমান মেয়েদের সুযোগ কিছুটা হলেও ছিল। অন্ধকারের মধ্যে ‘আশা-জ্যোতি’ জ্বালিয়ে ছিল আলীগড়ে মেয়েদের জন্য আলাদা শিক্ষালয় তৈরি করে। তাঁর ‘আশা-জ্যোতিঃ’ প্রবন্ধে তা উল্লেখ করেছেন। প্রতিষ্ঠানটির মধ্যে লেখিকা ভবিষ্যৎ মহীরুহের সম্ভাবনাকে দেখেছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল এই স্কুলটি হবে জেনানা মেয়েদের ভাবি কলেজের মাতামহী বা প্রমাতামহী। আসলে সেই সময়ে বেথুন কলেজে কেবলমাত্র ভদ্র হিন্দু মেয়েদের পড়ার সুযোগ ছিল। সেখানে মুসলিম মেয়েদের প্রবেশ একেবারে ছিল নিষিদ্ধ। আশাহত রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন আশার জ্যোতি দেখেছিলেন আলীগড়ে ‘মেয়েদের কলেজের মাতামহিকে’ দেখে। সুযোগ পেলে দূরে পাড়ি দিয়েও মুসলিম মেয়েরা পড়তে পারবে। অনেকে হয়তো বলতে পারেন যে, একবার আদিজননী জ্ঞান ফল চয়ন করায় পিতা আদমকে স্বর্গচ্যু হতে হয়েছে, আবার বঙ্গ জননীরা জ্ঞানলাভে অগ্রসর হলে পুরুষদের গৃহচ্যুত হতে হবে। যদি আদিমাতা এই হয়, তবে নিষ্কর্ম অলস জীবনের স্বর্গভোগ পরিত্যাগ না করলে মানবজাতি ধর্মবিশ্বাসরূপ অমূল্যরত্ন পেত কোথায়? স্বর্গবাসী আদম অপেক্ষা মর্তবাসী দরবেশ মনসুর বেশি সুখী ছিলেন না কি?

মুসলিম নারীজাতির শিক্ষার জন্য এটি একটি শুভ উদ্যোগ। সেই উদ্যোগকে সফলকাম করতে অবলা নারীদের জাগরণ ও সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। সংখ্যায় একজন দুজন হলে হবে না, সকলকে এই মাহেন্দ্রক্ষণে উদ্যোগী হতে হবে। তবেই সমাজের পরিবর্তন সম্ভব। তাই প্রবন্ধের শেষে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন বলেছেন-

“সুদীর্ঘ নৈরাশ্য ও যামিনীর শেষে আশা-শুকতারা উদয় হইল। এমন সুপ্রভাতে যে নিদ্রিত থাকে, তাহার দুর্ভাগ্য। তাই বলি ভগিনী! চাহিয়া দেখুন- ঐ দূরে আশা জ্যোতিঃ।”^৬

মুসলমান সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিকে কটাক্ষ করে ‘সিসেম ফাঁক’ প্রবন্ধটি ‘সংগাত’ পত্রিকায় অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। মুসলমান সমাজ স্ত্রী শিক্ষাকে নাকোচ করে উচ্চস্তরে পৌঁছাতে চেয়েছে। সমাজের গাড়ির চাকার একটি চাকাকে উপেক্ষা করে কোনোভাবেই সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব নয়, তা প্রাবন্ধিক বারবার বিভিন্ন লেখনীতে উল্লেখ করেছেন। মূল সত্যটি বুঝতে যদিও সমাজের অনেকটা সময় লেগেছে। দেরিতে হলেও এখন মুসলমান সমাজ বুঝেছে যে, স্ত্রীশিক্ষা ব্যতীত এই অনুন্নত সমাজের উন্নতির আশা নেই। চারিদিকে স্ত্রীশিক্ষার আলোচনা হচ্ছে, জেলায় জেলায় ও গ্রামে গ্রামে মেয়েদের স্কুল স্থাপিত হয়েছে। মহিলা সমিতি, মহিলা ক্লাব গুলিতে তাদের উপর নজর দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন অধিবেশনে পর্দানশীল মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট জায়গা রেখে তাদের নিমন্ত্রণ করা হচ্ছে। পুরুষেরা এখন বুঝেছে-

“না জাগলে সব ভারত- ললনা” এ ভারত আর জাগিবে না।”^৭

‘সিসেম ফাঁক’ প্রবন্ধের আলিবাবা ও কাশেমের বহু পরিচিত গল্পটি এখানে আলোচনা না করলে শিল্পীর প্রতিভার অভিনবত্ব আমাদের কাছে অজানা থেকে যাবে। গল্পটিতে এক অন্য নতুন অর্থ সাজিয়ে পরিবেশন করেছেন। আলিবাবার কাছে গুপ্ত ধনাগারের সন্ধান নিয়ে কাশেম গুহায় প্রবেশ করে। থলি ভরে মূল্যবান প্রস্তর ও আশরাফি নেয়। কিন্তু গুহার বাইরে আসার মূল মন্ত্রটি ‘সিসেম ফাঁক’ ভুলে গেছে। সে মন্ত্রটি কোনোভাবেই মনে করতে পারে না। ধনরত্ন পেলেও মুক্তির পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। ফলে সেখানে ধনরত্ন মূল্যহীন হয়ে যায়। একইভাবে মুসলমান সমাজও নারীদের শিক্ষা পরিহার করে সমাজের মুক্তি ও প্রগতি চেয়েছিল। কিন্তু প্রকৃত মুক্তির দ্বার উদ্ঘাটন হয়নি। রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন তাই বলেন যে, গৃহে যে গৃহিণী, ধর্মে যে সহধর্মিণী, ভাবি বংশধরের যে জননী, ভবিষ্যতের আশা ভরসার যে রক্ষায়িত্রী ও পালনকর্ত্রী তাকে সঙ্গে না নিলে গন্তব্যস্থানে পুরুষ কখনো একা পৌঁছাতে পারবে না।

অন্যান্য সাহিত্যের মত কবিতাতেও তাঁর সমান পারদর্শিতা ছিল। শিক্ষা সংস্কৃতি আর মর্যাদাপূর্ণ জীবনচর্চার মাধ্যমে রোকেয়া নারী সমাজকে সফল করে তোলার অভূতপূর্ব সওগাত আমৃত্যু বাঙালির ঘরে ঘরে বিলিয়ে দিয়েছেন। তাঁর ‘সওগাত’ কবিতায় তারই পরিচয় পাওয়া যায়। নারী সমাজকে জাগ্রত করার জন্য ‘সুপ্রভাত’ বলে তিনি জাগরণী গান শুনিয়েছেন-

“জাগো বঙ্গবাসি।
দেখ, কে দুয়ারে
অতি ধীরে ধীরে করে করাঘাত
ঐ শুন শুন!
কেবা তোমাদের
সুমধুর স্বরে বলে ‘সুপ্রভাত’।
অলস রজনী
এবে পোহাইল,
আশার আলোকে হাসে দিননাথ।
শিশির সিক্ত
কুসুম তুলিয়া
ডালা ভরে নিয়ে এসেছে ‘সওগাত’।”^৮

রোকেয়ার একমাত্র উপন্যাস ‘পদ্মরাগ’। উপন্যাসটিতে তিনি নারীর অর্থনৈতিক মুক্তি বা স্বাবলম্বনের কথা বলেছেন। ‘তারিণী ভবন’ নামক একটি নারী আশ্রমকে কেন্দ্র করে এই উপন্যাসের কাহিনি। তারিণী ভবনের প্রতিষ্ঠাত্রী দীণ-তারিণী ও উপন্যাসের নায়িকা সিদ্ধিকার মধ্যে আসলে লেখিকার নিজ জীবনের ছায়াপাত লক্ষিত হয়েছে। উপন্যাসে তিনি নারীর আত্মমর্যাদা ও আত্মনির্ভরশীলতার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তাই উপন্যাসের অনেক চরিত্র (সাকিনা, জয়নব) স্বামীর ঘর না করে ‘তারিণী ভবন’ আশ্রয় নিয়ে স্বনির্ভর হয়েছে। তারা সমাজকে বুঝিয়ে দিতে চাই বিবাহিত জীবনই নারী জন্মের চরম লক্ষ্য নয়। উপন্যাসের মূল বিষয় হল নারী নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াবে। সেটাই তার জীবনের লক্ষ্য হবে। বিয়েকে সে জীবনের মোক্ষ মনে না করে। সে নিজের চলার পথ নিজেই স্থির করবে। সে তার নিজের শক্তি সম্পর্কে আত্মপ্রত্যয় অর্জন করুক। অল্প নির্ভর জীবন অবমাননাকর। নারী সে অবমাননা মেনে নিবে কেন? যে শক্তি সে স্বামীর সংসার

চালাতে ব্যয় করে, সেই শক্তিকে সে স্বনির্ভর হওয়ার কাজে লাগাক। আর একদিন সে লক্ষ্যে পৌঁছাবেই। সেটাই হোক তাদের সাধনা।

উপন্যাসের রসুলপুরের জমিদার হাজী হাবিব আলমের ভাইপো লতিফের সঙ্গে চুয়াডাঙ্গার জমিদার সোলেমানের বোন জয়নবের আকদবস্ত (বিয়ের চুক্তি) হয়। দুই পরিবারের মধ্যে স্থির হয়-লতিফ ব্যারিস্টার হয়ে তিন বছর পরে বিদেশ থেকে ফিরে এলে সম্প্রদান করা হবে। কিন্তু হাজী সাহেব ব্যারিস্টার ভাইপোকে কন্যাদায়গ্রন্থদের কাছে একটি টোপ স্বরূপ মনে করলেন। বিয়ের আগেই জয়নবের প্রাপ্য সম্পত্তি তার নামে লিখে দেওয়ার জন্য সোলেমানকে চিঠি দিলেন। সোলেমান নাবালিকা বোনের নামে কোন সম্পত্তি লিখে দিতে রাজি হলেন না। তখন সালেহা নামে এক জমিদার কন্যার সঙ্গে লতিফের বিয়ে হয়। লতিফ ব্যারিস্টার হয়েও নিজের কোন মতামতকে প্রতিষ্ঠা না করে গুরুজন যাকে বিয়ে করতে বললেন, তাকেই বিয়ে করে নিল। উপন্যাসের নায়িকা সিদ্দিকা ওরফে জয়নব লতিফের সঙ্গে তার বিয়ে ভেঙে যাওয়ার জন্য লতিফ ব্যক্তিগতভাবে দায়ী নয় জানার পরও তার সংসারে যেতে রাজি হয়নি। তার আত্মমর্যাদাবোধ অন্তরাবেগের উপর জয়ী হয়েছে। দীপ্ত কণ্ঠে বলেছেন-

“একমাত্র বিবাহিত জীবনই নারী জন্মের চরম লক্ষ্য নহে।.....সেই যে সম্পত্তি লিখিয়া না পাওয়ার জন্য ‘পদাঘাতে বিতাড়িত’ হইয়াছিলাম, সে অবমাননা কি করিয়া ভুলিবো? তাঁহারা আমার সম্পত্তি চাইহাছেন, আমাকে চাহেন নাই। আমরা কি মাটির পুতুল যে, পুরুষ যখন ইচ্ছা প্রত্যাখ্যান করিবেন, আবার যখন ইচ্ছা গ্রহণ করিবেন?”^{১০}

যেখানে প্রতিষ্ঠিত লেখক রবীন্দ্রনাথের ‘স্ত্রীর পত্র’ গল্পের মৃণাল বিয়ের পনের বছর পর পুরীর সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে প্রথম উপলব্ধি করে যে, সংসারে মেজো বউ ছাড়াও জগতের সঙ্গে তার অন্য সম্বন্ধ আছে। কিন্তু শেষপর্যন্ত মুক্তির পথ হিসেবে খুঁজে নেয় মীরা বাইয়ের সাধনার আদর্শের মধ্যে, মেরে তো গিরিধর গোপাল/দুসরো না কোই। আবার ‘যোগাযোগ’ উপন্যাসের কুমুদিনী স্বামীকে ত্যাগ করেও সন্তান জন্ম দেওয়ার জন্য আবার সেই স্বামী গৃহেই ফিরে যায়, যে স্বামীকে সে মন থেকে একদিনের জন্যেও শ্রদ্ধা করতে পারেনি। ইবসেনের ‘A Doll’s House’ নাটকে তিন সন্তানের জননী নোরা আট বছর সংসার করার পর স্বামীগৃহ ত্যাগ করে। Leo Tolstoy এর ‘Anna Karenina’ উপন্যাসের আন্নাও মুক্তি চেয়েছিল। মুক্তি বলতে সে বুঝেছিল সরে যাওয়া। কিন্তু সরে যাওয়া তো আসলে হেরে যাওয়ার নামান্তর। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘সাধারণ মেয়ে’ কবিতার মালতীও জিততে চায়। যদিও সে জানে ‘বিছানায় শুয়ে শুয়ে রাত্রির অন্ধকারে/ দেবতার কাছে যে অসম্ভব বর মাগি/ সে বর আমি পাব না।’ অন্যদিকে রোকেয়ার ‘পদ্মরাগ’ উপন্যাসের সিদ্দিকা বিজয়নী। কারণ সবার সঙ্গে সবাইকে নিয়ে জেতার প্রয়াস। তাই তাঁর মুখে জীবনের গন্তব্যপথ সম্পর্কে শুনতে পাই-

“আমি আজীবন তারিণী ভবনের সেবা করিয়া নারী জাতির কল্যাণ সাধনের চেষ্টা করিব এবং অবরোধ প্রথার মুলোচ্ছেদ করিব।..... মুসলমান সমাজের ললনাবৃন্দকে জাগ্রত করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিব।”^{১১}

রোকেয়ার সৃষ্ট আধুনিকচেতা সিদ্দিকা লতিফকে নির্ধ্বিধায় প্রত্যাখ্যান করেছে। শেষে সিদ্দিকা নিজস্ব এলাকা চুয়াডাঙ্গা যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সেখানে সে জমিদারি দেখাশোনা করবে এবং নাবালক মাতৃ-পিতৃহারা ভ্রাতুষ্পুত্রকে লালন করবে। সেই সঙ্গে পতিত মুসলমান সমাজের ললনাবৃন্দকে জাগ্রত করার চেষ্টা করবে। রোকেয়া সিদ্দিকার মধ্যে দিয়ে নিজের মনে লুকিয়ে থাকা ভাবনাকেই প্রতিফলিত করেছেন। যে সমাজের কাছে নারী অপমানিত, উপেক্ষিত হয়েছে, সেই সমাজের কাছে সে কোন প্রত্যাশা করেনি। যে সমাজ বস্ত

মূল্যে নারীকে ওজন করেছে, তার প্রতিনিধিকে স্পষ্টভাবে সে জানিয়ে দিয়েছে “তুমি তোমার পথ দেখ, আমি আমার পথ দেখি”^{১১} (তদেব, পৃ-৩০৫)। পুরুষ যদি নারীকে অপমান করে নিজের ইচ্ছামতো চলতে পারে, তবে সেই অপমানিত নারী কেন সেই পুরুষকে প্রত্যাখ্যান করে মানুষ হিসেবে বাঁচতে পারবে না?

শুধুমাত্র বাংলা রচনাতে নয়, ইংরেজি রচনাতেও রোকেয়া কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। এক্ষেত্রে ‘Sultana’s Dream’ অন্যতম। বিশেষত এখানে তিনি যে বিজ্ঞান মনস্কতার পরিচয় দিয়েছেন তা আজও আমাদের বিস্মিত করে। কল্পবিজ্ঞান রচনাটি পড়ে ভাগলপুরের কমিশনার মিষ্টার ম্যাকফারসন মন্তব্য করেছিলেন-

“The ideas expressed in it are quite delightful and full of originality and they are written in perfect English.”^{১২}

‘Sultana’s Dream’ রচনায় রোকেয়া এক ‘নারীস্থান’ এর উন্নতির কল্পনা করেছেন যেখানে নারীরা সকল অর্থেই স্বাধীন। ‘নারীস্থান’ এর উন্নতির মূলে রয়েছে নারীদের স্বাধীনতা আর জীবনের সকল ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের প্রয়োগ। ‘Sultana’s Dream’- এ যে নারী রাজত্বের কথা বলা হয়েছে, তা ঠিক পুরুষশাসিত সমাজের বিপরীত। এখানে নারীরা সমস্ত ক্ষমতার অধিকারিণী। তারাই বাইরের কর্মবহুল জীবনের অংশীদার। সুলতানার রাজত্বে নারীই নিয়ন্ত্রণ শক্তি। পুরুষ অন্তঃপুরের বাসিন্দা। বাস্তব সংসারে রমণীদের পর্দার আড়ালে থাকতে হয়। তাদের ইচ্ছা থাকলেও সামাজিক রীতি ভেঙে তারা পুরুষদের মত বাইরে বেরিয়ে আসতে পারে না। এতে নারীর কিরকম উপলব্ধি হয়, তারই প্রতিশোধ নিতে স্বপ্নের জগতে রোকেয়া ‘মাতৃতান্ত্রিক’ সমাজব্যবস্থার চিত্র অঙ্কিত করেন, যা বাস্তবে কোন সময়ে কোথাও ছিল না। এই কল্পকাহিনীর রূপ এক নিঃশ্বাসে পড়ে স্বামী সাখাওয়াত হোসেন বলেছিলেন, ‘A terrible revenge’ (ভয়ংকর প্রতিশোধ)^{১৩}

সামাজিক বিধি ব্যবস্থার উপর নারীদের কোন হাত থাকে না। পুরুষজাতি প্রভু- তারা সব সুখ, সুবিধা ও প্রভুত্ব নিজেদের জন্য হস্তগত করে ফেলেছে। আর সরলা অবলাকে অন্তঃপুর রূপ খাঁচায় আবদ্ধ রাখে। উড়তে শেখার আগেই তাদের ডানা কেটে দেয়। তাছাড়া সামাজিক রীতি-নীতির কত শত কঠিন শৃঙ্খল পদে পদে জড়িয়ে আছে। কিন্তু সুলতানার স্বপ্নে নারী তার আপন বুদ্ধি বলে পায়ের বেড়ি কেটে বাইরে বেরিয়ে আসে। কেবল শারীরিক বল বেশি থাকলেই কেউ প্রভুত্ব করবে, এটা তারা অস্বীকার করে। তারা ভাবে মানুষ অপেক্ষা সিংহ শক্তিশালী হলেও, সে মানুষের উপর প্রভুত্ব করতে পারে না। তেমনি পুরুষ শক্তিতে এগিয়ে থাকুক কিন্তু নারীরা বুদ্ধি বলে তাদের ওপর প্রভুত্ব করবে। পুরুষরা কাজে বেশি সময় নেয়, তারা অলসভাবে সময় কাটায়, অন্যদিকে নারী যত্ন সহকারে নিজ দায়িত্ব পালন করে কম সময়ে নিপুন কাজ করে। সুলতানা রাজ্যে পুরুষের ক্ষমতাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করেছে। ‘জেনানা’-র পরিবর্তে ‘মর্দানা’ প্রথা চালু হল। লেখিকা জোর দিলেন নারীর বুদ্ধিভিত্তিক শক্তিমত্তায়।

কল্প কাহিনীটির দ্বিতীয় অংশের সৌরশক্তি কেন্দ্রিক বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীটিও সেকালের বিজ্ঞান জগতে ছিল অভিনব। লেখিকার অনেক ভাবনার দিক এখনো গবেষণার অপেক্ষা রাখে। সুলতানার মধ্য দিয়ে তিনি যে স্বপ্ন রাজ্য তৈরি করেছিলেন, সেখানে সৌরতাপ দিয়ে রান্না করা, সৌরতাপ দিয়ে শত্রু নিধন করা, বেলুনের মাধ্যমে বায়ুর আর্দ্রতা শুষে নিয়ে বৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণ করা, বায়ুযানে ভ্রমণ করা সবই অভিনব। সুলতানা স্বপ্নের পৃষ্ঠপোষক যেহেতু স্বয়ং মহারানী, সেখানে আর কোন অভাব থাকতে পারে না। অবলাগণ অত্যন্ত নিবিষ্ট চিন্তে বিজ্ঞান আলোচনা করে। রাজধানীর বিশ্ববিদ্যালয়ের মহিলা প্রিন্সিপাল একটি অভিনব বেলুন নির্মাণ করলেন, এই বেলুনে কতগুলি নলযুক্ত করা হল। বেলুনটিকে শূন্য মেঘের উপর স্থাপন করে বায়ুর আর্দ্রতা বেলুনে সংগ্রহ করে জলধরকে ফাঁকি দিয়ে বৃষ্টিজল করায়ত্ত করল। এই অদ্ভুত উপায়ে বুদ্ধিমত্তা

লেডি প্রিন্সিপাল প্রাকৃতিক ঝড়-বৃষ্টি নিবারণ করলেন। এরপর রাজ্যের অন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অল্প দিনের মধ্যে একটি যন্ত্র তৈরি করে, যার দ্বারা সূর্যতাপ সংগ্রহ করা যায়। শুধু তাই নয়, প্রচুর পরিমাণে সূর্যের তাপ সংগ্রহ করে রাখা যায় এবং ইচ্ছামত ব্যবহার করা যায়। এটি ব্যবহার করে পুরুষদের রণে হারিয়েছিল এবং তখন থেকে পুরুষরা অন্তঃপুরের বাসিন্দা হলো আর কখনো বাইরে আসার চেষ্টা করেনি। তাদের বায়ুযানটিও খুব অভিনব ছিল। একখন্ড তক্তা ওজন অনুপাতে হাইড্রোজেন পূর্ণ গোলা এবং বিদ্যুৎ দ্বারা চালিত দুটি পাখার মত ফলা সংযুক্ত করে বায়ুভরে উড়ে যায়।

ইবসেনের ‘A Doll’s House’ নাটকে এক বিদ্রোহী নারীর একক অভিযাত্রা- (Nora- ‘I have no idea what’s going to become of me’) স্বরূপের সন্ধানে, অনিশ্চিতের পথে,/ আর Sultana’s Dream- এ এসে যেন বহুর মিলিত প্রয়াসে তার মহতী চরিতার্থতা খুঁজে পায়। সাহিত্য মূল্যায়নে হয়তো ‘A Doll’s House’ এর তুলনীয় নয়। এমনকি রোকেয়া এখানে নারীস্থানের যে কল্পনা করেছেন বিশ্বসাহিত্যে তাও একেবারে নতুন বা অভিনব নয়। তবুও উল্লেখিত দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে Sultana’s Dream এর সমান্তরাল রচনা বিশ্বসাহিত্যেও খুব বেশি নেই বলেই চলে। সমাজে নারীর অবস্থা ও অধিকার সম্পর্কে চিন্তার পথ ধরেই হয়তো রোকেয়া এই বিজ্ঞান মনস্কতার দ্বারে উপনীত হয়েছিলেন।

রোকেয়ার আগে বা তাঁর সমসাময়িককালে বাঙালি মুসলমান লেখকদের মধ্যে সৈয়দ এমদাদ আলী, ইসমাইল হোসেন সিরাজী, কাজী ইমদাদুল হক, ডা: লুৎফর রহমান প্রমুখ স্ত্রী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। কিন্তু তাঁরা কোথাও যেন শিক্ষার উপযোগিতাকে শেষ পর্যন্ত সীমায়িত রাখতে চেয়েছেন আদর্শ গৃহিনী ও মাতা তৈরি করার মধ্যে। রোকেয়ার মতো তাঁরা বলতে পারেননি-

“আমি চাই সেই শিক্ষা - যাহা তাহাদিগকে নাগরিক অধিকার লাভে সক্ষম করিবে।.....

তাহাদের জীবন শুধু পতি-দেবতার মনোরঞ্জনের নিমিত্ত উৎসর্গ হইবার বস্তু নহে। তাহারা যেন অল্পবস্ত্রের জন্য কাহারও গলগ্রহ না হয়।”^{১৪}

পদ্মরাগ উপন্যাসেও তারিণী ভবনের শিক্ষা প্রণালীর যে বিবরণ দিয়েছেন, তাতেও দেখা যায়-

“বিশেষতঃ তাহারা আত্মনির্ভরশীল হয় এবং ভবিষ্যৎ-জীবনে যেন কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ পিতা, ভ্রাতা বা স্বামী পুত্রের গলগ্রহ না হয়, এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখা হয়।”^{১৫}

তিনি তাঁর প্রায় সব রচনায় বলেছেন যে, উন্নতির জন্য উচ্চ শিক্ষা চাই। নারীরা উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত না হলে সমাজও উন্নত হবে না। যতদিন তারা আধ্যাত্মিক জগতে পুরুষদের সমকক্ষ না হই, ততদিন পর্যন্ত উন্নতির আশা দুরাশা মাত্র। নারীদের সকল প্রকার জ্ঞানচর্চা করতে হবে।

অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপে নারীর অধিকার বিষয়ক আলোড়ন সৃষ্টিকারী রচনা মেরি ওলসটন ক্রাফটের ‘A Vindication of the Rights of Women’ এবং জন স্টুয়ার্ট মিলের ‘The Subjection of Women’। রোকেয়ার রচনাবলীতে এই দুজন পূর্বসূরীর রচনার সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচয়ের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না কিন্তু মেরি ওলসটন ক্রাফটের বক্তব্যের সঙ্গে রোকেয়ার বিভিন্ন বক্তব্যের মিল সহজেই চোখে পড়ে। মেরি ওলসটন ক্রাফটের মতে নারী ও পুরুষের পার্থক্যের জন্য দায়ী উভয়ের শিক্ষার পার্থক্য এবং সামাজিক প্রথা সমূহ। রোকেয়াও এই যৌক্তিক দিক থেকেই তাঁর বিভিন্ন লেখায় সমাজে নারীর অবস্থান ও অধিকারের প্রশ্নটিকে নিজে দেখতে ও দেখাতে চেষ্টা করেছেন। তবে অন্যান্য লেখকদের সঙ্গে তাঁর বক্তব্যের মিল যাই হোক, নিজ সমাজের বাস্তবতা সম্পর্কে সচেতনতা ও নিজস্ব দায়বদ্ধতাই ছিল মূল প্রেরণা, আর শেষ পর্যন্ত তাই তাঁকে চালিত করেছে। রোকেয়া তাঁর লেখনির মধ্যে

প্রাথমিক মনস্কতার পরিচয় দিয়েছেন, সাহসী ও স্পষ্ট উচ্চারণ করেছেন, সেখানে তাঁর সমকালে তিনি একক ও অনন্য।

তথ্যসূত্র:

- ১। নাহার, শামসুন। রোকেয়া জীবনী। নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, ১৯৯৬, পৃ. ১৮।
- ২। নাহার, মীরাতুন সম্পাদিত। রোকেয়া রচনা সমগ্র। বিশ্বকোষ পরিষদ, কলকাতা ২০০১, পৃ. ৪১৭।
- ৩। নবনূর, ২য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ভাদ্র ১৩১১, উদ্ধৃত 'সম্পাদকের নিবেদন', রো, র, পৃ. ১১-১৩।
- ৪। চন্দ, রাণী। আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ। ১৩৪৯ বঙ্গাব্দ, কলকাতা, পৃ. ২৯।
- ৫। রাউফ, আবদুল সম্পাদিত। রোকেয়া রচনাসমগ্র। বিশ্বকোষ পরিষদ, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০০৮, পৃ. ৩০-৩১।
- ৬। তদেব, পৃ. ৩৭৯।
- ৭। তদেব, পৃ. ৩৯১।
- ৮। তদেব, পৃ. ৮৫৯।
- ৯। তদেব, পৃ. ১৯৯।
- ১০। তদেব, পৃ. ২৯৮।
- ১১। তদেব, পৃ. ৩০৫।
- ১২। তদেব, পৃ. ৫৭৪।
- ১৩। তদেব, পৃ. ৪৪৯।
- ১৪। তদেব, পৃ. ৪৩৪।
- ১৫। তদেব, পৃ. ২০৬।



‘অশ্বযোনি’: নারীর জীবন সংগ্রামের উপাখ্যান

পরশুরাম রজক, সহ শিক্ষক, আশ্বিনটোলা প্রাথমিক বিদ্যালয়, মালদা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 26.12.2025; Accepted: 03.01.2026; Available online: 28.02.2026

©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

Abstract

Among those who emerged at the turn of the twentieth and twenty-first centuries and showed new directions to Bengali fiction, Bani Basu is eminent. She is distinguished by virtue of her unique narrative technique and analytical insight. In her fiction, women are vibrant, expressive, and full of life. Alongside portraying the suffering of women’s lives, she also sheds light on their social positioning.

She has closely observed the dynamic life of Kolkata and has seen how people, as travelers on the path of life’s struggle, move forward along the road of progress. This path is neither smooth nor comfortable. To secure the means of survival, people must constantly struggle – and women must struggle far more. Women are compelled to build strong resistance against patriarchy, and only then can they choose the path of progress. Along this path, women repeatedly become victims of exploitation and oppression. At times, they surrender themselves to the conventional flow of life; at other times, they rise again, choosing their own rhythm of life.

Bani Basu has created timely and relevant female characters in her novels such as Antarghat, Pancham Purush, Shwetpatharer Khala, Uttar Sadhak, Gandhabi, Ekush-e Pa, Amrita, Khanamihirer Dhipi, and Maitreya Jatak. Among her distinguished novels is Ashwayoni, by the author of Maitreya Jatak, which chronicles the formation of an independent female identity along the path of protest.

Rajeswari is an unwanted child of her parents’ old age; she is dark-skinned. An inevitable neglect, bestowed by nature, marks her forehead. The patriarchal structure of a wealthy family marginalizes her.

Eight years ago, she left the Goswami family – that is, both her parental home and her husband’s family – and chose an independent life and livelihood. She is now established as a writer and critic. With her self-earned income, she lives independently in a modest apartment on the outskirts of South Kolkata, along with her son Babui, given to her by her husband Saheb. She is divorced. Having refused to compromise with any form of injustice, she remains alone – and in this solitude lies her freedom.

Keywords: Bani Basu, Bengali fiction, women’s identity, patriarchy, resistance

বাণী বসু একজন স্বনামধন্য কথাকার। বিংশ শতাব্দীতে তাঁর জন্ম, একবিংশ শতাব্দীতে বাস। দুই শতাব্দীর সন্ধিক্ষণের জীবন অভিজ্ঞতায় তিনি সমৃদ্ধ। সমৃদ্ধ তাঁর সাহিত্যকীর্তি। আজন্ম পরিচিত কলকাতার চলমান জীবন

ও জিজ্ঞাসা তাঁর সাহিত্যে সমাদর পেয়েছে। ‘মৈত্রেয় জাতক’ খ্যাত বাণী বসুর ‘অশ্বযোনি’ (২০০৯) উপন্যাসটি নারীর সুগভীর জীবনবোধ ও আশ্চর্য নির্মাণ কৌশলে কালোত্তীর্ণ।

উপন্যাসটি একজন নায়িকার জীবন সংগ্রামের উপাখ্যান। নাম রাজেশ্বরী ওরফে খুকু। তার জীবন সংগ্রামকে পূর্ণতা দিতে এবং বহু কৌণিক দৃষ্টিতে তার চরিত্র পর্যালোচনা করতে ঔপন্যাসিক তুলে ধরেছেন মা সুহাসিনী, দিদি পরমেশ্বরী, বিলেশ্বরী, ফুলেশ্বরী সহ ময়না, জারিনা প্রমুখ চরিত্রকে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ চিরাচরিত জীবন প্রবাহে ভেসেছে, কেউ আবার নিজস্ব জীবন ছন্দ বেছে নেওয়ার চেষ্টা করেও শেষ পর্যন্ত হার মেনেছে গতানুগতিকতার কাছে। কিন্তু প্রত্যেকটি চরিত্র রাজেশ্বরীর চরিত্রের মৌলিকতা স্পষ্ট করেছে; পর্যবশিত করেছে নায়িকা চরিত্রে।

শেফালী মৈত্র বলেছেন-

“সমাজের বৃহত্তর কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে হলে, সমাজ পরিচালনায় নারীরূপে কর্তৃত্ব পেতে গেলে (পুরুষের ছায়াবলম্বনে কর্তৃত্ব না-চাইলে) নারীকে নিজের কথা নিজের মতো করে বলা শিখতে হবে। তাকে স্পষ্ট করে বুঝতে হবে সে কী চায়। তার অভাব-অভিযোগগুলি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রকাশ করতে হবে। নারীর নিজের কথা নিজের মতো করে বলা প্রয়োজন। তাকে বুঝে নিতে হবে কোন স্বরটি তার নিজের, আর কোনটি বা ধার-করা। এর জন্য ভাষার ওপর দখল থাকলেই হবে না, তার সঙ্গে চাই চিন্তার স্বচ্ছতা।”^১

বাণী বসু নারী, তাঁর ভাষার দখলের সঙ্গে চিন্তার স্বচ্ছতা নায়িকা রাজেশ্বরীর আত্মকথনে ও উপন্যাসের সংলাপধর্মীতায় প্রকাশিত।

রাজেশ্বরীর জন্মমুহূর্তে সংগ্রামের বীজ নিহিত-

১. সে তারা বাবা মায়ের শেষ বয়সের অনিচ্ছার সন্তান। তার জন্মের সময় বাবা নারায়ণ গোস্বামীর বয়স ষাট বছর, মা সুহাসিনীর বয়স চল্লিশ বছর।
২. সে তার বাবা মায়ের কনিষ্ঠ সন্তান। লালদা, নীলদা, দুলদা, বিলদি, ফুলদি, ভুলদা প্রমুখ ছয় জনের পর তার জন্ম। তা ছাড়া পরমেশ্বরী নামের সবার বড় সতাতো দিদি রয়েছে তাদের।
৩. সে কালো। ঔপনিবেশিক মানসিকতা পুষ্ট মানুষ যাকে সুন্দর নয়, অসুন্দর মনে করে।
৪. বাবার অসংযত যৌন লালসার ফসল সে।
৫. সে তার মায়ের উদাসীন, অবহেলিত প্রসব পিণ্ড ছাড়া কিছু নয়।

তার ললাটে প্রকৃতি প্রদত্ত অনিবার্য অবহেলা। বিভবান পরিবারের পরিবার তত্ত্ব তাকে কোণঠাসা করে তোলে। তার গাত্রবর্ণ কালো। কালো মেয়ের প্রতি পরিবারের নেতিবাচক মানসিকতার বিরুদ্ধে তার সংগ্রামী মনোভাব স্পষ্ট-

“এরা পূজো করে এক শ্যামাঙ্গিনীকে ঋতুতে ঋতুতে, এক কৃষ্ণাকে বছরভর, অথচ কালো মেয়ে এদের দুটি চক্ষের বিষ। কালো, কালো, কালো!”^২

এ ভাবনা পুরুষতন্ত্রের মূলে আঘাত করে।

আট বছর আগে গোস্বামী পরিবার অর্থাৎ তার বাবার পরিবার এবং তার স্বামীর পরিবার ত্যাগ করে স্বাধীন জীবন ও জীবিকা বেছে নিয়েছে রাজেশ্বরী। নিজ উপার্জিত অর্থে দক্ষিণ কলকাতার প্রান্তিক আবাসনে তার স্বাধীন বসবাস। সঙ্গে তার স্বামী সাহেব ভট্টাচার্য প্রদত্ত পুত্র বাবুই। সে ডিভোর্সি। কোন প্রকার অন্যায়ের সঙ্গে আপোস করেনি বলে সে একা। একাকীত্বে তার মুক্তি।

আট বছর পর ‘গোস্বামী গোষ্ঠী’ অর্থাৎ তার দাদা- লালদা, নীলদা, বিলদা, মা সুহাসিনী, দিদি- বিলদি, ফুলদি জমিজমা স্থাবর সম্পত্তি বিষয়ে আইনি জটিলতায় পড়েছে বলে তার ডাক পড়েছে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে যায় লালদার বাড়ি।

ঔপন্যাসিক এরপর রাজেশ্বরীর অতীতের কথা স্মরণের মাধ্যমে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন বাস্তব জীবনবোধ ও তার সঙ্গে রাজেশ্বরীর মানসিক যন্ত্রণা। যেখানে আমরা দেখি রাজেশ্বরী অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবন থেকে মুক্তিলাভের জন্য সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে। জন্মের পর থেকে তার ও ভুলদার কাছ থেকে মা ছিল অনেক দূরে। বড়দি পরমেশ্বরীর স্নেহ ও পরিচর্যায় ধীরে ধীরে বড় হয়েছে সে। সে জানতই না যে গোস্বামী পরিবারে মোনালিসা চরিত্রের অধিকারী, ভেনাস ফিগার সুহাসদি তার মা। মাকে ছাতের দরজার আড়াল থেকে ফুল তুলতে, ফুলের গাছে জল দিতে, লাইব্রেরিতে জোরে মহাভারত পড়তে, রান্নাঘরে বামনির সঙ্গে সামান্য কথা বলতে, ছাতের ট্যাংকে সরময়দা মেখে গামছা ও বামা ঘষে স্নান দেখেছে সে। মাকে সামান্যটুকু কাছে পাওয়া যেত দালানের মোড়ায় বসে চা-মুড়ি খাওয়ার সময়। হৃদয়ের কাছে মা নেই, আছে বড়দি। যে শ্বশুরবাড়ির অত্যাচারে মৃত্যু বরণ করেছে। যা অনায়াসে, বিনা প্রতিবাদে, বিনা মনোযোগে মেনে নিয়েছে গোস্বামী পরিবার। একে সত্যতো, তার উপর বাবা নারায়ণ গোস্বামীর উদাসীনতায় সে ন্যায় পায়নি। শুধু তার ছেলে টুকাই তাদের বাড়িতে আশ্রয় পেয়েছে। বাবা নারায়ণ গোস্বামী মহর্ষি। একসময় অনেক উপার্জন করে বিষয় সম্পত্তি করে নিয়েছে। এখন ভক্তি ও পরামর্শদানে নিজেকে বিষয় ভাবনা থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। রাজেশ্বরীর আত্মবিক্ষণ স্পষ্ট-

“বুঝলুম উনি সেইন্ট, বুঝলুম মোনালিসা দেবীস্বরূপিণী। কিন্তু আমরা কে? আমাদের অবস্থান কোথায়? আমরা কেন এত সাধারণ? বিশেষত আমি! এবং ভুলদা-ও।”^৩

ভুলদার বুদ্ধি বাড়েনি। তার ছেলেমানুষি ব্যবহারে, খাবার সময় বাবা তাকে ‘ভুল ভৈরব’ বলতেই রাজেশ্বরী হৃদয়াবেগে প্রতিবাদী হয়ে ওঠে-

“-না ও ভুল না, ও ভুল না, তোমরা ভুল... তোমরা সবাই ভুল। মহর্ষি ভুল, লালনীলবিলফুলদুল সব সবাই ভুল।”^৪

বাবার কাছ থেকে সম্পূর্ণ মনোযোগ আদায় করতে সেবাদাসী ময়নাকে দূরে সরিয়ে বাবার কাজকর্মে সহায়ক হয়ে ওঠে রাজেশ্বরী। অন্তরের প্রেরণাশক্তির দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে খুকু ব্যবহারিক শিক্ষা নয়, স্কুলশিক্ষার মাধ্যমে উত্তরণের শিক্ষা অর্জন করতে চায়। নীলদা তাকে স্কুলে ভর্তি করে। স্কুলশিক্ষা চলাকালীন দাদাদের অকর্মণ্যতা তার নজরে আসে। মাধ্যমিক চলাকালীন বিষয়-সম্পত্তি, উকিল পরামর্শে সামিল হয়ে তার বুদ্ধিপাকতে থাকে।

তার জীবনে সবচেয়ে বড় বিপর্যয় ঘটে স্নাতককালে, কলেজে পড়াশোনার সময়। বিয়ে ঠিক হয় তার চেয়ে কুড়ি বছরের বড় উকিল সাহেব ভট্টাচার্যের সঙ্গে। বাবার মৃত্যুর পর বিষয় সম্পত্তি রক্ষার তাগিদে তার বিয়ে ছিল নিত্যান্ত প্রয়োজনের বিয়ে। তাদের সমস্ত সম্পত্তি দেখাশোনা করত সাহেবের বাবা যোগেশ ভট্টাচার্য। বকলমে সাহেব। সুহাসিনী বলে-

“খুকু তোমার বাবা যে নেই তাতে করে একটা মস্ত বড় তফাত হয়ে গেছে। বিষয় সম্পত্তির হালচাল, কোথায় কী আছে, এসব আমি কিছুই জানি না। সাহেব জানে। কিন্তু সে আমাকে কিছুই বোঝাচ্ছে না। সাহেব যদি অন্য কাউকে বিয়ে করে আমাদের সর্বনাশ হয়ে যাবে। তুমি বুদ্ধিমতী এর চেয়ে বেশি কিছু তোমায় বলবার দরকার আছে বলে আমি মনে করি না। তোমার লেখাপড়ার কোনও ক্ষতি হবে না। তুমি পড়াশোনা করে আইন পড়ো এই আমি চাই।

বিবাহিত জীবনেও সুখী হবে এই আমার আশা। আমার চারদিকে নেকড়েরা নিশ্বাস ফেলছে, তরোয়ালটা একমাত্র তোমারই হাতে।”^৫

সাহেব যে সুহাসিনীকে ব্ল্যাকমেল করছে, এই ব্ল্যাকমেলের জায়গাটা তৈরি হয়েছে নারায়ণ গোস্বামীর উদাসীনতায়। দাদাদের অকর্মণ্যতায়।

বাবা নারায়ণ গোস্বামীর মৃত্যুর পর গভীর ষড়যন্ত্রের শিকার হয় রাজেশ্বরী। সে বিয়ে করতে নারাজ হলে তাকে ধর্ষণ করে সাহেব। যার ফল সাহেবের সঙ্গে তার বিয়ে। বাবুই-এর জন্ম। বিয়েই কি একমাত্র প্রতিকার ছিল? এটাই কি ন্যায়? সাহেব ভট্টাচার্যের একার পরিবারে রাজেশ্বরীর অবস্থান হলেও সবকিছু মন থেকে মেনে নিতে পারেনি সে। সাহেব দাদার মতো হয়ে থেকেছে তার কাছে। সম্পর্কের পরিবর্তন মেনে নিতে পারেনি রাজেশ্বরী। তার মুখে ‘সাহেবদা’ ডাক ছাড়া কোন সম্পর্কের আলাপ নেই। মা সুহাসিনী রাজেশ্বরীকে সাহেবের ‘সুহাসদি সুহাসদি’ করে আদিখ্যেতা করার কথা জানালে রাজেশ্বরী গর্জে ওঠে। গোস্বামী পরিবারে জামাইয়ের মতো যাতায়াত না থাকায় সুহাসিনী সাহেবকে প্রত্যাখ্যান করে। গর্ভে দ্বিতীয় সন্তান এলে রাজেশ্বরী বেছে নেয় গর্ভপাতের পথ। নীলদা বারণ করলে সে দৃঢ় সংকল্প বদ্ধ—

“না, আর না, এবার আমাকে নিজের ভালোমন্দ নিজের হাতে নিতে হবে, খালি পরের ইচ্ছা পালন করে যাওয়ার জীবন আমি মানব না।”^৬

পূর্বের ঘটনার জের টেনে ডিভোর্স। নতুন জীবনের সূচনা এখানে।

রাজেশ্বরী এম এ পাশের পর ইউনিভার্সিটির ক্যানটিন চালায় বন্ধু রত্নাকরের ব্যবস্থাপনায়। চলে উপার্জন, পায় সাফল্য। তারপর শুরু করে হোম ডেলিভারি সার্ভিসের ব্যবসা। গোস্বামী পরিবারের লোকেরা, যারা তাকে বাড়ি থেকে এক রকম বের করে দিয়েছিল তারাই গতায়ত শুরু করে রাজেশ্বরীর ফ্ল্যাটে। কিন্তু সাহেব ভট্টাচার্যকে তারা কাজেকর্মে নিমন্ত্রণ করতে ছাড়ে না। প্রাণপণ চেষ্টা করে সুসম্পর্ক বজায় রাখার। রাজেশ্বরীর ভাবনা—

“সংসারের ক্ষমার অযোগ্য ক্রাইম বা পাপগুলো সম্পর্কে ওদের কোনও চেষ্টাই নেই। সমাজে গণ্যমান্য বা টাকাপয়সাওলা মানুষমাত্রেই ওদের কাছে ক্ষমা পায়। যেমন আমিও পেয়েছি। একদা সৃষ্টিছাড়া, বিবাহিত স্বামীর একদিনের যৌন উন্মাদনাকে মেনে নিতে না পারা, গর্ভের বৈধ সন্তানকে হত্যা করা রীতিমতো ঘৃণ্য আসামি বলে স্থির হওয়া, বাড়ির মধ্যে একঘরে আমি যেদিন নিজের ফ্ল্যাটে পা দিলুম সে দিনই অভিনন্দন এসে পৌঁছাল, কালামিনিস্ট হিসেবে যখন চারদিকে নাম ছড়িয়ে যাচ্ছে তখনই আবার রাশি রাশি অভিনন্দন।”^৭

মায়ের কাছ থেকেও অভিনন্দন পায় রাজেশ্বরী।

রাজেশ্বরী বন্ধু রত্নাকর ও সুদেবদার সহায়তায় ও পরামর্শে পদার্পণ করে লেখালেখির জগতে। সংবাদ পত্রে লেখা শুরু হয়। প্রবন্ধ, সমালোচনা, নক্সা জাতীয় রচনা সবকিছুতেই তার সাফল্য। তার নক্সা সিনেমার রূপ পায়। এ যেন তার নিজস্ব জগৎ। পরিচয় হয় কলম্বিয়ার তুলনামূলক সাহিত্য সমালোচক নিক অ্যাডামস-এর সঙ্গে। বাংলাদেশে রাজেশ্বরী নিকের কাজের সহায়ক। ছেলে বাবুই বিষয়ে নিক ভাবিয়ে তুলেছিল রাজেশ্বরীকে। মায়ের সান্নিধ্যে বাবুই-এর অপ্রাপ্তির কিছু নেই একথা রাজেশ্বরী জানালে নিক বলেছিল—

“—তুমি মনে করছ নেই। ও মনে করছে আছে। কেননা চারদিকে ও অনেক ওর সমবয়স দেখছে, যাদের পারিবারিক ঐক্য আছে। ওকে অন্তত বলে দেওয়া ভালো, কী অলঙ্ঘ্য বাধার বা অমিলের জন্য ওর পরিবার ভেঙে গেল।”^৮

পরিবার তত্ত্বের এক জটিল ভাবনায় পড়ে যায় রাজেশ্বরী।

রাজেশ্বরীকে চিনতে পেরেছে নিক। বলেছে-

“তুমি একটি অশ্ব, বন্য, স্বাধীন, কিন্তু তুমি যুথ ছাড়া। এবং উদ্ভ্রান্ত, যদিও পেশল উচ্চশ্রেণির কোনও জীবের মতো তোমার অহংকার আছে, জেদ আছে, সব কিছু অস্বীকার করবার জেদ।”^৯

সাহেব যখন মারা যায় তার সমস্ত সম্পত্তি লিখে দেয় ছেলে বাবুই-এর নামে। শর্ত শুধু একটাই তার শেষকৃত্য তার ছেলে বাবুই-এর হাতে যেন সম্পূর্ণ হয়। সমস্তটাই ছিল রাজেশ্বরীকে হার মানাবার চেষ্টা। সম্পত্তি লেখার বিষয়ে। অবশ্য প্ররোচনা দিয়ে ছিল সুহাসিনীই। বাবুই তার বাবার সমস্ত সম্পত্তি টাকা দিয়ে যাওয়াকে ভালোবাসা মনে করেছিল। ছেলে বাবুই-কে রাজেশ্বরী কাছ থেকে দূরে সরানোর চেষ্টা। পুরুষতন্ত্রের মোহ আবিস্কৃত হয় এখানে।

দিদা সুহাসিনীর দানপত্রে টুকাই ও চয়ন যে কারচুপি করে ছিল তা ধরে ফেলেছিল রাজেশ্বরী। ফৌজদারী মামলা থেকে নিস্তার পেতে টুকাই ও চয়ন রাজেশ্বরীর নামে সমস্ত সম্পত্তি লিখে দিলে সে বিক্রি করে টাকা মাকে দেয়। মা সবটাকা সবার মধ্যে ভাগ করে দেয়। পুরুষের যেনতেন প্রকারেণ সম্পত্তির অধিকার লাভের বাসনা যেন মজ্জাগত। উদাহরণ টুকায় ও চয়ন।

ঔপন্যাসিক নারী চরিত্র পরমেশ্বরীকে, ফুলেশ্বরী-বিলেশ্বরীকে সাধারণ ভাবে উপন্যাসে উপস্থাপন করেছেন। বিশেষত্ব শুধু পেয়েছে মা সুহাসিনী। ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন সংগ্রাম যে প্রজন্মের পর প্রজন্ম চলে। সেখানে এক প্রজন্ম মা সুহাসিনী ও অন্য প্রজন্ম রাজেশ্বরী। সুহাসিনীর মনে ছিল পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ। দেহে ছিল অপার সৌন্দর্য। নারায়ণ গোস্বামীর জ্ঞানের পরিধি পারঙ্গমতা দেখে মোহিত হয়েছিল। তাকে পড়াতো বলে বিশ্বাসের বলে বলীয়ান হয়ে সুহাস তার সঙ্গে পালিয়ে আসে তারকেশ্বরে। সম্পত্তির অধিকার দিতে হবেনা বলে তার একমাত্র কাকা তার আর কোন খোঁজ নেবার চেষ্টাও করেনি। সুহাসের ভক্তিশ্রদ্ধার সুযোগ নিয়েছে নারায়ণ গোস্বামী। স্বপ্নের দাম্পত্য তার ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। বাইরের পৃথিবীর প্রতি টান ও ডিপ্লোম্যাট হবার ইচ্ছা যেই নারায়ণ গোস্বামী টের পেয়েছে অমনি তাকে বেঁধেছে। পুরুষ সে বন্ধনে বারবার বাঁধতে চায় নারীকে। মাতৃত্বের বন্ধনে। একে একে জন্ম হয়েছে লাল, বিল, নীল, ফুল, দুল। বাঁধন যখন অসহ্য নারায়ণ গোস্বামীর প্রবৃত্তির তাড়না যখন অদমনীয় তখন এক যৌবনবতী মেয়ে ময়নাকে এনে দেয় সুহাসিনী। সুহাসিনী এরকম করতে পেরেছে বা নারায়ণ গোস্বামী তা মেনে নিতে পেরেছে বলে রাজেশ্বরী বিস্মিত হলে সুহাসিনী বলে-

“আমি নাচার মা। ভালোবাসার মানে আমার কাছে অন্যরকম ছিল।”^{১০}

প্রবৃত্তির বশবর্তী পুরুষ সম্পর্কে সুহাসিনীর মনোভাব একেবারে নেতিবাচক-

“পুরুষরা নতুন সঙ্গী পেলে বেশ পুলকিত হয়, স্বরভেদেও কিছু আসে যায় না। অত মানসিক মিল, ভালোবাসা এ সবার ধার ওরা ধারে না। কিন্তু তাতেই বা উনি তৃপ্ত হতে পারলেন কই? তাই অবশেষে ভুল, এবং তুমি। ব্যাস, আমার আর ক্ষমতা রইল না, উনি আমার কাছে হেরে গেলেন।”^{১১}

সুহাসিনী মন থেকে কোনো সন্তানকে মেনে নিতে পারেনি-

“আমার একার দায়িত্বে তো কেউ জন্মায়নি। যাঁর আসল দায়, তিনি দেখুন। কাঁথা পাল্টান, কোলে নিয়ে ঘুরুন, রাত জাগুন, দুধ খাওয়ান, খেলা দিন। নিজে আরামচেয়ারে বসে পড়াশোনা

করবেন, আর বক্তৃতা দিয়ে লোক মজাবেন, আর আমি এত ক্ষমতা নিয়ে, ইচ্ছে নিয়ে ন্যায্যতায় হয়ে থাকবো এ তো হয় না! আমার একার দায়িত্বে- এতো হয়না।”^{১২}

নারায়ন গোস্বামী সুহাসিনীকে সন্দেহ করত বলে সেও সন্তানদের মেনে নিতে পারেনি। প্রতিবাদের স্থান পায়নি বলে একটু বিশেষ ছেলে নীলকে সহ্য করতে পারেনি সুহাস। কনিষ্ঠা মেয়ে রাজেশ্বরীকে দূরে ঠেলে দিলেও পরিবারতত্ত্বের নিষ্ঠুর জিন ভাঙা মেয়ে রাজেশ্বরী তার কাছে মূল্যবান। সুহাসিনী বলে-

“পরিস্থিতিকে তুমি বরাবর অগ্রাহ্য করে গেছো। কোনও কিছুর জন্যে বসে থাকোনি তো মা। তোমার লেখাপড়া একটার পর একটা জীবিকা টিকে থাকবার জন্যে, সব পার করে নিজের কাজটা চিনতে পারা, সেই কাজের মধ্যে সসম্মানে থাকা-এ সব তো নতুন, একেবারে নতুন জিনিস! কটা মানুষ ভাবতে পারে এ ভাবে? একটা ভুল মানুষকে জীবন থেকে ঠেলে সরিয়ে দেবার জন্য তুমি কী কষ্টটাই না করলে! তারও পরে, তুমি মাতৃস্নেহে মানুষ করতে পারলে ওই সাহেবজাত ছেলেকে। খুকু এখানে তোমার আমার ওপর জিত।”^{১৩}

সুহাসিনী নারী। সাহেবের মন মানসিকতা তার কাছে স্পষ্ট। সাহেবের সম্পত্তি যে তাদেরই আত্মস্থ করা একথা বুঝতে তার অসুবিধা হয়নি। মফস্বল আদালতের সামান্য রোজগার করা উকিল সাহেবের একমাত্র প্রেম রাজেশ্বরী। কিন্তু প্রেমের আড়ালের সত্য উদঘাটন করেছে সুহাসিনী-

“তবে জেনে রেখো খুকু প্রেম ট্রেম নয়, লোকটা বিকারগ্রস্ত। ওর বাবা ছিলেন বিশুদ্ধ প্রেমিক। যা পাওয়া যায় না তা কখনো চাইবার কথা স্বপ্নেও ভাবেননি। ও একটা মূর্খ, ভণ্ড। ও আমাকেও চেয়েছিল, তোমাকেও চেয়েছিল। না পেয়ে ক্রমাগত টাকা চাইতে লাগল।”^{১৪}

সুহাসিনীর প্রতি লোকের আকর্ষণ ছিল প্রবল। কিন্তু নারায়ণ গোস্বামীর মতো প্রেমিক পেয়ে তার মন আর ধরেনি কোথাও। কিন্তু যখনই সুহাসিনী দেখলো সবটাই মিথ্যে, মেকি তখনই ‘বর্ন ডিপ্লোম্যাট’ দেওয়ানের মেয়ে সুহাসিনী পরিবারের বিষয় সম্পত্তি অধিকার করার, নিজেকে সবার উপরে প্রতিষ্ঠা করার বাসনায় ম্যানেজমেন্ট শিখে নিয়েছে। কৌশলে সাহেবকেও বেঁধেছে। সাহেবের দুর্বলতা বুঝতে পেরে মেয়ে রাজেশ্বরীর সঙ্গে তার বিয়ে দিয়েছে।

ফুলেশ্বরীকে ভালোবাসতো সুহাসিনী। যখন দেখে ফুলেশ্বরী এম এ পাশ করেও পরিবারতত্ত্বের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে তখনই মুখ ফিরিয়েছে। সুহাসিনী নিজের অদম্য এগিয়ে চলা আবিষ্কার করেছে রাজেশ্বরীর মধ্যে।

উপন্যাসে জীবন সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত আর এক নারী চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। সে জারিনা। ফুলেশ্বরীর ছেলে চয়নের স্ত্রী। বারাজনা। নাটক, সিনেমায় অভিনয় করে। রাজেশ্বরীর লেখা নব্বাজাতীয় রচনার রূপান্তরিত সিনেমায় অভিনয় করে খ্যাতি অর্জন করেছে। তার মনের কোটরে বাসা বেঁধে থাকা আকুলতাকে আবিষ্কার করেছে রাজেশ্বরী। যে আকুলতায় ভর করে জারিনা এগিয়ে যেতে চায় জীবনের পথে। যেখানে চয়নের সম্পর্ক তার কাছে ম্লান। আসলে নির্যাতন, বঞ্চনা ও যন্ত্রনার কষ্টিপাথরে সে হয়ে উঠেছে প্রগতিশীল নারী। পরপর দুটো ডিভোর্স করেছে সে। তাই সে সকলের দৃষ্টিতে বারাজনা। তাকে তার মতো মেনে না নেওয়ার সমস্ত প্রকার বাধা সে অতিক্রম করতে চায়। তাই চয়নের প্রতি তার টান ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর। পরপর দুটো ডিভোর্স করেছে সে। ডিভোর্স বিষয়ে রাজেশ্বরীকে স্পষ্ট জানিয়েছে-

“ছোটমাসি ডিভোর্স তো আপনিও করেছেন, কেন মেয়েদের ডিভোর্স করতে হয়, জানেন না?”^{১৫}

এ জিজ্ঞাসাই রাজেশ্বরীর কাছে তাকে বিশেষ করে তুলেছে। রাজেশ্বরী জারিনের মধ্যে আলোক সন্ধানী মন আবিষ্কার করেছে।

জারিনের বাবা-মা মৃত। মায়ের মৃত্যুর পর বাবার কাছে থাকত। বাবা মদ খেলে অমানুষ হয়ে যেত। মারত। অকথ্য ভাষায় গালাগাল করত। স্কুলের হেড মিসট্রেসের কাছে কাতরভাবে আশ্রয় চাইলেও কোন সুরাহা হত না। বাবা গাড়ি চাপা পড়ে মারা যাওয়ার পর সে পরিচয় পর্যন্ত দেয়নি। চাপ সামলাতে না পেরে এগিয়ে চলার বাসনায় ‘উটপাখি’র পরিচালক, প্রযোজক বিপত্তীক অর্ধেন্দুদার কাছে আশ্রয় নেয়। বাড়ির সব কাজ, সেক্রেটারির সব কাজ করে দিত সে। বদনাম থেকে বাঁচতে, আর অর্ধেন্দুদাকে বাঁচাতে বিয়ে করে সে। অর্ধেন্দুদার সঙ্গে বিয়ে টিকল না যখন দ্বিতীয় বিয়ে। সেখানে অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচতে ডিভোর্স। রাজেশ্বরীকে বলে-

“আমি এখন বুঝছি বিয়েটিয়ে আমার জন্যে নয়। একাকিত্বই আমার নিয়তি।”^{১৬}

বন্ধুহীন, অভিভাবকহীন, নেগেটিভ বিয়ের শিকার জারিন বয়সে ছোট চয়নকেও ছাপিয়ে এগিয়ে যেতে চায় জীবনের পথে।

ঔপন্যাসিক নারীকে দিতে চান মুক্তির স্বাদ। এ মুক্তি নারীর ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠায়। যার জন্য প্রজন্মের পর প্রজন্ম চলে সংগ্রাম। ঔপন্যাসিক উপন্যাসের শেষে জীবনের পথে এগিয়ে চলাকে গুরুত্ব দিয়েছেন তাঁর নিজস্ব কখন রীতিতে। উপন্যাসের শেষে তিনি বলেছেন-

“অশীতিপর এক যুবতী যিনি লাগাম আর জিনের দিক থেকে ক্লাস্তিহীন মুখ ফিরিয়ে গেছেন, কিন্তু মুক্তি পাননি, উনচল্লিশ বছরের তাঁর মেয়ে যে ছিঁড়ে ফেলেছে লাগাম, মুখ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে তবু পরেনি, ছুড়ে ফেলে দিয়েছে জিন রেকাব লেজের এক একটা ঝাপটায়, আর মধ্য বিশের আমার এই কন্যা যে লাগাম দেখবামাত্র তাকে চিনতে পেরেছে। আমি তার বাঁকানো গ্রীবার ওপর হরষিত রোমরাজি দেখতে পাচ্ছি। এত এতকাল পরে আমার পরিবার পূর্ণ হল। তীব্র হ্রেষা শুনতে পাই। এখন গভীর রাত। কোথায় চিল? কোথায়? এ সেই আসল অশ্বিনীর আকাশ ভরা হ্রেষা। সে ছুটছে, তীব্র নীল জিজীবিষায় ছুটে যাচ্ছে অরণ্যের পর অরণ্য নক্ষত্রের পর নক্ষত্র, আরও ছায়াপথ আরও নীহারিকার রূপোলি নির্জন, দশ দিকে দিগুনাগেদের উদ্ধত তর্জন বিশাল বিশাল লাফে পার হয়ে... ছুটছে।”^{১৭}

বাণী বসু একজন নারী। তিনি তুলে ধরেছেন নারীর অস্তিত্বের সত্য। একজন নারীর নিজস্ব সত্তা যেখানে অবহেলিত নয়। মুক্তিকামী নারী সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে ঘটে চলা অন্যায়-পীড়ন-অত্যাচার প্রভৃতি ক্ষেত্রে গড়ে তোলে প্রবল প্রতিরোধ।

“এইজন্যে নারীর প্রতিবেদন আসলে সামাজিক প্রক্রিয়ার অন্য নাম। নারীচেতনা একই সঙ্গে জীবন ও জগৎ আর জীবন ও জগতে নারীর জায়মান অবস্থান সম্পর্কে যুগপৎ উপলব্ধির আশ্রয়।”^{১৮}

একথা উপন্যাসে যথাযথ ও সার্থক হয়ে উঠেছে।

তথ্যসূত্র:

১. মৈত্র, শেফালী। ‘নৈতিকতা ও নারীবাদ’। নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ জুন ২০১৭, পৃ. ২৪।

২. বসু, বাণী। ‘অশ্বযোনি’। দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, পঞ্চম সংস্করণ: জুন ২০১৯, জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬, পৃ. ২৩।
৩. তদেব, পৃ. ২৮।
৪. তদেব, পৃ. ২৮।
৫. তদেব, পৃ. ৭৪।
৬. তদেব, পৃ. ৯৫।
৭. তদেব, পৃ. ৯৭।
৮. তদেব, পৃ. ১০৫।
৯. তদেব, পৃ. ১০৭।
১০. তদেব, পৃ. ১৫৮।
১১. তদেব, পৃ. ১৫৯।
১২. তদেব, পৃ. ১৫৯।
১৩. তদেব, পৃ. ১৬০।
১৪. তদেব, পৃ. ১৬১।
১৫. তদেব, পৃ. ৬৭।
১৬. তদেব, পৃ. ১০৪।
১৭. তদেব, পৃ. ১৬৮।
১৮. ভট্টাচার্য, তপোধীর। ‘বাখতিন তত্ত্ব ও প্রয়োগ’। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা পুস্তক মেলা, ২০১০, পৃ. ৬০।



ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal

ISSN: 2454-1508

Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)

Volume- II, Special Issue, February, 2026, Page No. 110- 119

Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711

Website: <https://www.atmadeep.in/>

DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.specialissue.W.276



অপরাধ ও অপরাধী মনস্তত্ত্ব: প্রসঙ্গ সায়ন্তনী পূতভূমের বাংলা গোয়েন্দা উপন্যাস ‘সর্বনাশিনী’
আবু আসিম, গবেষক, আধুনিক ভারতীয় ভাষা বিভাগ, বাংলা বিভাগ, আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়,
উত্তর প্রদেশ, ভারত

Received: 23.12.2025; Accepted: 03.01.2026; Available online: 28.02.2026

©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license
(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

Abstract

Just as a human being gradually grows up from the postnatal stage acquiring ideals, morality, humanity, and a conscience-driven mindset, alongside this process, small initial criminal tendencies within a person also gradually give rise to crime and criminal psychology. The earliest emergence of criminological thought began in Europe, and its clearer and more complete expression was developed by several contemporary criminologists such as Cesare Beccaria, Jeremy Bentham, Enrico Ferri, Cesare Lombroso, and Raffaele Garofalo. In addition, the name of the Indian criminologist Dr. Panchanan Ghoshal deserves special mention. In his book Criminology (1963), he primarily divided criminology into three branches, among which the psycho-analytical theory under criminal psychology or psychological criminology is particularly significant. In this context, the concepts of Id, Ego, and Super Ego proposed by the renowned philosopher Sigmund Freud in his psychoanalytic theory are especially noteworthy.

As a result, the crimes committed by the criminals in the detective novel Sarbanashini (2019) by novelist Sayantani Putatunde, and the subtle psychological analysis of those crimes, form the central theme of my article. Through a descriptive and analytical discussion, I aim to present the intricate artistry of criminal psychology, one of the most important branches of criminology or criminal science, as reflected in this novel.

From the very beginning of the novel, a sense of ambiguity is created, where a recurring question arises – whether the criminal is a man or a woman. This is because in our so-called society, we are accustomed or conditioned to assume that any crime must be committed by a man. The possibility that a woman could be behind such crimes is usually considered only as an alternative or secondary thought. However, in the detective novel Sarbanashini, the criminal is ultimately identified as a woman. By utilizing her criminal psychological thinking and intelligence, she reveals her identity through her Facebook profile under the name “Sarbanashini” and commits multiple murders. Her real name, however, is Priya Bajaj. Driven by her own vengeful criminal mindset and intellect, she murders several prominent wealthy businessmen of the city. In addition, she also kills her own father Andrew Bajaj and her father-in-law Vijay Jaiswal.

Thus, in the light of overall theories and facts, through an analytical discussion of Sayantani Putatunde’s novel Sarbanashini, I will attempt to highlight criminal psychology and the nature of criminal behavior as portrayed in the narrative.

Keywords: Female Criminal Psychology, Criminology, Serial Killing, Twenty-First Century Era, Brutality, Criminology (Criminal Science)

মানুষ জন্মপরবর্তী সময় থেকে ধীরে ধীরে আদর্শ, নৈতিকতা, মনুষ্যত্ব ও বিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন মানসিকতা নিয়ে যেমন বড় হয়, ঠিক তেমনি তার পাশাপাশি মানুষের মধ্যে প্রাথমিকভাবে ছোট ছোট অপরাধপ্রবণতাও তৈরি হয়, যদিও সেই ছোট ছোট অপরাধপ্রবণতা গুলিকে মানুষের সঠিক চিন্তা, অদর্শ, মনুষ্যত্ব ও নৈতিক-মানসিকতা কিছুটা হলেও সুপ্ত করে রাখে, কিন্তু বিশেষক্ষেত্রে ওই সূক্ষ্ম অপরাধগুলিই আবার পরবর্তীতে বড় আকার ধারণও করতে পারে, যা তখন মানুষের অভ্যাস হয়ে দাঁড়ায়। আর এই অপরাধ প্রবণতা যদি একবার অভ্যাসে পরিণত হয় তাহলে অপরাধীকে ওই অপরাধমূলক আচরণ থেকে নিষ্ক্রিয় করা দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। অপরাধীদের অপরাধমূলক বিভিন্ন কার্য করার পিছনে অবশ্যই কিছু কারণ থেকেই যায়, কিন্তু তাই বলে প্রত্যেক অপরাধীরাই যে কোনো কারণ বসতই অপরাধকার্যে নিযুক্ত হয়ে থাকে সেটা একদমই ভুল ও ভ্রান্ত ধারণা ফলত। একুশ শতকীয় ঔপন্যাসিক 'সায়াস্তনী পূততুন্ডের' 'সর্বনাশিনী' (২০১৯) নামক গোয়েন্দা উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে মূলত অপরাধীদের অপরাধ ও তাদের সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বিচার বিশ্লেষণই আমার প্রবন্ধের মূল বিষয়। তাঁর বেশিরভাগ উপন্যাসগুলিতেই কঠিন বাস্তবতা ও বর্তমান সাম্প্রতিক বিভিন্ন সমাজ সমস্যার কথা উঠে এসেছে যার মধ্যে তিনি বিশেষত গোয়েন্দা উপন্যাস গুলিতে অপরাধের চাকচিক্যপূর্ণ জগত ও অপরাধীর অপরাধ-মনস্তত্ত্বকে অনবদ্যভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

মূলত 'অপরাধ' শব্দটির মধ্যে দিয়ে আইনবিরুদ্ধ বা অসামাজিক কাজকর্মকেই বুঝিয়ে থাকে। সমাজব্যবস্থার প্রত্যেকটি পদে পদে কোনো না কোন ভাবে এ অপরাধ বিদ্যমান। অপরাধের বৃদ্ধি সমাজ উন্নয়নের পক্ষে প্রবল বাধা সৃষ্টি করে ও সমাজকে অস্থিতিশীল পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দেয়। সমাজকেন্দ্রিক প্রত্যেক ব্যক্তিবিশেষের চিন্তা ও চেতনা অনুযায়ী অপরাধতত্ত্ব এমন একটি প্রকৃতি বা আচরণ যা সমাজের যে কোনো রকম নিয়মব্যবস্থা ও সংস্কৃতিকে ভঙ্গ করে। আমেরিকান অপরাধতত্ত্ববিদ 'ক্ল্যাডওয়েল' এই অপরাধতত্ত্বের ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন,

“Those acts or failures to act that are considered to be so detrimental to the well-being of a society, as judged by its prevailing standards, that action regarding them cannot be entrusted to private initiative or to haphazard methods but must be taken by an organized society in accordance with tested procedures”^১

অপরাধজগতের প্রাথমিক আবির্ভাব ও তার পুরোপুরি ধারণা প্রথম ইউরোপ গবেষণা দ্বারাই হয়েছিল এবং তার উল্লেখসাধনও এই ইউরোপের হাত ধরেই। ষোলো শতকের পরবর্তী সময় থেকে ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লব পৃথিবীর ইতিহাসের আঙিনায় দীপ্তময় জাগ্রতমূর্তি ধারণ করেছিল আর সেই শিল্পবিপ্লবের একটা প্রবল প্রতিক্রিয়া ছিল অপরাধজগতের ওপর। বিশেষতঃ ইংল্যান্ড ও ইউরোপের বাকি দেশের অর্থনৈতিক অপরাধের ওপর। আর এই অপরাধতত্ত্বের পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটালেন একাধিক অপরাধতত্ত্ববিদ যেমন- 'সীজার বেকারিয়া' (১৭৩৮-১৭৯৪), 'জেরেমি বেন্থাম' (১৭৪৮-১৮৩২), 'এনরিকো ফেরী' (১৮৫৯-১৯২৮) 'সীজার লোম্ব্রোস' (১৮৩৬-১৯০৯), 'রাফাকল্ গ্যারোফল্‌স' (১৮৫২-১৯৩৪)। এঁরা প্রত্যেকেই অপরাধ বিজ্ঞানের কালজয়ী ব্যবহারিক বিদ্যালয়ের অগ্রদূত। অপরাধজগতের বিষয়গত ধারণা ও তার গবেষণা শুধুমাত্র ইউরোপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, অপরাধের একটি পুঞ্জানুপুঞ্জ বিষয়গত ধারণাকে সামনে রেখে আমেরিকাতেও তার গবেষণা শুরু হয়। আমেরিকা অর্থনৈতিক দিক থেকে একটি উন্নত দেশ এবং তারা স্বাধীনতাকালীন সময় থেকেই নিজেদের উপর ঘটিত বিভিন্ন অপরাধের প্রত্যক্ষদর্শী। ফলত স্বাভাবিক ভাবেই এই দেশটি অপরাধবিদ্যা কেন্দ্রিক বহু বিদ্যালয় স্থাপন করতে সহায়ক হয়েছে, যাতে করে 'অপরাধশাস্ত্র' বা 'অপরাধবিজ্ঞান' গবেষণার মধ্যে দিয়ে তারা নতুন পথের দিশারি হতে পারে। আমেরিকাতে অপরাধশাস্ত্রের প্রাথমিক বা আদি ধারণার যে জন্ম

হয়েছিল তা প্রকৃতভাবে পূর্ণতালাভ করেছিল প্রধানত দু-জন অপরাধবিদের হাত ধরে তাঁরা হলেন 'এডুইন এইচ সাদারল্যান্ড' ও 'জন গিলিন'। সাদারল্যান্ড শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট উপাধি লাভ করেছেন। এই শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়কে অপরাধশাস্ত্রের উন্নতিসাধন ও অপরাধবিজ্ঞানের আধুনিক পথ প্রদর্শককারী হিসাবে দেখা হয়। এছাড়া অমেরিকাতে অপরাধশাস্ত্রের শিক্ষাদানের জন্য প্রথম পাঠ্যবই সংকলিত হয় ১৯৮১ সালে, যা 'মরিস পারমেল' রচনা করেছিলেন। অর্থাৎ, 'আপরাধশাস্ত্র' হল অপরাধবিজ্ঞানের একটি ব্যবহারিক ও গতিশীল শাখা, যা সমাজের বিভিন্ন অপরাধগুলিকে সুক্ষ্মতিসূক্ষ্ম ভাবে বিশ্লেষণ করে অপরাধের পিছনের লুকিয়ে থাকা বিভিন্ন কারণ গুলিকে সুন্দরভাবে তুলে ধরে। অপরাধশাস্ত্র অপরাধীদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য লক্ষণ ও তাদের পরিবেশকে চিহ্নিত করে। যেমন- লিঙ্গ, বয়স, বৈবাহিক অবস্থা, শিক্ষা, পেশা, অভিপ্রায়, প্রকৃতি ও মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য সমূহ ইত্যাদি।

ইউরোপ-আমেরিকারকৃত অপরাধ বিষয়ক গবেষণা থেকে জানতে পারা যায় আপরাধকেন্দ্রিক একাধিক বিভাগের প্রসঙ্গ- সামাজিকেন্দ্রিক অপরাধ, অর্থনীতিমূলক অপরাধ, রাজনীতিমূলক অপরাধ, ধর্মীয় অপরাধ, হত্যাঅপরাধ, সেইসঙ্গে বিভিন্ন যৌনঅপরাধ, পাচারকার্য মূলক অপরাধ ও কিশোর অপরাধ ইত্যাদি। কিন্তু এক্ষেত্রে আবার ভারতীয় অপরাধতত্ত্ববিদ 'ডঃ পঞ্চগনন ঘোষাল' তিনি তাঁর 'অপরাধবিজ্ঞান' (১৯৬৩) নামক বইটিতে বলেছেন,

“ক্রিমিনোলজি পৃথিবীর সর্বদেশে মূলত একরূপ হলেও দেশভেদে কিছু বিষয়ে তাদের মধ্যে পার্থক্য থাকে। আমাদের অপরাধীরা সামাজিক অবস্থা ও ব্যবস্থার অপফল তথা বাইপ্রোডাক্ট। এজন্য যুরোপের পরিপ্রেক্ষিতে যুরোপীয়দের দ্বারা রচিত অপরাধতত্ত্ব প্রতিটি ক্ষেত্রে এদেশের উপযোগী নয়। মনস্তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক অপরাধতত্ত্বের মত ফরেনসিক বিদ্যা সম্পর্কেও এই মতবাদ কম বেশি প্রযোজ্য। এই গ্রীষ্ম প্রধান দেশে জলবায়ুর পৃথক প্রভাবের জন্য এরকম হয়ে থাকে। এই কারণে আমাদের নিজেদের অপরাধবিজ্ঞান নিজেদের গড়ে নিতে হবে।”^২

অর্থাৎ, তাঁর 'অপরাধবিজ্ঞান' নামক বইটিতে ক্রিমিনোলজির বিভিন্ন বিষয়গুলিকে খুব সুন্দরভাবে উদাহরণের মাধ্যমে তুলে ধরে আলোচনা করা হয়েছে। সেইসঙ্গে অপরাধবিজ্ঞানকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন- মনস্তাত্ত্বিক অপরাধ তথা ক্রিমিন্যাল সাইকোলজি, ব্যবহারিক অপরাধ-বিজ্ঞান তথা এপ্লায়েড ক্রিমিনোলজি এবং ফোরেনসিক সায়েন্স। এর মধ্যে প্রধানত মনস্তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক বিভাগ দুটির ওপরে কিছুটা বেশি গুরুত্ব দিয়ে তিনি বলেছেন,

“ব্যবহারিক বিভাগ বাহিরের এবং মনস্তাত্ত্বিক বিভাগ অন্তরের বিষয়। প্রথমটিতে দেহ মনকে আর দ্বিতীয়টিতে মন দেহকে চালায়। অর্থাৎ উহাদের একটি ওদের শিক্ষা-দিক্ষা ও অভ্যাস দ্বারা বহির্জাত এবং অন্যটি তাদের অন্তর হতে মনস্তাত্ত্বিক কারণে আগত।”^৩

অপরাধ ও অপরাধীদের ক্ষেত্রে ব্যবহারিক দিকটি প্রয়োজনীয় হলেও 'মনস্তাত্ত্বিক' দিকটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ এবং অপরাধীদের ক্ষেত্রে প্রধানত মনস্তাত্ত্বিক বিষয়টির উপর জোর দেওয়াই শ্রেয়। এই মনস্তাত্ত্বিক বিভাগটি আবার তিন রকমের- 'মন-সংক্রান্ত বা সাইকোজেনিক', 'মনস্তাত্ত্বিক বা সাইকোলজিক্যাল', এবং 'মন-সংক্রান্ত বিশ্লেষণধর্মী বা সাইকো অন্যালিটিক্যাল।' এখানে উল্লেখিত মনস্তাত্ত্বিক বিভাগটির মধ্যে তিন নম্বর বিভাগ তথা 'সাইকো-অন্যালিটিক্যাল' তত্ত্বটি অপরাধী মানসতত্ত্বের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। সাইকো-অন্যালিটিক্যাল বিভাগটিতে ব্যক্তির অ-প্রকাশিত 'ইগো'কে দায়ী করা হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে এই তত্ত্বের সূচনা, আর এই তত্ত্বের জন্মদাতাহলেন বিখ্যাত দার্শনিক 'সিগমুন্ড ফ্রয়েড'। একথা ঠিক

যে ফ্রয়েড সম্পূর্ণভাবে কোনো অপরাধ তত্ত্বের নির্মাণ করেননি, কিন্তু মন-বিশ্লেষণের আলোচনায় ‘ইড’, ‘ইগো’ এবং ‘সুপার ইগো’ ধারণার উপস্থাপন করে সতন্ত্রভাবে একটি বিষয় বর্ণনা করেন যা মানুষের অপরাধ প্রবণতার কারণ নির্ধারণ করতে প্রবলভাবে সক্ষম। সুতরাং, ইড (Id) হচ্ছে মানুষের প্রকৃত প্রবৃত্তি বা আকাঙ্ক্ষা, ইগো (Ego) হচ্ছে বাস্তব এবং সুপার ইগো (Super Ego) হচ্ছে ব্যক্তির বিবেক বা নৈতিক বৈশিষ্ট্য। ফ্রয়েডের মতানুযায়ী সুপার ইগো সবসময়ই মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ইড কে দমন করতে চাই আর ইগো-ইডের মধ্যে সমন্বয় রক্ষা করতে চাই। ইড ও সুপার ইগো হচ্ছে মূলত ব্যক্তিত্বের অ-সচেতন অংশ এবং ইগো হচ্ছে ব্যক্তিত্বের সচেতন অংশ। তাই অপরাধ হচ্ছে মানুষের মনস্তাত্ত্বিক ও জৈবিক দিক থেকে অ-সচেতন অংশের প্রতিফলন। বস্তুত, মানুষের মধ্যে যে মূল প্রবৃত্তিগুলি আছে তার দম্বের ফলশ্রুতিতেই মানুষের অপরাধ-প্রবণতার প্রকাশ পাই ও অপরাধ ঘটে। এছাড়া, এই মনস্তাত্ত্বিক বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে আরও কিছু তত্ত্বকে অপরাধ প্রবণতার কারণ হিসাবে তুলে ধরেছেন বিভিন্ন অপরাধতত্ত্ববিদরা। যেমন ইতালীয়ান অপরাধতত্ত্ববিদ ‘সিজার ল্যাঙ্কোসে’ যাকে ‘অপরাধবিজ্ঞান’ের জনকও বলা হয় তিনি ‘জীববিদ্যামূলক তত্ত্ব’ের কথা বলেছেন। এছাড়া আর এক ইতালীয়ান অপরাধতত্ত্ববিদ ‘সিজার বেকারিয়া’ যে ‘ধ্রুপদী তত্ত্ব’ের কথাও বলেছেন।

‘অপরাধবিজ্ঞান’ বা ‘অপরাধশাস্ত্র’ের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ অপরাধীর অপরাধ মনস্তত্ত্বকে ঔপন্যাসিক ‘সয়াস্তনী পূততুন্ড’ের ‘সর্বনাশিনী’ উপন্যাসটির মধ্যে দিয়ে অপরাধীর অপরাধজগত ও অপরাধীর অপরাধ মনস্তত্ত্বের একটি সূক্ষ্মতিসূক্ষ্ম বর্ণনাত্মক বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যেখানে গোয়েন্দা অফিসার রথীন দাশগুপ্তকে বলতে শোনা যায়

“অন্যদার ডেথ ফোরকাস্ট! এই নিয়ে তিন নম্বর! খুন কে হবে জানা গেছে। কিন্তু ভগবানই জানেন লাশটা কবে বা কোথায় পাওয়া যাবে!....এরকম খুনী আমি নিজের কেরিয়ারে বাপের জন্মেও দেখিনি! প্রত্যেকবার খুন করার আগে ফেসবুকে ফোরকাস্ট করছে মেয়েটা! সরি, সরি! মেয়ে কিনা স্পষ্ট জানি না। পুরুষও হতে পারে। কিন্তু ফেসবুক প্রোফাইলে একটা মেয়ের ছবিই দেওয়া আছে! পুলিশও সন্দেহ করছে যে, কোনও মেয়ে এর সঙ্গে ডেফিনিটলি যুক্ত আছে। আর সে কি না একটা লোকের মরার আগেই মৃত্যুর ফোরকাস্ট করে বসে থাকে! অথচ কেউ কিছু করতেই পারছে না! এ তো ওপেন চ্যালেঞ্জ!”^৪

উপন্যাসের প্রথম থেকেই একটি ধোঁয়াশাচ্ছন্ন পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। যেখানে একটি প্রশ্ন বার বার উঠে আসছে অপরাধী একটি পুরুষ নাকি নারী? কারণ আমাদের সামনে যে-কোনো রকমের অপরাধ ঘটলে তথাকথিত ভাবে সেই অপরাধের পিছনে একজন পুরুষই থাকতে পারে এই ভাবনাতেই আমরা অভ্যস্ত। সেই অপরাধের পিছনে যে একটি নারীও থাকতে পারে সেটা আমরা দ্বিতীয় বা বিকল্প ভাবনা হিসাবে রাখি না। যদিও বর্তমান সমাজে বেশিরভাগ অপরাধের পিছনে পুরুষদের ভূমিকায় বেশি দেখা যায়, কিন্তু ঔপন্যাসিক সায়াস্তনী পূততুন্ডের এই সর্বনাশিনী উপন্যাসটিতে অপরাধী হিসাবে সনাক্ত করা হয়েছে একজন নারীকেই যে নারী তার অপরাধীমূলক মনস্তাত্ত্বিক চিন্তা ও বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে একাধিক খুন করে গেছে এবং সে তার ফেসবুক প্রোফাইলটির নাম দিয়েছে ‘সর্বনাশিনী’। কিন্তু এই নারী ও পুরুষ অপরাধীদের অপরাধমাত্রার তুলনা প্রসঙ্গে অপরাধতত্ত্ববিদ ‘পঞ্চগনন ঘোষাল’ তাঁর ‘অপরাধবিজ্ঞান’ গ্রন্থে বলেছেন,

“সাম্প্রতিক কালে কয়েকটি পেনাল সেটেলমেন্ট সমীক্ষা ও পরীক্ষা করে মাত্র পুরুষ অপরাধীদের মধ্যে একপ্রকার এগ্রেসিভ ক্রোমোসোমের সন্ধান পাওয়া গেয়েছে। উহা এখন পর্যন্ত স্ত্রী অপরাধীদের মধ্যে পাওয়া যায়নি। এই এগ্রেসিভ ক্রোমোসোম না থাকতে নারীদের

মধ্যে হত্যাকার্য ডাকাতিদি আক্রামনাত্মক কম। তবে কদাচিৎ কোন পুংশলী নারীর মধ্যে উহা থাকতে পারে।”^৫

যে কোন অপরাধের পিছনে অপরাধী হিসাবে একটি পুরুষ না কি একটি নারী-মনস্তত্ত্ব কাজ করছে সেটা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে বিবেচিত। কারণ অপরাধী নির্বাচনের ক্ষেত্রে অপরাধীর মনস্তত্ত্ব জানাটা খুবই প্রয়োজনীয় আর সেই মনস্তত্ত্ব বুঝতে গেলে সেই অপরাধীর লিঙ্গ পরিচয় সম্পর্কে জ্ঞাত থাকা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। উপন্যাসটিতে প্রকৃত অপরাধী হিসাবে একজন নারী চরিত্রকেই পেয়েছি, যার আসল নাম ‘প্রিয়াবাজাজ’। যে একের পর এক নিজস্ব প্রতিহাংসামূলক অপরাধী চিন্তা-বুদ্ধি দ্বারা শহরের নাম করা বিত্তমান ব্যবসায়ী পুরুষদের হত্যা করেছে যাদের স্ত্রীরা দেখতে অসুন্দর ও কৃষ্ণবর্ণা বলে তাদেরকে ছেড়ে অন্য নারীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখে, নিজের স্ত্রী দেখতে সুন্দর নয় বলে তার উপর অত্যাচার করে, নিজের পরিবার ছেলেমেয়ের খোঁজ রাখার প্রয়োজন মনে করে না, বিশেষকরে তাদেরকেই বেছে বেছে হত্যা করা হয়েছে। আর সে টাকাওয়ালা বিত্তবান ব্যবসায়ী পুরুষেরা হল সঞ্জীব রায়চৌধুরী, অর্জুন শিকদার ও ব্যবসায়ী বিজয় জয়সওয়ালের মত লোকেরা। এছাড়াও তার হাতে খুন হওয়া ভিকটিমদের মধ্যে নিজের বাবা অ্যাড্ভু বাজাজ ও নিজের শ্বশুর বিজয় জসওয়ালও আছে। এছাড়া সঞ্জীব রায়চৌধুরী ও অর্জুন শিকদার এরা দুজনে সাংঘাতিক নামকরা বিজনেসম্যান না হলেও, যথেষ্টই বিত্তবান। তারা যতটাই গুনবান ব্যবসায়ী ছিল ঠিক ততটাই সর্বগুণহীন ও চরিত্রহীন ছিল। মদ ও মেয়ের একনিষ্ঠ সাধক। তাদের জীবনে একের পর এক নারী এসেছে। এই প্রবল নারী আসক্তিটিকে কাজে লাগিয়ে তাদেরকে নিজের প্রেমের ফাঁদে ফেলে ও পরে তাদেরকে নিজের কাছে ডেকে নিয়ে এসে প্রথমে তাদের সঙ্গে সেক্সচুয়াল ইন্টারকোর্স করে তারপর তাদের শরীরে ‘অ্যামাটক্সিন’ নামক বিষ প্রয়োগ করিয়ে দেয়, যে বিষটি মানুষের শরীরে গেলে সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু হয় না, সময় নিয়ে তিলে তিলে যন্ত্রনা মধ্যে দিয়ে মৃত্যু হয় এবং ভিকটিমের মৃত্যু ঠিক কী কারণে হয়েছে সেটাও বোঝা মুশকিল, তাই ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ স্পষ্টভাবে জানিয়েছিলেন যে

“সঞ্জীব রায়চৌধুরীর মৃত্যুর মধ্যে কোনও অস্বাভাবিকতাই নেই! তাঁর মৃত্যুর কারণ ম্যাসিভ লিভার ড্যামেজ, অ্যাকিউট হেপাটিক ও রেনাল ফেইলিওর। তার পাকস্থলীতে কোনওরকম খাদ্য ছিল না। দেহের কোথাও কোনওরকম বিষের অস্তিত্বও পাওয়া যায়নি।”^৬

ঠিক এরকমভাবে অর্জুন শিকদারেরও মৃত্যু হয়েছে এবং মৃত্যুর পর সকল ভিকটিমদেরকে বিভিন্ন জায়গায় ডাম্প করা হয়েছে।

“কলকাতা পুলিশ বাইপাসের গুনশান এলাকায় একটা মৃতদেহ উদ্ধার করে। মৃতদেহটিকে দেখলেই বোঝা যায় যে মৃত ব্যক্তি খুব সাধারণ মানুষ নয়। লাশের পরনের দামি পরিচ্ছেদ, হাতের লাখখানেক বিদেশী ঘড়ি, দামি রত্নখচিত আংটি, দামি মোবাইল এবং সর্বোপরি মানুষটির অভিজাত চেহারা স্পষ্ট বলে দেয় যে লোকটি রীতিমত অর্থবান! অথচ সেই লোকটির লাশ এরকম বেওয়ারিশ অবস্থায় বোপের মধ্যে পড়ে আছে!”^৭

মানুষের মেজাজ একবার উন্মাদ বা ক্ষিপ্ততায় পরিণত হলে তারা একদিক থেকে যেমন মানসিক ভাবে ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ে ঠিক তেমনি অন্যদিক থেকে তারা নৈতিকতাহীন মানসিকতায় আরো বেশি হিংস্র হয়ে যায়। সেই উন্মাদ বা হিংস্র হওয়ার পিছনে তার যত খারাপ বা খোঁয়াসাচ্ছন্ন জীবনই থাকুক না কেন, সেটা আর কারোর দৃষ্টিগোচরে আসে না, বিশেষত আইনের দৃষ্টিতে একদমই না। তার পিছনে যে Motive থাকুক না কেন, যেটা ক্রাইম সেটা ক্রাইম। অপরাধী প্রিয়া বাজাজের হাতে খুন হওয়া তার সমস্ত ভিকটিমদের মধ্যে সর্বপ্রথম নিজের বাবা অ্যাড্ভু বাজাজকে নিজের হাতে খুন করে তার দেহটিকে তাদের বাড়িতেই পুঁতে দিয়েছিল।

তার বাবা অ্যাড্ভু বাজাজ তার মা অহল্যা বাজাজের ওপর দিনের পর দিন অবহেলা ও অকথ্য অত্যাচার করতো শুধুমাত্র তার মা দেখতে ময়লা বা অসুন্দর ছিল বলে। তার কাছে নিজের স্ত্রীগুণ ও ভালোবাসার পরিবর্তে সৌন্দর্যটাই তার কাছে অধিক প্রাধান্য পেয়েছিল। মেয়ে প্রিয়া বাজাজ এসব অত্যাচার নিজের চোখে দেখতে দেখতে বড়ো হয়েছিল। বাবা অ্যাড্ভু বাজাজ স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও নিজের বাড়িতে অন্য নারীদের নিয়ে এসে তাদের সঙ্গে মেতে থাকত, মা অহল্যা বাজাজ বছরের পর বছর এসব কষ্ট চুপ করে সহ্য করে যেতো এবং একদিন ছোট মেয়ে রিয়া বাজাজকে জন্ম দিতে গিয়ে তার মৃত্যু হয়। পরবর্তীতে অ্যাড্ভু বাজাজ তার মেয়েদের ওপরও প্রচণ্ড মার-ধর ও অত্যাচার করতে লাগলো এবং একদিন মেয়ে প্রিয়াবাজকেই মেরে বাড়ি থেকে রাস্তাই ফেলে দিয়ে এসেছিল কিন্তু, প্রিয়া বাজাজ সে-সময় প্রাণে বেঁচে গেলেও তার স্মৃতিশক্তি হ্রাস পায়। যদিও পরবর্তীতে ধীরে ধীরে সে ঠিক হলে একদিন প্রিয়া বাজাজই তার বাবা অ্যাড্ভু বাজাজকে নিজের হাতে হত্যা করলো-

“চোখের পলকে সামনের টেবিল থেকে তুলে নিল তুরস্কের সেই কুখ্যাত ছুরি! মিঃ বাজাজ কিছু বোঝার আগেই তার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছে মেয়েটা। পাগলের মতো কোপের পর কোপ মারতে মারতে বলল ‘শয়তান! স্কাউন্ড্রেল! আমাদের সবার লাইফ নষ্ট করেছে তুমি....। কী ভেবেছ? তুমি ডিক্টেটর? যা বলবে, যা করবে সব চুপচাপ সহ্য করতে হবে? ইউ বা-স্টা-র্ড !... নে!..নে...এই নে!’”^৮

ছুরির আঘাতে শুধুমাত্র কেঁপে উঠেছিল তার নিখর দেহটি, তার মুখ দিয়ে একটা কাতরোক্তি বা সামান্য শব্দটুকু করারও সুযোগও পাননি শুধু কাত হয়ে পড়লেন আরামকেন্দারার ওপরে। প্রিয়া বাজাজ নিজের মায়ের অত্যাচার ও যন্ত্রনার প্রতিবাদস্বরূপ তার বাবাকে নিজের হাতে খুন করার পর তার মেজাজ আর ক্ষিপ্ত বা উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল, কারণ যখন দেখল যে বাড়িতে তার বিয়ে হয়েছে সে বাড়িতেও সেই একই অত্যাচার ও অবহেলার স্বীকার তার নিজের শাশুড়িমা। ভাগ্যক্রমে তার মায়ের নামেই নাম তার শাশুড়িমার। তার জীবনে আর এক অহল্যার প্রত্যাবর্তন। ঠিক তার নিজের মায়ের মতই কৃষ্ণাঙ্গী, গুণী, ব্যক্তিত্বময়ী গৃহিণী। প্রিয়া বাজাজ নিজের মা কে হারিয়ে তার বদলে পেয়েছিল সমগুণ সম্পূর্ণ আর একজন মা'কে। কিন্তু যখন দেখলো তারও ঠিক সেই একই অবস্থা ঠিক তখনি তার মাথায় পুনরায় রিভেঞ্জের নেশা চড়ে বসল আবার তার সুস্থ মস্তিষ্ক উন্মাদী হয়ে উঠলো এবং সে ঠিক করেছিল কিছুতেই সেই একই অন্যায় আর হতে দেবে না। ফলত তার শ্বশুর ডঃ বিজয় জয়সওয়ালকেও খুন হতে হল তার হাতে। আর অন্যদিকে সঞ্জীব রায়চৌধুরী ও অর্জুন শিকদারকেও ঠিক একই স্বভাবের কারণে তাদেরকেও খুন হতে হল। ফলত এই হত্যালীলাকে ‘সিরিয়াল কিলিং’ এর নাম দিয়ে এই মনস্তাত্ত্বিক খেলাটাকে খুব সুন্দর ভাবে খেলতে চেয়েছিল।

একজন অপরাধীর পারফেক্ট ক্রাইম করার পিছনে তার চিন্তা-চেতনা, সু-পরিকল্পনা ও সুক্ষ ভাবনারও বিশেষ গুরুত্ব রাখে। যদিও কোন ক্রাইম কখন ‘পারফেক্ট ক্রাইম’ হয় না। তবুও অপরাধীরা তাদের মনস্তত্ত্বকে সঠিক ভাবে কাজে লাগানোর চেষ্টা করে, যে ভাবে উপন্যাসের অপরাধী নারী চরিত্র প্রিয়া বাজাজও নিজের মনস্তত্ত্বকে কাজে লাগিয়েছে। প্রিয়া বাজাজ প্রত্যেক ভিকটিমকে খুন করার সময় খুব নিখুঁত ভাবে প্লান করেছেন। বিশেষকরে নিজের শশুরকে হত্যা করার সময় পুলিশ আগেই স্টেপ নিয়ে নেবে সেটা সে জানত, তাই সে দাবাড়ু চাল দেওয়ার মত করে জুয়েলারী বিজয় জয়সওয়ালকেই কিডন্যাপ করে নিয়েছিল, যাতে করে পুলিশ বুঝতে পারে যে অপরাধী জুয়েলারী বিজয় জয়সওয়ালকে খুন করতে চলেছে, তাহলে পুলিশ জুয়েলারী বিজয় জয়সওয়ালকে খুঁজবে বা তার দিকে পুলিশের নজর থাকবে আর সেই সুযোগে অপরাধী খুব সহজেই ডঃ বিজয় জয়সওয়ালকে খুন করতে পারবে। ফলত সেটাই হল, অর্থাৎ ডঃ বিজয় জয়সওয়াল খুন হয়ে গেল আর

জুয়েলারী বিজয় জয়সওয়ালকে ড্রাগ দিয়ে শুধুমাত্র অর্থচেতন অবস্থায় ছেড়ে দিয়েছিল। 'অ্যামাটক্সিনে'র মত বিষের ব্যবহার অপরাধীকে অনেকটাই পরিকল্পনাপ্রবন, সূক্ষ্ণচিন্তন ও বুদ্ধিমান হিসাবে চিহ্নিত করে।

সর্বনাশিনী ওরফে প্রিয়া-বাজাজ, যে বছরের পর বছর ধরে দেখে আসা তার বাবার বর্ণবিদ্বেষীমূলক মনভাব ও তার মায়ের প্রতি সেই অত্যাচার ও অবহেলার দৃশ্যগুলিকে সে কখনই ভুলতে পারেনি আর শুধু প্রিয়াবাজাজ কেন কোনো মেয়ের পক্ষেই সম্ভব নয় এসব ভুলে যাওয়া। সুতরাং সে বারবার সুন্দরের বিরোধীতা করেছে, যা কিছু সুন্দর সে সবকিছু তার কাছে অসহ্য হয়ে উঠতো, দাবা খেলার সময় পর্যন্ত সাদা ঘুঁটি ও কালো ঘুঁটির মধ্যে কালো ঘুঁটিকেই পছন্দ করেছে আবার সে যখন নিজেই দাব খেলতে বসেছে তখন সে সাদা ঘুঁটি নিয়ে খেলেছে এবং কালো রানিকে জিতিয়েছে। এছাড়াও সে নিজের হাতে ট্যাটু বানিয়েছিল সেখানেও দেখা গিয়েছিল সেই সাদা-কালো বর্ণের গোপন মনস্তত্ত্বের প্রকাশ। অপরাধী প্রিয়াবাজাজ তার হাতে 'রেড-ব্ল্যাক স্পাইডারম্যান' ট্যাটু বানিয়েছিল। এ স্পাইডারম্যান ট্যাটুর বিষয় প্রসঙ্গে এই কেসের ভারপ্রাপ্ত সি.আই.ডি অফিসার 'অধিরাজ ব্যানার্জি' তার টিমের অন্যান্য অফিসারদেকে বলেছেন সর্বনাশিনীর গভীর মনস্তত্ত্বের কথা

“একবার স্পাইডারম্যানের কনসেপ্ট থেকে বেরিয়ে আসুন তবেই বুঝবেন। স্পাইডার ম্যান সুপার হিরো। কিন্তু যদি তাকে নজর আন্দাজ করেন তবে কী পাবেন? একটা লাল কালো রঙের মকড়সা! লাল কালো কবিশ্বনেশনের অনেক মাকড়সাই আছে। কিন্তু আমার পাপী মনে একটা বিশেষ মাকড়সারা পুরুষ মাকড়সাদের সঙ্গে সেক্স করে মেরে ফেলে! আমাদের সর্বনাশিনীও ঠিক সেই কাজটিই করেছেন! তার প্যাটার্নও সেই এক। পুরুষদের সঙ্গে সেক্স এবং খুন!”^{১৬}

এছাড়াও প্রিয়াবাজাজ নিজেও দেখতে খুব সুন্দরী তার বাবার মতোই। তার বাবা অ্যাড্ভু বাজাজের চেহারাও রীতিমত হ্যান্ডসাম, গায়ের রঙ সাদা ও লম্বা। সে তার বাবাকে হত্যা করলেও তার বাবার থেকে পাওয়া সে সৌন্দর্য তাকে ছেড়ে যায়নি, সে এ সৌন্দর্যকে মুছে দিতে চেয়েছে, কোনো অস্তিত্ব রাখতে চাইনি। তাই সে প্রতিনিয়ত নিজের রূপ-সৌন্দর্যের যত্ননাকে মেনে নিতে পারতো না।

“সে সামনের আয়নার দিকে তাকায়। আচমকা মনে হল, সেই বিশ্বাসঘাতক পুরুষটা ওর ঠিক পেছনেই এসে দাঁড়িয়েছে। ওর পিছনে তারই ছায়া! সুন্দর কোমল মুখটা শক্ত হয়ে ওঠে। এখনও তাকে ছেড়ে যায়নি সে! আজও ঠিক তেমনি আছে। সেই ঘৃণিত লোকটা!”^{১৭}

সে বিদ্যুৎগতিতে উঠে দাঁড়িয়ে একটা ওড়না দিয়ে বন্ধ উন্মাদের মতো আয়নাটা মুছে ফেলতে থাকে, তার মনে হয়েছে ‘ওর বিন্দুমাত্র অস্তিত্ব রাখা যাবে না। পুড়িয়ে ছারখার করতে হবে নয়তো বারবার জিতে যাবে সাদা রাজা! কালো রানির হার নিশ্চিত! হেরে যাবে ওর সমস্ত সুভাকাঙ্ক্ষা, হেরে যাবে শুভবুদ্ধি। যেটুকু মমতা বুকে এখনও লুকিয়ে আছে সেটুকুও হারিয়ে যাবে। হৃদয় নিংড়ে শুধু ঘৃণাই দিয়ে যাবে ও আজীবন!’ তাই সে তারা বাবার সৌন্দর্যের কোনোরকম ছায়া যাতে না থাকে তাই সে নিজের মুখের কসমেটিক সার্জারি করে নিজের সুন্দর চেহারাকে বদলে কুৎসিত রূপই গ্রহণ করেছিল কিন্তু তার গায়ের সাদা রঙের তো পরিবর্তন করা যাবে না, তাই সে ঠিক করেছিল এ সৌন্দর্য যত্ননা বোঝা সারাজীবন বয়ে বেড়ানোর থেকে নিজের জীবন না রাখাই ভালো তাই সে নিজেকেও মেরে ফেলতে চেয়েছিল। যদিও শেষ মুহূর্তে অফিসার অধিরাজ ব্যানার্জি ও তার টিম এসে অপরাধী প্রিয়া বাজাজকে বাঁচিয়েছিল। তখন তাকে বলতে শোনা গিয়েছিল

“নিজেকে নয়, ঐ শুয়োরের বাচ্চাটাকে মারতে চেয়েছিলাম! অ্যাড্ভু বাজাজ!...ঐ কুত্তাটার মতো দেখতে হয়েছি যে! মহাপাপ করেছি! কসমেটিক সার্জারি করে মুখটাকে পালটাতে পেরেছি। কিন্তু স্কিন! এই সাদা চামড়া যাবে কোথায়! মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভের চাকরি নেওয়ার

পেছনেও এই একটাই কারণ! রোদে পুড়ে পুড়ে যদি চামড়াটা তামাটে হত তবে শান্তি পেতাম। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না! যতবার আয়নায় নিজেকে দেখি ততবার নিজের ওপরেই ঘেন্না হয়! ততবার নিজের পিছনে অ্যাড্জু বাজাজকে দেখতে পাই! সেই সাদা চামড়া, যার জন্য আমার মা শেষ হয়ে গিয়েছিলেন! দেখতে পা লোকটা ব্যঙ্গের হাসি হাসছে। একমাত্র আমি মরলেই ঐ লোকটা হারত। পুরো চেকমেট!”^{১১}

বিশেষত মনসিকভাবে ভারসাম্যহীন অপরাধীদের মধ্যে নিজের ভুলকে স্বীকার না করার একটা মানসিকতা তৈরি হয়, শুধু তাই নয় তারা বিভিন্ন যুক্তি তর্কের মধ্যে দিয়ে নিজেদেরকে ঠিক প্রমাণ করার চেষ্টা করে সে অপরাধী পুরুষ হোক বা নারী। আর এই উপন্যাসের প্রধান অপরাধী ‘প্রিয়া বাজাজ’ ওরফে ‘শীনা জয়সওয়াল’ ওরফে ‘অ্যালিস’ও ঠিক সেরকমই মানসিকতার পরিচয় দিয়েছে। এবং সে অফিসারদের উদ্দেশ্যে বলেছে

“বে--শ করেছি! আপনারা কী বুঝবেন! আমি চোখের সামনে নিজের মা কে একটু একটু করে রোজ মরতে দেখেছি। কিচ্ছু করতে পারিনি।... তিনি তার গোটা জীবন-যৌবন একটা অপদার্থ পুরুষকে দিয়েছিলেন। সেই লোকটার সংসারে খাটতে খাটতে মুখে রক্ত তুললেন! একজন নারীর যা গুণ থাকা দরকার ছিল তাঁর বিনিময়ে কী পেলেন? শুধু যন্ত্রণা! নিজের স্বামীর বিছানায় বসার অধিকার তাঁর ছিল না!... রোজ স্বামীর সঙ্গে অন্য নারীকে শয্যাসঙ্গিনী হিসাবে দেখাটা কী প্রচণ্ড অপমানের, কী ভীষণ যন্ত্রণার তা বোঝেন আপনারা? লোকটা তাকে বুঝিয়ে দিয়েছিল, তুমি সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় জিনিস! কেন? শুধু তার গায়ের রঙ কালো বলে! এটা কী জাতীয় ন্যায়! গায়ের রঙ কালো হলেই সে অসুন্দর? কেন? কোন শাস্ত্রে লেখা আছে? শুধু গায়ের রং কালো বলে তাঁর আর কোনও গুণই গ্রহণযোগ্য নয়!”^{১২}

বলতে গেলে এসব যুক্তি-আদর্শের পাহারের স্তম্ভ খাড়া করলেও আইন সমসময় আইনের রাস্তাতেই চলে, অপরাধ কে অপরাধ বলেই মান্যতা দেয়, সে অপরাধ ছোট হোক বা বড়। অর্থাৎ এই আইনের বিচার থেকে অপরাধী প্রিয়া বাজাজ কোনো মতেই ছাড় পাবে না, আর সে ছাড় পেতেও চাই না। এমনকী সে তার নিজের ওই অপকর্মের জন্য কোনো রকম অনুশোচনাবোধও করেনি। সে বার বার যন্ত্রনার আশ্বেপিষ্টে বেঁধে থাকা মন ও মেজাজ নিয়ে চিৎকার করে বলে গেছে ‘বে---শ করেছি, বে---শ করেছি।’ ফলত এই বিকৃত মনস্তাত্ত্বিক সমস্যায় ভুক্তভোগী অপরাধীদের এরকম আচরণই গ্রহণযোগ্য। তাকে আইনের কথা বলতে গেলে সে বলে-

“আইন দেখাচ্ছেন! কীসের আইন মশাই! আপনাদের আইন একদিকে ডিভোর্স করতে গেলে বলে সন্তানদের কথা ভাবুন, আর অন্যদিকে সেই আইন-ই এক্সট্রাম্যারিটাল অ্যাফেয়ারকে লিগ্যাল বলে! ন্যাকামি! তখন সন্তানদের কথা মনে পড়ে না? বাপ যদি মাকে ফেলে দিনের পর দিন অন্য মেয়েদের সঙ্গে ঘোরে তাহলে সন্তানদের কেমন লাগে জানে আপনাদের আইন? আমি জানি!... আইন স্রেফ দাঁড়িপাল্লা ধরানো গাফারী! আইন মানে, ব্লাডি ব্লাইন্ড ফুল!... যে বাস্টার্ডগুলোকে আমি মেরেছি, সে শালারা আমার প্রেমে পড়ে নিজেদের বৌকেই মারার তালে ছিল! আমি বাধা দিয়েছিলাম, পালিয়ে যাওয়ার লোভ দেখিয়েছিলাম বলে সেই মহিলারা এখনও বেঁচে আছে! কেন? তারা কালো বলে? সান অফ আ বিচ! সবার ছোট ছোট ছেলেমেয়ে আছে! তাদের কী অবস্থা হত? আমি আর রিয়া যেমনভাবে মেরেছি, মরছি তারাও মরত!... তাই আমিও সবকটাকে তেমনই যন্ত্রণা দিয়ে মেরেছি। বেশ করেছি শালাদের মেরেছি! ওদের এভাবেই মরা উচিত! প্রিয়া এবার আরোও হিংস্র বলে, বে---শ করেছি। ওরা যত কষ্ট পেয়েছে---- আমি ততই আনন্দ পেয়েছি! সুযোগ পেলে আরও মারতাম!”^{১৩}

ফলত উপন্যাসের এই অপরাধীর অপরাধের কারুকার্য ও তাদের চিন্তা, ভাবনা, উদ্দেশ্য ও ইচ্ছা এসব বিষয়গুলিই তাকে প্রকৃত অপরাধী হিসাবে নির্ণিত করেছে। অপরাধবিজ্ঞানের ভাষায় আমরা সকল অপরাধীকে প্রকৃত অপরাধী বলতে পারি না। একজন অপরাধীকে প্রকৃত অপরাধী হিসাবে নির্বাচন করতে উদ্দেশ্য, লক্ষণ ও তার অপরাধকার্যের দিকে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে। আর এই প্রকৃত অপরাধী নির্ণয়ের প্রসঙ্গে অপরাধতত্ত্ববিদ পঞ্চগনন ঘোষাল তাঁর 'অপরাধবিজ্ঞান' বইটিতে বলেছেন-

“প্রকৃত অপরাধীদের সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করতে উহার একটি পরিসংজ্ঞা তথা ডেফিনেশন সম্বন্ধে ধারণার প্রয়োজন আছে। মানুষ অভাবের তাড়নাতে কিংবা অবস্থাগতিকে একাধিকবার অপরাধ করলেও তজ্জন্য তার মধ্যে অনুতাপ ও লজ্জাবোধ থাকলে সে প্রকৃত অপরাধী নয়। কিন্তু সেই ব্যক্তি অনুতাপ ও লজ্জাবোধ হারানো মাত্র প্রকৃত অপরাধী হবে। আর প্রকৃত অপরাধীর মধ্যে আটটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য দেখা যায় যেমন- গুরতর, সর্ব-স্বীকৃতি, পূর্ব-কল্পিত, আদর্শহীন, অসামাজিক, জ্ঞানত, স্বার্থযুক্ত ও স্বেচ্ছাকৃত।”^{১৪}

স্বাভাবিকভাবেই উপন্যাসের প্রধান অপরাধী প্রিয়া বাজাজের মধ্যে এ বৈশিষ্ট্যগুলি প্রবলভাবে বিদ্যমান। এই প্রিয়া বাজাজ সুস্থ মস্তিষ্কে পরিকল্পিত ভাবে প্রতিহিংসা বা বদলা স্বরূপ একাধিক হত্যা করে গেছে, আর এই হত্যাকারী অপরাধীদের একটি অপরাধ স্পৃহা কাজ করে যাকে অপরাধতত্ত্ববিদ পঞ্চগনন ঘোষাল 'শোণিত স্পৃহা' নাম দিয়েছেন। যাকে ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধ বলা হয়েছে। এই শোণিত স্পৃহার দুটি ভাগ- যৌনজ ও অ-যৌনজ। খুন-যখম হচ্ছে অ-যৌনজ এবং বলৎকার-ব্যভিচার হচ্ছে যৌনজ অপরাধ। এই শোণিত স্পৃহাই সায়ন্তনী পূততুন্ডের উপন্যাসের প্রধান অপরাধীর মধ্যে দেখা গিয়েছে। এই শোণিত স্পৃহা কে 'থাস্ট ফর ব্লাড' বলা হয়েছে। বস্তুত এই অপরাধীদের শোণিত স্পৃহা সম্পর্কে ডঃ পঞ্চগনন ঘোষালের ব্যাখ্যামূলক সংজ্ঞার মধ্যে দিয়ে এই আলোচনা ইতি সমাপ্তি করবো, তিনি বলেছেন,

“মানুষ বন্য অবস্থাই নিহত জন্তু বা ব্যক্তির শোণিত পান করে তৃপ্ত হত। কালক্রমে ওই অভ্যাস পরিত্যক্ত হলেও প্রদমিত অবস্থাতে উহা আমাদের মধ্যে আজও বর্তমান। আজও কোন কোন মানুষ শোণিতাত্ত্বক অপরাধীদের মত রক্ত দর্শনে আনন্দ পায়। রক্তপান আধুনা রক্তদর্শনে পরিনত হয়েছে। বহু অপরাধী আজও রক্ত দর্শনে পরিতৃপ্ত হয়। এই জাগ্রত শোণিত স্পৃহার জন্য হত্যাকারী বিপদ অগ্রাহ্য করেও বারে বারে হত্যাশ্রমে ফিরে এসেছে। সুপ্ত শোণিত-স্পৃহা জাগ্রত হলে এইরূপ প্রায় ঘটে থাকে। উহা এভাবে প্রশমিত না করলে হত্যাকারী শান্তি পায়না।”^{১৫}

তথ্যসূত্র:

- ১) Caldwell, Robert. Criminology. University of Pennsylvania prees, Philadelphia, 1956.
- ২) ঘোষাল, পঞ্চগনন ড.। অপরাধ বিজ্ঞান। বাক-সাহিত্য প্রাইভেট লিমিটেড ৩৩, কলেজ রোড, কলকাতা ৯, প্রথম প্রকাশ-১৯৬৩, জুলাই, পৃ. ১।
- ৩) তদেব, পৃ. ১৮৯।
- ৪) পূততুন্ড, সায়ন্তনী। সর্বনাশিনী। বিভা পাবলিকেশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারী ২০১৯, পৃ. ২১।
- ৫) ঘোষাল, পঞ্চগনন ড.। অপরাধবিজ্ঞান। বাক-সাহিত্য প্রাইভেট লিমিটেড ৩৩, কলেজরোড, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ ১৯৬৩ জুলাই, পৃ. ২৫।
- ৬) পূততুন্ড, সায়ন্তনী। সর্বনাশিনী। বিভা পাবলিকেশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারী ২০১৯, পৃ. ২৩।

- ৭) তদেব, পৃ. ২২।
- ৮) তদেব, পৃ. ৪২।
- ৯) তদেব, পৃ. ৩৩৬।
- ১০) তদেব, পৃ. ১৯১।
- ১১) তদেব, পৃ. ৩২৬।
- ১২) তদেব, পৃ. ৩২২।
- ১৩) তদেব, পৃ. ৩২৬।
- ১৪) ঘোষাল, পঞ্চগনন ড.। অপরাধবিজ্ঞান। বাক-সাহিত্য প্রাইভেট লিমিটেড ৩৩, কলেজরোড, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ ১৯৬৩ জুলাই, পৃ. ১০।
- ১৫) তদেব, পৃ. ২৭।



বাণী বসুর ছোটগল্প: মধ্যবিত্তের জীবন আলোচনা

শান্তি দাস, গবেষক, বাংলা বিভাগ, রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 24.12.2025; Accepted: 03.01.2026; Available online: 28.02.2026

©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

Abstract

Bani Basu is one of the eminent fiction writers of the twentieth and twenty-first centuries. As accomplished works of art, her contemporary short stories are enriched by diverse life experiences. Globalization has brought changes in the standard of living of Bengalis. Parallel to these changes, there has been a transformation and evolution in Bengali thought. Bengali life experiences have found firm expression in narrative art.

The dynamic life of Kolkata, familiar to her since childhood, has been reflected in various ways in Bani Basu's sensibility. She has observed the impact of globalization on human life nourished by the soil and ethos of Kolkata. The irresistible obsession with the accumulation of wealth and the overwhelming attraction towards a life enriched by advertising affluence gradually engulf the Bengali middle class. They come to fix an ideal of an easily attainable lifestyle, where the foundation of values is worn and fragile. As the middle class moves from narrowness to increasing narrowness, it exiles itself to an island of loneliness. Even while surrounded by others, it carries the agony of solitude within its heart and at times is driven towards self-destruction. Yet, despite this, the Bengali middle class is not indifferent to life. In order to survive and preserve their existence, they continue to struggle for life. The short stories of Bani Basu become eloquent through their artistic depiction of this life narrative of the Bengali middle class.

In her stories such as Sujit-Mitu and Lakshmi's Panchali, Lakshmi's Resignation, Dadara, Haran-Prapti-Niruddesh, Bastu, Dhoya, and Lona, the portrayal of middle-class life makes a claim to uniqueness. In narrative style, selection of incidents, and exploration of the middle-class psyche, she maintains artistic integrity throughout. Believing that the short story is an art of its time and enriched by lived experience, her characters emerge from this conviction. All aspects of social existence receive profound respect in her writing.

Keywords: Bani Basu, middle class, Sujit-Mitu and Lakshmi's Panchali, Lakshmi's Resignation, Gyanpapi, Dadara, Haran-Prapti-Niruddesh, psychiatrist, Bastu, Jyotirmoyee Guha, Dhoya, Lona

বিংশ-একবিংশ শতাব্দীর একজন বরেন্য কথাকার বাণী বসু। সার্থক শিল্প হিসেবে তাঁর সমকালের ছোটগল্প বৈচিত্র্যময় জীবন অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ। বিশ্বায়ন বাঙালির জীবনযাত্রার মানের পরিবর্তন করেছে। এই পরিবর্তনের সমান্তরালে বাঙালির ভাবের পরিবর্তন ও বিবর্তন ঘটেছে। বাঙালির জীবন অভিজ্ঞতা কথাসিঁঙ্গে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। আবালা পরিচিত কলকাতার চলমান জীবন বাণী বসুর অনুভূতিতে নানাভাবে ধরা পড়েছে। তিনি দেখেছেন কলকাতার ভূমিরসে পুষ্ট মানবজীবনে বিশ্বায়নের প্রভাব। অপ্রতিরোধ্য বিত্ত সঞ্চয়ের নেশা ও বিজ্ঞাপনী প্রাচুর্যে

সমৃদ্ধ জীবনের প্রতি দুর্বীর আকর্ষণ বাঙালি মধ্যবিভকে ধীরে ধীরে গ্রাস করতে থাকে। তারা সহজলভ্য জীবনযাত্রার একটা আদর্শমান স্থির করে। যেখানে মূল্যবোধের ভিত্তিভূমি জরাজীর্ণ। মধ্যবিভ সংকীর্ণ থেকে সংকীর্ণতর হতে গিয়ে নিজেদেরকে একাকিত্বের দ্বীপে নির্বাসন দিচ্ছে। সবার মাঝে থেকেও একাকিত্বের যন্ত্রণা বুকে বহন করতে করতে কখনো আত্মহননে প্রবৃত্ত হচ্ছে। তা সত্ত্বেও মধ্যবিভ বাঙালি জীবনবিমুখ নয়। বেঁচে থাকার জন্য নিজেদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য তারা জীবন সংগ্রাম করছে। এই বাঙালি মধ্যবিভের জীবনকথার শৈল্পিক বর্ণনে পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছে বাণী বসুর ছোটগল্প।

বারিদবরণ ঘোষ বাণী বসুর মানব জীবন পর্যবেক্ষণ ও তা গল্পে উপস্থাপনের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছেন গল্পসমগ্রের তৃতীয় খন্ডের ‘আস্বাদন’ এ-

“বাণী বসু জীবনকে দেখেন তার মোহমুগ্ধতায় ততখানি নয়, যতখানি দেখেন নির্মমতায়, আরও স্পষ্ট করে অর্থনীতি-নির্ভর সমাজ-ব্যবস্থায়। সব সম্পর্ক ভাঙছে, চুরছে, কিন্তু তারই মধ্যে পায়ের নিচে জমিনের সন্ধানও রয়েছে।”^১

বিশ্বায়ন শুধু মধ্যবিভ মানসিকতাকে গ্রাস করেনি, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সমস্ত মানুষকে সমান করেছে; স্বাধীন মানসিকতা ও অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা দান করেছে। লিঙ্গ বৈষম্য যেখানে ক্ষীণতর। মধ্যবিভের জীবনালেখ্যের ক্যানভাস বলা যায় মধ্যবিভের জীবন সংকটকে। যেখানে মধ্যবিভের অস্তিত্ব উপলব্ধ হয়। শুভলক্ষ্মী দাশগুপ্ত বলেছেন-

“সংকটাপন্ন ব্যক্তির সিদ্ধান্ত গ্রহণের মধ্য দিয়ে অস্তিত্বের উপলব্ধি হয়। ব্যক্তির সর্বতোরকম স্বাধীন মানসিকতা অস্তিত্বের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত।”^২

বাঙালি মধ্যবিভের জীবন বর্ণনায় ‘সুজিত-মিতু ও লক্ষ্মীর পাঁচালি’ গল্পটি গুরুত্বপূর্ণ। মধ্যবিভ উচ্চবিভের জীবনচর্যায় চোখ রেখে চলে। এরকম সুজিত ও মিতু মধ্যবিভ স্বামী-স্ত্রী। সুজিতের অনেক শখ। নিজেদের বাড়ির বারান্দায় দেশি-বিদেশি ফুলের গাছ লাগায়। মালিকানা বজায় রেখে পরিচর্যার ভার চাপায় স্ত্রীর উপর। সুখস্বপ্নে বিভোর হয়ে কুকুর পোষে। রবিবারে আড্ডা দেয়, বউকে নিয়ে সিনেমা যায়, একমাত্র সন্তান টুবলুর পড়ার জন্য প্রাইভেট টিউটর দেয়, ঘরের কাজে স্ত্রীকে সাহায্য না করে একরকম আভিজাতিক উদাসীনতা বজায় রাখে। মিতুর মনও আভিজাতিক পরিবেশ চায়। খোঁজ করে কাজের লোকের। তাদের ঘরে কাজের লোক লক্ষ্মীর উপস্থিতিকে বাণী বসু সযত্নে তুলে ধরেছেন।

ঘরে কাজের লোক রাখা আভিজাতিক লক্ষণ। তাই লক্ষ্মীকে পেয়ে আত্মদে আটখানা মিতু। রবিবার আড্ডা ফেরত সুজিতকে মিতু বলেছে তাড়াতাড়ি স্নান করতে। কারণ লক্ষ্মীর খিদে পেয়েছে। আড্ডা ফেরত সুজিত বাজার থেকে নানা রকম সবজি নিয়ে এলে তাকে শুনতে হয়েছে- “কেন গো লোক বলে সে বুঝি মানুষ নয়।”^৩ এক কথায় লক্ষ্মীর তোয়াজ ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে।

লক্ষ্মী টিভি-সিনেমা দেখার ঝোঁক নিয়ে এসেছে জগবন্ধু উকিলবাবুর বাড়ি থেকে। সে যেন উচ্চবিভ ও মধ্যবিভের সংযোগ সেতু। শুধু তাই নয় মধ্যবিভকে উচ্চবিভের জীবনচর্যার নেশায় অভ্যস্ত করতে চায় সে। উচ্চ-অভিজাত বাড়ির অনুকূল পরিবেশ না পেয়ে সে কতগুলো দাবি পেশ করে-

(ক) ফ্লাস্ক-এর দাবি। শনিবার-রবিবার সিনেমা দেখার সময় তার চা করতে বিরক্ত লাগে। তাছাড়া লক্ষ্মী যেন চির সনাতন রীতির বিরোধিতা করে মিতুকে পরামর্শ দেয় বেলা চারটার মধ্যে সন্ধ্যা দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসতে।

(খ) দ্বিতীয় দাবিটি আরো গুরুত্বপূর্ণ। সকালবেলা ভাতের সঙ্গে রুটি তৈরি করতে চাইছে। রাতে রুটি গুলি একটু গরম করলেই খাওয়া যাবে।

(গ) পরোক্ষে একটা দাবি পেশ করেছিল। উকিলবাবুর বাড়ির মতো রাত দশটা থেকে সকাল আটটা পর্যন্ত দেখার জন্য ভিডিও।

একমাত্র লক্ষ্মীকে ধরে রাখার জন্য মিতু তার বিবাহ বার্ষিকীতে ‘একটা ভিডিও ক্যাসেট প্লেয়ার’ চায়। টুবলুকে নিয়ে সমস্যা হলে মিতু বলে-

“টুবলুকে না হয় টিউটোরিয়ালে দিয়ে দাও। না-কিনলে বোধহয় লক্ষ্মীকে আর রাখা যাবে না’ বলতে বলতে মিতু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে।”^৪

মিতুর একথা পাঠককে গভীর চিন্তায় ফেলে দিতে পারে। মধ্যবিত্ত ও তাদের ভবিষ্যৎ জিজ্ঞাসা চিহ্নের সামনে দাঁড়ায়।

বাণী বসু এরকম একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের পাশাপাশি মিতুর দাদা-বৌদির পরিবারকে দেখিয়েছেন। লেখক দুই পরিবারকে পাশাপাশি রেখে দেখিয়েছেন সময়ের সঙ্গে মধ্যবিত্ত কীভাবে প্রতিযোগিতা করে চলে। মিতু তাদের বাড়িতে আগত দাদা-বৌদিকে শোনায় তাদের সারা সপ্তাহের মাছ-মাংস আনা হয়েছে। তারা বাড়ি-ঘর পরিষ্কার করে পরের দিনের রান্না করে রাখবে। মিতুর দাদা তাকে শোনায় মিতুর বউদির আটচল্লিশ ঘণ্টা এগিয়ে থাকার বাতিকে তার পেটের বারোট্টা বেজে গেছে। মিতু বলেছে তাদের বাড়ির কাজের লোক টিভি দেখতে গেছে আরেক বাড়ি। লক্ষ্মী যে জগবন্ধু উকিলের বাড়ি চলে যায়নি এটাই মিতুর সৌভাগ্য। লোক থাকলেই তারা খুশি। মিতুর দাদা মধ্যবিত্তের অস্তিত্বকে ভালো করে অনুভব করেছেন। সুজিতকে বলেছেন-

“এত দিনে এগজিসটেনশ্যালিজম কথাটার মানে পরিষ্কার হল সুজিত।”^৫

মধ্যবিত্তের জীবন সংকটের গল্প ‘সুজিত-মিতু ও লক্ষ্মীর পাঁচালি’। গল্পে মিতু ও সুজিত তাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির জন্য কিরকম জীবনচর্যার অভ্যাস করছে তা বোঝাতে লেখক ‘পাঁচালি’ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। ‘পাঁচালি’ শব্দের অর্থ ‘(ব্যঙ্গে) বিরক্তিকর দীর্ঘ কাহিনি’।^৬

‘সুজিত-মিতু ও লক্ষ্মীর পাঁচালি’ গল্পের পরিপূরক গল্প ‘লক্ষ্মীর পদত্যাগ’। গল্পকার গল্পে সুজিত-মিতুর পরিবারে তথা তাদের জীবনের একটি সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের মধ্যে দিয়ে বাঙালি মধ্যবিত্তের অস্তিত্বের উপলব্ধিকে তুলে ধরেছেন। সিদ্ধান্তটা ছিল ‘জ্ঞানপাপী’ লক্ষ্মীর বিদায়। কুফল জেনেও পানের সঙ্গে জর্দা চায়, ব্রত পার্বণে গোবিন্দভোগ চাল চায়- সবই যেন মেনে নেয় মিতু। মিতুর কথায় শ্রেণিসাম্য একটু প্রাধান্য পেলেও সুজিতের কথায় আছে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতা। মধ্যবিত্ত কাজের লোকের দ্বারা ‘ব্ল্যাকমেল’ হচ্ছে। লক্ষ্মী ‘মুচকি কেঁদে’ মিতুকে আঘাত দেয়। বলে মিতু বিধবা হলে বুঝত নিরামিষ খাওয়ার কষ্ট। বিধবা সংস্কার বিষয়ে মিতুকে শুনতে হয়েছে তাদের মতো স্নেহ বাড়িতে লক্ষ্মী থাকতে চায় না। এত অপমান সহ্য করতে না পেয়ে মিতু সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়; লক্ষ্মীকে বিদায় জানায়। সুজিত মিতুকে বুঝিয়ে মধ্যবিত্ত বাঙালি রমণীর অস্তিত্বকে উপলব্ধি করিয়েছে।

বাণী বসু বিশ্বায়ন ভাবনায় নারী-পুরুষের সাম্য তুলে ধরলেন। গৃহকর্ম শুধু নারীর নয় পুরুষেরও। মিতুর কথায় ‘কিচেন রেভলুশন’। তাদের পরিবারে ‘অনুজ্ঞার’ পরিবর্তে ‘কর্মকর্তৃবাচ্য’ প্রাধান্য পায়। সেলিনা হোসেনের কথাঞ্চণে বলা চলে বাণী বসু “নারী-পুরুষের একসঙ্গে বেঁচে থাকার মানবিক শ্রেয়বোধ”^৭কে যুগোপযোগী করে তুলেছেন। পরিচয় করিয়েছেন মানবিক অনুভূতি বিরোধী বিজ্ঞাপনী সংস্কৃতির আগ্রাসনের সঙ্গে।

লেখকের ‘দাদারা’ গল্পটি ভিন্ন স্বাদের। তিনি ‘যৌথ’ শব্দটিকে দু’টি স্থানে যথাযথভাবে প্রয়োগ করেছেন। (ক) পরিবারে, (খ) ফ্ল্যাটের হাউজিং এ। লেখক ক্রমান্বয়ে মধ্যবিত্ত পরিবারের ভঙ্গন দেখাতে গিয়ে সহোদর বড় দুই ভাইদের মূল্যবোধহীন আত্মকেন্দ্রিকতা ও ছোট ভাইয়ের প্রতি বঞ্চনাকে দেখিয়েছেন।

এজমালি জিনিস ওয়াশিং মেশিন ব্যবহারে যেমন বাধা পায় ছোটভাই খোকনের স্ত্রী শম্পি তেমনি কাজের লোক বড় ও মেজর কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে, ভুলে যায় তাদের কাজ করতে। ঘরে জলখাবারের ক্ষেত্রে বঞ্চনার শিকার হয় খোকন। বাড়ি সরানোর বাড়তি খরচ কেউ দিতে চায় না। অথচ নেমন্তন্ন বাড়ির উপহারে সবার টাকা থাকলেও নাম থাকে শুধু দাদার।

যৌথ পরিবারের এরকম ‘উজ্জ্বল-নীচতা’য় অতিষ্ঠ হয়ে শম্পি বলেছে- “যৌথ পরিবারের ক্ষুরে ক্ষুরে নমস্কার বাবা, আমি আর পারছি না, আমার দম আটকে আসছে।”^৮ পাঠক খেয়াল করতে পারেন ‘ক্ষুর’ শব্দটি ব্যবহার করে শম্পি যৌথ পরিবারের পাশবিকতাকেই বুঝিয়েছে।

নিজের ছেলেকে সমস্ত প্রকার নীচতা ও স্বার্থপরতা থেকে বাঁচানোর জন্য খোকন লোন নিয়ে ফ্ল্যাট কেনে। গল্পকার কৌশলে দেখিয়েছেন এ যেন পারিবারিক যৌথ থেকে সমষ্টির যৌথে পদার্পণ। ফ্ল্যাটে এসে প্রোমোটোরের বঞ্চনার শিকার হয়েছে খোকন। দলিলে গ্যারেজের কথা থাকলেও প্রোমোটর গ্যারেজ বিক্রি করে দিয়েছে বুনবুনওয়ালাকে। অ্যাসোসিয়েশনের মিটিংয়ে সবাই সই-সাবুত করে খোকনকে গাড়ি রাখার জন্য একটি শেড তৈরি করতে বলে। পরে বুনবুনওয়ালা আরো শেড তৈরি করতে চায় জানিয়ে কৌশলে চ্যাটার্জিদা শেড তুলিয়ে দেয়। এক সময়ে সেখানে দেখা যায় নতুন সাদা ফোর্ড আইকন; ব্যানার্জিদার গাড়ি। দাদারা কতরকম ভাবে ছোটদের ঠকায়, বঞ্চিত ও লাঞ্চিত করে তার দলিল এ গল্পটি। শম্পি বলেছে- “সব যৌথই হরে দরে এক।”^৯ লেখক আধুনিক দৃষ্টিতে একদিকে ক্ষয়িষ্ণু যৌথ অন্যদিকে বর্ধিষ্ণু যৌথকে দেখিয়েছেন। সবার মূলে রয়েছে বড়দের আগ্রাসন ও ছোটদের বঞ্চনা।

‘হারান-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশ’ গল্পে বড় দাদার প্রতি অর্থবলে এগিয়ে থাকা ছোট ভাইয়ের অবজ্ঞা ও অবহেলার পাশাপাশি আছে বৃহৎ কর্মক্ষেত্রে দায়িত্বশীল উর্ধ্বতন পদাধিকারীর প্রতি অধঃতন অফিসারের বিশ্বাসঘাতকতার কথা। পারিবারিক, সামাজিক অবিচার, অন্যায় ও মূল্যবোধের অবক্ষয়কে কেন্দ্র করে কিশোর মনের বিশ্লেষণ। বড় দুই দাদার পরিবারের অসম্পূর্ণতা, গোঁজামিল সেই পরিবারের বোন, গল্পের কথক সুবর্ণের দৃষ্টিতে তুলে ধরা হয়েছে। সুবর্ণের স্বামী নিরুদ্ভিষ্ট, এক সন্তানকে নিয়ে দাদাদের পরিবারে তার নিরুপায় অবস্থান। মেজদা অসিতের ছেলে অমুর হারিয়ে যাওয়া ও চারদিন পর ফিরে আসাকে কেন্দ্র করে সমস্ত ঘটনা ও চরিত্রের মন-মেজাজ বিশ্লেষণ করতে বসেছে কথক। অমুর পলায়ন ও ফিরে আসা- এহেন আচরণের জন্য মেজদা ও মেজবৌদি মনে করে বড়দা ও বড়বৌদির সংস্পর্শই দায়ী। গল্পকার কিশোর মন ও মধ্যবিত্ত মানসিকতার পাকানো জোট খেলার জন্য থানার ওসি এবং সাইকিয়াট্রিস্ট-এর প্রসঙ্গ এনেছেন। একজন বাস্তব ঘটনার সত্যদর্শন ও অন্যজন কিশোর মানসে ঘটনার বিশ্লেষণ করেছেন। আর সবকিছুর প্রত্যক্ষদর্শী ও সাক্ষ্য গল্পের কথক সুবর্ণ।

থানার ওসি প্রতাপদার বন্ধু জানতে পারেন অমু আধাশহর জয়নগর, মেছুয়াপাড়া যায়নি, হুগলির দিকে গেছে, সঙ্গে কোনো সন্ন্যাসী ছিল না, মিথ্যা বলেছে। তিনি পরিবারের মানুষের কাছে জানতে চান অমুর কোনো পরিচয় কিংবা লাভ অ্যাফেয়ার ছিল কিনা কিংবা পরিবারে ‘ট্রমাটিক’ কিছু ঘটেছে কিনা। কথক জানে মেজদার-মেজবৌদির মনের ভিতরের টানাপোড়েন, তাদের মিথ্যাচার, আভিজাতিক অহংকার। বড়দার কথা না শুনলেও শেষে সাইকিয়াট্রিস্ট ডক্টর চন্দ্রের কাছে নিয়ে যায়। বেশিরভাগ সময় কথক সুবর্ণ অমুর সঙ্গে যায়। মাস খানেক

পর ডক্টর চন্দ্র চিকিৎসার প্রয়োজনে কথকের ব্যক্তিগত কথা জিজ্ঞাসা করেন- কতদিন ধরে বাবার বাড়িতে রয়েছে, তার ছেলের অমুদের স্কুলে না পড়ার কারণ। ডক্টর চন্দ্র মনে করেন লোকটি সত্য, যার সঙ্গে অমু গিয়েছিল। তিনি কথককে এগারো বছর আগে নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর ছবি দেখান।

কথকের স্বামীর সত্যতাকে ব্যঙ্গনাময় করে তুলেছেন গল্পকার। অমু পিসেমশাই প্রতীক দত্তের সমস্ত ঘটনা জানে। জানে অধ্যস্তন কর্মচারীদের দ্বারা প্রতারণার ঘটনা। জানে প্রতীক দত্তের বাড়ি থেকে নিরুদ্দিষ্ট হওয়ার কারণ। অমু মনের গভীর থেকে ছবিটা এঁকেছিল। সমস্ত ঘটনার নির্যাস কথক আবিষ্কার করেছেন- দেখেছেন সবার মধ্যে পলায়ন প্রবৃত্তি কাজ করে। অমু কিশোর দৃষ্টিতে সমাজের চেহারা দেখে ভয়ে, বিতৃষ্ণায় পালিয়ে গিয়েছিল। আবার ফিরে এসেছে। কথক বলেছে নিরুদ্দিষ্টদের ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব যদি অমিতাংশুরা নিতো! বাণী বসুর গল্পে উচ্চবিত্ত অভিজাত জমিদারের উত্তরপুরুষদের মধ্যবিত্তে উত্তরণ দেখা যায়। উত্তরণ কেননা লেখকের কাছে সমস্ত সামাজিক বিত্তই পরম সমাদরের। জীবনের ব্যঙ্গনা মধুময়। জীবন মাধুরী তাঁর সাহিত্য সাধনার রসদ। উচ্চ অভিজাত জমিদারের উত্তর পুরুষদের উত্তরণের গল্প বলা চলে ‘বাস্তব’ ও ‘জ্যোতির্ময়ী গুহ’ কে।

‘বাস্তব’ গল্পের সূচনায় দেখা যায় রথীনের স্মার্ট ভাই ব্রতীনের ও ভগ্নিপতি বিমানের মুন্সিয়ানায় বাড়িটা শেষ পর্যন্ত বিক্রি হয়েছে। পূর্বপুরুষের জমিদারি বাড়ির সঙ্গে রথীনের স্ত্রী জয়িতার আত্মিক যোগ। বাড়িটির স্থানে ফ্ল্যাট তৈরি হলে ব্রতীনের টাকার প্রয়োজন মিটবে ও রথীনের ভালো বাড়িও হবে।

ব্রতীন দাদাকে বুঝিয়েছে বউদিরা চিরকাল ভাড়াঘরে থেকেছে তাই বাড়ির প্রতি তার এত আকর্ষণ। শেষমেষ ব্রতীন নিজের অংশের ভ্যালুয়েশনটা চেয়ে বসেছে। চক্ষু লজ্জার ভয়ে ক্ষান্ত হলেও লাগিয়ে দিয়েছে ভগ্নিপতি বিমানকে। বিমান কৌশলে বউদি জয়িতাকে দেখায় বাড়ি গুলোতে সময়ের ছাপ, দেখায় ফ্ল্যাটের সুখস্বপ্ন। খুশি না হলেও জয়িতা বাড়ি বিক্রি করতে রাজি হয়।

ব্যারাকপুর ছেড়ে তারা যখন উত্তর কলকাতায়, একদিন তাদের দশ বছরের ছেলে মিলু দেখেছে তাদের বোগেনভিলিয়ায় ছাওয়া বাড়িটা ছোট হয়ে হেঁটে হেঁটে তাদের কাছে এসেছে। জ্যোৎস্না রাতে জয়িতাও দেখেছে, রথীনও দেখেছে বাড়িটাকে। আসলে তাদের মনে ছেয়েছিল বাড়িটা। একদিন অফিস ফেরত রথীন জয়িতার কথা মতই বাড়ি দেখতে যায়। দেখে বাড়ির এক জায়গায় সুমো কুস্তিগীরের থাইয়ের মতো বোগেনভিলিয়ার শেকড় মাটি কামড়ে আছে। এ শেকড় যেন বোগেনভিলিয়ার নয়, তাদের বাড়ির শেকড়। গল্পে বাণী বসু দেখিয়েছেন বিশ্বায়নের যুগে অতীত কিভাবে ক্ষীণতর হতে হতে নিঃশেষ হয়ে যায়, যার অবস্থান হয় মানুষের মনে একখন্ড সুন্দর স্মৃতি হিসেবে।

বাঙালি বালবিধবা পিসিমাদের অবস্থার পরিবর্তন ‘জ্যোতির্ময়ী গুহ’ গল্পে প্রাণময় করে তুলেছেন লেখক। জমিদার বংশের উত্তরপুরুষ বর্তমানে মধ্যবিত্ত সুরঞ্জন কর চৌধুরীর পিসিমার হঠাৎ আবির্ভাবকে কেন্দ্র করে বাঙালি মধ্যবিত্ত মানসিকতাকে বিশ্লেষণ করেছেন।

অজানা ফোনকলে সাড়া দিয়ে সুরঞ্জন কর চৌধুরী ৩/১ গুরুসদয় রোডের ঠিকানায় এসে দেখেন রিমডেল হওয়া সূর্যমহল বরজাতিয়াদের অধিকারে। সেনগুপ্তরা ভূতের ভয়ে বরজাতিয়াদের কাছে সূর্যমহল বিক্রি করেছে। ঘরের জঞ্জালের মধ্যে থেকে ভীষ্ম বরজাতিয়া পিসিমাকে আবিষ্কার করেছে। পিসিমার পুনরুজ্জীবন ও পুনরাবির্ভাবে মধ্যবিত্ত সুরঞ্জনবাবু চিন্তায় পড়ে যান। চলৎশক্তিহীন পিসিমাকে কিভাবে নিয়ে যাবেন। তাদের দুটো মাত্র ঘর। কোথায় রাখবেন। খরচ কীভাবে চলবে। ফিরতি সুরঞ্জনবাবু পিসিমাকে নিয়ে যেতে চাইলে ভীষ্ম

বরজাতিয়া বলেছেন-পিসিমা সেই বাড়ির আত্মা, কোথাও যাবেন না। লেখক এখানে ছকেবাঁধা বাঙালি মধ্যবিভূতের জীবন যেমন তুলে ধরেছেন তেমনি সম্পর্কসূত্রগুলো কিভাবে অদৃশ্য হচ্ছে তাও দেখিয়েছেন।

গল্পকার ‘ধোঁয়া’ গল্পে একজন মধ্যবিভূত শিক্ষকের জীবনের ইতিবৃত্ত ধরেছেন। একজন সফল ছাত্রের সামনে শিক্ষকের ছাত্র পেটানোর কারণ দেখিয়েছেন। ছাত্র শিক্ষকের বাড়িতে পৌঁছানোর পর ছাত্র-শিক্ষকের মাঝের সমস্ত ধোঁয়া সরে যায়।

বিপ্লব ঘোষ জজসাহেব। সওয়াল জবাব চলার সময় রামগতিবাবুর আবির্ভাবে চমকে ওঠেন। লাঞ্চ আওয়ারে অতীতের স্মৃতির পাতা খুলে বসেন। স্কুলে শিক্ষকদের মারের লিস্ট, ঠেঙারে শিক্ষকদের লিস্ট তাঁর মনে আসে। জগৎপতি হাই স্কুলের অঙ্কের মাস্টার রামগতি, ছাত্রদের দেওয়া নাম ‘যমগতি’ ছিলেন একজন বিশিষ্ট ঠেঙারে। তিনি বিপ্লব ঘোষের টিউশন টিচারও ছিলেন। তাঁরই দৌলতে বিপ্লব ঘোষ লেটার পেয়েছিলেন। রামগতিবাবুর ইনক্রিমেন্টের টাকার ঝামেলা মিটলে পরে তিনি বিপ্লব ঘোষকে তাঁর বাড়ি নিয়ে যান। বিপ্লব ঘোষ মধ্যবিভূত শিক্ষকের কোনোরকমে বেঁচে থাকার সংগ্রাম-চিত্র দেখেন।

গল্পের শেষে বাণী বসু ‘ধোঁয়া’ শব্দটিকে ব্যঞ্জনাবাহী করে তুলেছেন। এ ‘ধোঁয়া’ মধ্যবিভূত শিক্ষকের জীবন সংগ্রামকে দৃষ্টির বাইরে রাখার পর্দা মাত্র। রামগতিবাবুর স্কুলে ক্ষেপে যাওয়া, ছাত্র পেটানোর কারণ সকলের দৃষ্টির বাইরে রেখেছিল ‘ধোঁয়া’।

সীমাহীন অর্থ উপার্জন ও উচ্চ জীবনশৈলীর প্রতি দুর্বীর আকর্ষণ, ভোগবাদী মানসিকতা মধ্যবিভূত বাঙালিকে যে অবস্থায় ফেলে তারই পরিণতির গল্প ‘লোনা’। মধ্যবিভূত পরিবারের সন্তান অনিরুদ্ধ বিজ্ঞাপন বা পণ্যবাজারের নেশায় মাতোয়ারা। নিজের স্ত্রী দীপাকে ‘বালিকা বিদ্যালয়ের মাস্টারনি’ বলে অপমান করতে দ্বিধা করে না। বাবা পার্থসারথি, মা সুচেতা এমনকি বাড়ির কত্রীর প্রতি সে কৃতজ্ঞতা দেখায় না। স্ত্রীর মধ্যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা না থাকা, বাবা-মায়ের পাঁচশো টাকার ভাড়া বাড়িতে থাকা- সবকিছু তার কাছে ‘মধ্যবিভূমি’। তার কাছে ঘৃণার। অনিরুদ্ধ বয়স ত্রিশ পার হওয়ার আগে জীবনকে উপভোগ করতে চায়। চাকরি ছাড়ে চাকরি ধরে, গাড়ির পরে গাড়ি কেনে, সবই লোন নিয়ে। এরকম জীবন উপভোগে স্ত্রী দীপাকেও অভ্যস্ত করে তোলে। একদিন মার্কিন কোম্পানি থেকে ছাঁটাই হওয়া, শেয়ার মার্কেটের অধঃপতন তাকে অস্থির করে তোলে। এল আই সির মোটা টাকা ইনশিওরেন্স আছে বলে নতুন গাড়িটি নিয়ে নির্মীয়মান উড়ালপুলের পিলারে ধাক্কা মারে। সরেজমিনে তদন্ত করে এল আই সি কোম্পানি জানতে পেরেছিল সেটা আত্মহত্যা।

এল আই সির কাগজটা খুঁজতে গিয়ে দীপা ও পার্থসারথিবাবু একটি চিঠি পান। যেখানে অস্থির মানসিকতার পরিচয় স্পষ্ট। সমস্ত কিছু বিক্রি করে দেনা শোধ করেও দেনা থাকে। একমাত্র মেয়ে অনামিকাকে নিয়ে দীপা পুরনো প্রাইভেট স্কুলে তিন হাজার টাকার চাকরি নিয়েছে। পেনশনের টাকায় কিছু হয় না বলে পার্থসারথি ট্রাইশন নিয়েছেন। গল্পের শেষ কথা- “বুড়ো হচ্ছেন পার্থসারথি, বুড়ো হচ্ছেন সুচেতা, বুড়িয়ে যাচ্ছে দীপা। বুড়ো হচ্ছে অনামিকা। গুল্লু পৃথিবীতে।”^{১০}

গল্পের নাম শব্দ ‘লোনা’র অর্থ লবণাক্ত। যা প্রয়োজনের সীমা ছাড়িয়ে যাওয়াকে নির্দেশ করে। লোনা দেয়ালে ধরলে দেয়ালের যেমন অবস্থা হয় তেমনি এই গল্পে মধ্যবিভূতের অবস্থা। গল্পের শেষে ব্যবহৃত ‘গুল্লু’ শব্দটিও লক্ষনীয়, যার অর্থ লোভী বা লোলুপ।

গল্পকার ‘লোনা’ গল্পটিতে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে মধ্যবিভূতকে দেখিয়েছেন। উচ্চাকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হয়ে মানুষ বিজ্ঞাপন ও শেয়ার মার্কেটের ফাঁদে পা দিয়ে নিজের বিপদ ডেকে আনছে। শুভলক্ষ্মী দাশগুপ্তের কথা ঋণে বলা যায়-

“বিলাস ব্যসনের প্রতি অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ মানুষকে আগ্রাসী করে তুলেছে। বিলাস ও প্রয়োজনের সূক্ষ্ম ভেদরেখা বিলীন হয়ে গেলে মানুষের নৈতিক আদর্শ মূল্যবোধহীন হয়ে পড়ে।”^{১১}

বাণী বসু প্রবহমান জীবনকথা বর্ণনায় সিদ্ধহস্ত। তাঁর গল্পে উঠে আসা মধ্যবিভের জীবন অনন্যতার দাবী রাখে। কখনশৈলী, ঘটনা নির্বাচন, মধ্যবিভের মনোলোকে বিচরণ, সবকিছুতেই তিনি শৈল্পিক মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। ছোটগল্প সময়ের শিল্প এবং জীবন অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ এই বিশ্বাসবোধ থেকে তাঁর গল্পের চরিত্রগুলো উঠে এসেছে। সমস্ত সামাজিক বিত্ত তাঁর লেখনীতে পরম সমাদর লাভ করেছে। তপোধীর ভট্টাচার্যের কথায় বলা যায়-

“জীবনের অভিজ্ঞতা খুবই আশ্চর্যজনকভাবে শিল্পে রূপান্তরিত হয়।...সময় যত সূক্ষ্ম ও জটিলভাবে বিবর্তিত হচ্ছে, শৈল্পিক অভিব্যক্তিতে দেখছি তার স্বীকৃতি।”^{১২}

তথ্যসূত্র:

১. বসু, বাণী। গল্প সমগ্র। তৃতীয় খণ্ড, আত্মদান- বারিদবরণ ঘোষ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা-৭৩, তৃতীয় মুদ্রণ, মাঘ ১৪২৬, পৃ. ৯।
২. গিরি, সত্যবতী ও মজুমদার, সমরেশ (সম্পা.)। প্রবন্ধ সঞ্চয়ন। রত্নাবলী, কলকাতা ০৯, দ্বিতীয় সংস্করণ/ দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১লা বৈশাখ ১৪১৬, পৃ. ১২১৪।
৩. বসু, বাণী। গল্প সমগ্র। প্রথম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা -৭৩, পঞ্চম মুদ্রণ, পৌষ ১৪২৩, পৃ. ৪।
৪. তদেব, পৃ. ৮।
৫. তদেব, পৃ. ৯।
৬. সংসদ বাংলা অভিধান, সাহিত্য সংসদ, বিংশতিতম মুদ্রণ: জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ৫০৭।
৭. মণ্ডল, বরেন্দ্র (সম্পা.)। নারীবিশ্ব। সেলিনা হোসেন, অভিজান পাবলিশার্স, কলকাতা ০৯ প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০১৯, পৃ. ৩৬।
৮. বসু, বাণী। গল্প সমগ্র। পঞ্চম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ, মাঘ ১৪২১, জানুয়ারি ২০১৫, পৃ. ২৮৩।
৯. তদেব, পৃ. ২৮৭।
১০. বসু, বাণী। গল্প সমগ্র। চতুর্থ খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা ৭৩, দ্বিতীয় মুদ্রণ, পৌষ ১৪২৫, পৃ. ৩১৫।
১১. গিরি, সত্যবতী ও মজুমদার সমরেশ (সম্পা.)। প্রবন্ধ সঞ্চয়ন। রত্নাবলী, কলকাতা ০৯, দ্বিতীয় সংস্করণ / দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১লা বৈশাখ ১৪১৬, পৃ. ১২১৩।
১২. ভট্টাচার্য, তপোধীর। ছোটগল্প: সময়ের শিল্প, এবং মুশায়েরা। কলকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৪২৩ পৃ. ৩৪।



তারাপদ রায়ের কবিতা: স্বতন্ত্র স্বর

মনোরঞ্জন উরাও, গবেষক, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 26.12.2025; Accepted: 28.01.2026; Available online: 28.02.2026

©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license

(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

Abstract

Tarapada Ray (1936–2007) was a distinguished poet of the Krittibas group. While contemporaries such as Sunil Gangopadhyay, Shakti Chattopadhyay, and Utpal Basu achieved wide popularity, Tarapada Ray's poetry remained on the margins of the reading public for a long time. Although his reputation later grew significantly as a writer of humorous prose, his identity as a poet remained largely overshadowed. This article analyzes Tarapada Ray's poetry as a distinctive voice within the context of modern Bengali poetry.

The principal characteristic of Tarapada Ray's poetry is his use of simple, colloquial, and indigenous language, consciously avoiding artificial poeticism, excessive ornamentation, and foreign influences. Humor functions as an important aesthetic strategy in his poetry – not in the aggressive form of satire or irony, but through self-mockery and absurdity, revealing human suffering, the crises of middle-class life, existential uncertainty, and moral conflict. Rejecting ego and poetic grandiosity, he places “destitution” at the center of his poetic vision, offering a perspective that is unique in modern Bengali poetry.

Through the fluid form of prose poetry, a sensitive engagement with everyday experience, and a focus on the lives of ordinary people as the core subject of poetry, Tarapada Ray demonstrates that poetry is not a matter of loud philosophical proclamation, but a simple expression of the inner truths of life. For this reason, his poetry remains relevant today, and he occupies an important place in Bengali literature as a poet with a distinct and individual voice.

Keywords: Tarapada Ray, Krittibas Group, distinctive voice, absurd humor, humor

তারাপদ রায় বাংলা সাহিত্যের একজন স্বনামধন্য কৃতিবাসী কবি। তিনি কৃতিবাস গোষ্ঠীর একজন অন্যতম সদস্য হলেও কৃতিবাসী কবিদের মধ্যে তার নাম সবসময় উচ্চারিত হয়নি। কৃতিবাস গোষ্ঠীর অন্যান্য কবিদের তুলনায় যেমন শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শরৎ কুমার মুখোপাধ্যায় এবং উৎপল বসু যতটা জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন, তারাপদ রায়ের কবিতা পাঠকের কাছে ততটা সমাদৃত হয়নি। তবে, এক সময় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবে তারাপদ রায় বেশ পরিচিতি ছিল। তাঁর কবিতা, বিশেষত ‘কোথায় যাচ্ছেন তারাপদ বাবু’ এবং ‘দারিদ্র রেখার নীচে’, ‘ছিলাম ভালবাসার নীল পতাকাতলে স্বাধীন’ কিছুটা জনপ্রিয়তা পায়, তবে পাঠকদের মধ্যে তার কবিতার ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা তখনও পরিপূর্ণভাবে পায়নি। পরবর্তী সময়ে, তার কবিতার পাশাপাশি তিনি একজন হাস্যরসিক বা রম্যরচনাকার হিসেবে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। সহজ সরল লেখার জন্যই তাকে সবার কাছে আলাদা পরিচিত করে তোলে। তারাপদ রায়ের আত্মজীবনীমূলক রচনা

‘চারাবাড়ি পোড়াবাড়ি’-র জন্য একসময় জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। এই রচনাটি একদিকে যেমন তার ব্যক্তিগত জীবন ও অভিজ্ঞতা তুলে ধরেছিল, তেমনি পাঠকদের মধ্যে এক বিশেষ জায়গা তৈরি করেছিল।

কৃত্তিবাস গোষ্ঠীর অগ্রগণ্য কবিদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব স্বর এবং ভাষা ছিল। যাকে আমরা স্টাইল বলে থাকি। সুনীল, শক্তি, শরৎকুমার ও উৎপল-এর কবিতা পরপর সাজিয়ে রাখলে এবং কবির নাম তুলে নিলেও দক্ষিত পাঠক ঠিকই বুঝতে পারবেন— কোনটি কার কবিতা। তারাপদ রায়ের কবিতাও তাই। তাঁর কবিতারও এক স্বতন্ত্র ভাষা আছে। স্বকীয় কণ্ঠস্বর আছে। তাতে ‘স্টাইলাইজেশন’ কম। বিদেশি কবিদের প্রচ্ছন্ন প্রভাব কম। তিনি সম্পূর্ণ দিশি কবি। সাধারণ শব্দ ব্যবহার এতটাই অব্যর্থ যে, কবিতার ঐন্দ্রজালিক রহস্য ঠিকই আভাসিত হয়। নিজেকে নিয়ে নিজের চেহারাকে নিয়ে ঠাট্টা করা তারাপদ রায়ের এক বিশেষ ঝোঁক। কবিতায় এবং রম্যরচনায় এর অজস্র উদাহরণ পাওয়া যাবে। আমরা তাঁর একটি কবিতা লক্ষ্য করলে দেখব—

“দাঁতাল শুয়োর নিয়ে খেলা করা,
একমাত্র তোমাকেই তোমাকে মানায়,
বদ্ধঘরে মুখোমুখি চকচকে আয়নায়
নিজের ছায়ার সামনে পরিতৃপ্ত তারাপদ রায়।”^১

শ্রেষ্ঠ কবিতার ভূমিকায় তারাপদ রায় বলেছেন—

“আমি কখনও এমন কিছু লিখি না যা স্পষ্ট নয়, যা বুদ্ধিগ্রাহ্য নয়, যা আমি নিজে জানি না বা বুঝি না। যা সহজ বোধগম্য নয় তা যেমন আমি লিখিনি, তেমনি আমি সাধারণত কবিতা লেখার চেষ্টা করেছি মুখের ভাষায়। যে ভাষায় আমরা প্রতিনিয়ত কথা বলি আমাদের সেই মৌখিক ভাষাকে আমি কবিতায় নিয়ে যেতে চেয়েছি।...আমি সচেতনভাবে, সাবালক হওয়ার পর থেকে চেষ্টা করেছি, এখনও চেষ্টা করছি, আমার নিজের মতো লিখতে, নিতান্তই নিজের ভাষায় কথা, নিজের তার মধ্যে অন্য কারো ছায়া, আমি কখনোই জ্ঞাতসারে পড়তে দিইনি।”^২

তারাপদ রায়ের কবিতায় এক্সপেরিমেন্ট কম। শব্দ নিয়ে বিচিত্র কৌশল প্রায় চোখেই পড়ে না। অভিজ্ঞ দার্শনিকের মতো তিনি কখনই জীবনবিষয়ক নানান গুরুগম্ভীর কথা বলতে চাননি। খুব সহজ ভাবে তিনি তাকাতে চেয়েছেন জীবনের দিকে। সুখ, দুঃখ, অপমান, যন্ত্রণাবোধ সবকিছুই তিনি সহজ সরল ভাষায় প্রকাশ করতে চেয়েছেন। প্রসঙ্গেই তাঁর ‘তদন্ত কমিশন’ কবিতাটি স্মরণ করা যেতে পারে—

“আমাদের সাড়ে আটজনের সংসারে
তিন জন মারা গেছে এক বছরের মধ্যে
আমরা ভালো আছি।”^৩

এক বছরের মধ্যে তিন জন মারা গেলেও ভালো থাকা যায়, জীবনের এই নিষ্ঠুর সত্যকে, এই বাস্তবতাকে এই হৃদয়হীন যান্ত্রিকতাকে কত সহজে, একেবারে ভড়ং কিংবা ভণিতা না করেই প্রকাশ করলেন তারাপদ। এবং কবিতাটির শেষ দুই লাইনে তিনি বাস্তবসম্মতভাবেই মানবিক—

“তবু মোজা ছিড়ে গেলে কারো কথা মনে পড়ে,
কই মাছ খেতে গেলে কারো কথা মনে পড়ে।”^৪

তারাপদ রায় ছিলেন মজার কবি। মজার মজার কবিতা লিখতেন। সুকুমার রায়ের পর বাংলা কবিতায় তিনিই দ্বিতীয় কবি যিনি কবিতায় উদ্ভট রস-এর জোগান দিয়েছেন। ‘সাইকেল, গাধা ও ধোপার কাহিনি’ কবিতাটি উদ্ভট রসের। কবিতাটি হল—

“‘একটা সাইকেল পেলে যাওয়া যেত ধোপাদের উজ্জ্বল দোকানে’,
‘ধোপার বাতিল মৃত গাধা শুধু এইটুকু শুনে,
হেসেছিলো অন্তরীক্ষ থেকে।
সে ছিলো অনেককাল
মনিবের নিত্যসঙ্গী ভাটিতে, দোকানে।
সে জানে, ভালোই জানে, উজ্জ্বলতা কি যে তার মানে
বিশেষত ধোপার দোকানে।”^৫

এই কবিতাটিতে সুকুমার রায়ের ‘ননসেন্স’ কবিতার মতো একটি কাহিনি কিংবা গল্পসূত্র আছে। এখানে এক নিঃসঙ্গ ধোপার কথা বলা হয়েছে। যে হয় দোকানে, নয় ভাটিখানায় তাঁর দিনগুলো কাটাতো। গাধাই ছিল তাঁর নিত্যসঙ্গী। এখানে গাধাটিও মৃত। ধোপার দোকান যে মোটেই উজ্জ্বল নয়, অন্তরীক্ষ থেকে ‘বাতিল মৃত’ গাধার হাসি থেকেই তা আমরা বুঝতে পারি। এই ধরনের কবিতা বাংলা ভাষায় খুব কম লেখা হয়েছে।

কবি তারাপদ রায়ের স্বতন্ত্রতা এখানেই যে তিনি তাঁর কবিতায় সাদাসিধে সহজ সরল ভাষা ব্যবহার করে গভীর ভাবনার প্রকাশ ঘটান। তাঁর কবিতায় কোনও ভারী শব্দ নেই, প্রতিটি শব্দ একটি স্ফটিকের মতো পরিষ্কার ও উজ্জ্বল। যেমন— ‘সাহসিনী’ কবিতায় কবি লিখেছেন,

“সাহসিনী/চায়ে বড় দিয়েছিলে চিনি/দুধ কম:/তবু ভালো, এই তো প্রথম/তোমার হাতের
তৈরী উষ্ম পানীয়ের/যতটুকু তাপ মেলে তারই স্বাদ ঢের।”^৬

আবার ‘কাঁসার গেলাস’ কবিতায় তিনি লিখেছেন,

“কাঁসার গেলাসে লিখে রেখেছিলে নাম/ পুরানো ধাতুর দাম/ সে গেলাস কবে একেবারে/
বিক্রি হয়ে গিয়েছে বাজারে। /আজকাল কারা পান করে, /তোমার নামের জল আজ কার
ঘরে?”^৭

‘সাহসিনী’ ও ‘কাঁসার গেলাস’ কবিতাটি নিঃসন্দেহে অস্ফুট প্রেম। ‘ভ্রাম্যমাণ’ কবিতাটি উদ্ভট-রস-এর। এরকমই উদ্ভট রসের কবিতা— ‘ঘোড়া ও নাবালিকা’। এই রকম কবিতার আমরা কোনও আশ্চর্যকর অর্থ না খুঁজে শুধু নতুনত্ব বা রহস্যময়তার আনন্দ অনুভব করব।

“ঘোড়া এসে উঠেছিল ছাদে
ছাদের চাঁদ ছিলো, ছিলো শিখা
নাবালিকা
ভয় পেয়েছিলো খুব ভয়ের সুবাদে
বয়সকালের ঘোড়া উঠেছিলো ছাদে।”^৮

‘বয়সকালের ঘোড়া’—আমরা তো ধরেও নিতে পারি— ‘বয়সকালের ছোঁড়া?’ নাবালিকা শিখা যখন ছাদে ছিল, আকাশে চাঁদ ছিল, তখনই ঘোড়া (পুরুষ) উঠে এসেছিল ছাদে। তাহলে কি কোনো নাবালিকা-অসম্মানের গল্প শোনাচ্ছেন কবি? কারণ— “শিখা/নাবালিকা/ঘোড়া আর চাঁদ দেখে গুণেছে প্রমাদ।”^৯ কিন্তু এই সম্ভাব্য গল্পটিকেও সুকৌশলে ভেঙে দেন তারাপদ। শেষপর্যন্ত কবিতার রহস্যময়তাই জিতে যায়। তারপর অবশ্য কিছু একটা ঘটে। এরকমই আরও একটা উদ্ভট কবিতা— ‘X, Y বিষয়ে কবিতা’। এই কবিতায় তারাপদ রায় লেখেন— “X, Y দুইজন লোক, /যে কোন দুইজন লোক, X, Y গ্রাফের খাঁচায়/কখনো পাঁচঘর ওঠে, কখনো তিনঘর নেমে যায়।”^{১০}

আবার ‘কালু’ নামে এক রহস্যময় লোককে নিয়ে দুটি কবিতা আছে তারাপদ রায়ের। একটির নাম ‘কালু, আলো জ্বালো’ আর একটির শিরোনাম ‘ছুটির দিনের সকাল’। দুটি কবিতাই অ্যাবসার্ড এবং কিছুটা যেন রহস্যময়। প্রথম কবিতায়—অনেক রাতে, ‘বড় গাড়ি চড়ে’ কারা যেন আসে কালুর বাড়িতে। বৃষ্টির রাত—
“এমন বৃষ্টির মধ্যে ঝুপঝাপ কারা/ভিজতে ভিজতে চলে এল?”^{১১} কালুর বিড়াল খুব একটা পাত্তা দেয় না আগন্তুকদের। ‘তার একবার’ চোখ জ্বলজ্বল করে; তারপর হাই তুলে সে ঘুমিয়ে পড়ে। এরপরে কবির যেন দুশ্চিন্তা, আগন্তুকদের আদৌ কালু অভ্যর্থনা জানাবে কি? “কালু কি অবাক হবে, নাকি কালু প্রস্তুত রয়েছে,/তার বিড়ালের মত সে তো মুখ নয়,/গভীর রাতের গাড়ি, বিশিষ্ট অতিথি—/সে হয়তো ভলই জানে/সে হয়তো জেগে বসে আছে।”^{১২} কিন্তু কালুর ঘুম ভাঙে না। বৃষ্টিভেজা রাতে সে ঘুমিয়েই থাকে। শুধু ‘জাহাজের মত গাড়ি’ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। কবিতা শেষ হয় এইভাবে—

“কালু ঘুমে অচেতন, (ওঠো, কালু, আলো জ্বালো)।/কালু ঘুমে অচেতন, (ওঠো কালু, দ্যাখো এসে)।/কালু শুয়ে থাকে, শুধু জ্বলজ্বলে চোখে।/একবার হাই তুলে আবার ঘুমিয়ে পড়ে/কালুর বিড়াল।।”^{১৩}

শেষমেশ কিছুই ঘটে না। কালু ঘুমিয়ে থাকে। বিড়াল ঘুমিয়ে থাকে। আর রহস্যময় গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকে দরজায়। নিঃসন্দেহে উদ্ভট কবিতার বিশিষ্ট নিদর্শন এই কবিতা।

‘ছুটির দিনের সকাল’ কবিতায় যেন চাপা, অবৈধ প্রেমের আভাস। ছুটির দিনের সকালে কালুদের বাড়িতে গেলে দেখা যায়, ‘কালু তখনও কয়েদীদের মতো ডোরাকাটা পোশাক পরে ঘুমিয়ে’। কালু যেন সত্যি সংসারে এক কয়েদী। সব সময় তার ভয়— ‘বৌ রাগ করবে’। কালু চলে যায়। তার বৌ এবং কবি দুজনে চা-পান চলে। তারপর—

“আমি আস্তে আস্তে উঠি, বলি, ‘আজ যাই।’/কালু কাগজ থেকে চোখ তুলে বলে, ‘চললে’/কালুর বৌ আমাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দেয়,/আমি রাস্তায় নামতে নামতে বলি, ‘আপনাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে।/কালুর বৌ চমৎকার হেসে বলে, ‘আর একদিন আসবেন।’”^{১৪}

তারাপদ রায় সচেতনভাবে ‘কবিত্ব’ এবং ‘অহমিকা’ বর্জন করে ‘নিঃস্ব’ অর্জনের দিকে ঝুঁকেছিলেন, যা তাঁর কবিতাকে এক বিশেষ মানবিক সংবেদনশীলতা দিয়েছে। তিনি একজন সরকারি আমলা হয়েও মধ্যবিত্তের নিত্যদিনের সংগ্রামকে তাঁর সাহিত্যের কেন্দ্রে স্থাপন করেন এবং প্রমাণ করেন যে জীবিকা এবং কল্পনার মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। তাঁর ‘দিন আনি দিন খাই’ কবিতাটি অর্থনৈতিক টানাপোড়েনকে অস্তিত্ববাদী রহস্য হিসেবে চিত্রিত করে। যেখানে জীবন কেবল একটি অবিরাম এবং ব্যাখ্যাশীল প্রক্রিয়া।

তারাপদ রায়ের কবিতায় গভীর কোনও সত্যের উচ্চারণ নেই? বহির্বিশ্বকে নিজের অন্তরে গ্রহণ করে যে গভীর সত্যকে তুলে আনেন, সেই সত্য কি নেই তারাপদ রায়ের কবিতায়? তিনি যে প্রকৃতই কবি তা বুঝে নিতে আমাদের একটুও অসুবিধে হয় না যখন আমরা পড়ি এইরকম কবিতা—

“নদীর ভিতর থেকে উঠে এসে গ্রাম
নদীর ভিতরে ডুবে যায়।
মধ্যে থাকে দু-এক শতাব্দীকাল কিছু স্তব্ধ ছায়া
জন্ম-মৃত্যু, সানাই ও গাছপালা কিশোর-কিশোরী,
কলস ও কলসের জল
উঠোনে উদ্যোম শিশু হামা দেয় কাদামাটি মেখে
হাওয়া এসে ছিঁড়ে দেয় কলাপাতা

গ্রাম ডুবে যায়।

নদীর ভিতরে গ্রাম, গ্রামের ভিতরে নদী

দু-এক শতাব্দীকাল কিছু স্তব্ধ ছায়া।”^{১৫}

এই ধরনের প্রথাগত বিষয়ের কবিতা ছাড়াও তারাপদ বিচ্ছিন্নভাবে কিছু কবিতা লিখেছেন যা, এক কথায় বলা যায়, বিচিত্র ধরনের কবিতা। তারাপদ রায় কীভাবে তাঁর কাব্যিক ভাষায় কৌতুক ও স্যাটায়ারকে ব্যবহার করে মধ্যবিত্ত জীবনের অপ্রিয় সত্য এবং অস্তিত্বের সংকটকে শিল্পিত করেছেন? এবং কেন তিনি তাঁর সমসাময়িক কবিদের তুলনায় ভিন্ন এক ‘স্ব’-কে কবিতার কেন্দ্রে স্থাপন করেছেন যা অহমিকা বা উচ্চাকাঙ্ক্ষার পরিবর্তে ‘নিঃস্ব’ অর্জনকে প্রাধান্য দিয়েছে? তাঁর কবিতা বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রমাণ করা হবে যে তাঁর লঘুতা কেবল হাস্যরস নয় বরং গভীর মানবিক সত্যকে উদ্ভাসিত করার একটি সূক্ষ্ম ও জটিল শৈল্পিক কৌশল।

ছন্দে তারাপদ রায়ের হাত পাকা, কিন্তু ছন্দ তাঁর প্রিয় আঙ্গিক নয়। হয়তো ছিল একদা, তবে জানিনা পরিণতির কোনও ধাপে আবার তা ফিরে আসবে কিনা। তিনি স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেন বৈঠকী গালগল্পের মেজাজে। গদ্য কবিতার নতুন আঙ্গিকটি আবিষ্কার করার পর রবীন্দ্রনাথের একদা মনে হয়েছিল ছন্দোবদ্ধ কবিতায় পরিবেশন করা যায় না এমন কিছু তুচ্ছাতিতুচ্ছ অভিজ্ঞতা, বিস্ময়, মুগ্ধতা, অস্ফুট প্রেমানুভূতি বা বেদনা ভাষা পেতে পারে। তারাপদ রায়ের গদ্য কবিতা আরও হালকা আরও তাচ্ছিল্যকর। এবং তারই উপযোগী তাঁর ভাষা ও ছন্দ। যেমন ঈশ্বরকে সম্বোধন করে হয়তো বলার জন্যই তিনি বললেন, ‘এই ফুলগুলি খুব ছোট’। ‘আজীবন সমস্ত জীবন’ কবিতায় কবি লিখেছেন—

“কিছু কিছু স্বপ্ন আছে,

যা সারাজীবন সঙ্গে সঙ্গে থাকে।

কিছু কিছু ভালোবাসা আছে

যা রক্তের সঙ্গে, চোখের জলের সঙ্গে

মিশে থাকে

আজীবন, সমস্ত জীবন।”^{১৬}

এই একটি মাত্র শব্দ ‘যা’ দিয়েই কবি তারাপদ রায় কাব্যের সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছেন। আবার ‘রক্তচাপ’ কবিতায় কবি লিখেছেন—

“সেই যারা

কোদাল দরকার হলে এসে কুড়োল চাইতো

কিছুতেই ইস্কাপনকে ইস্কাপন বলতো না।”^{১৭}

তারাপদ রায় কবি ছাড়াও যে একজন বড়ো মাপের দার্শনিক ছিলেন, এ বিষয়ে আমাদের সন্দেহ থাকার কথা নয়। কিন্তু আসল কথা হল, কবি তারাপদ রায়ের কবিতা কখনও দর্শন থেকে পৃথক কোনও জায়গার কথা বলেও না। সাধারণ ঘটনার মধ্যেও দার্শনিক বিস্তৃতি তিনি দেখতে পেয়েছেন বলেই, তাঁর কবিতায় সেই বিস্তার এসেছে। এই দর্শন তাঁর ভিতরে এত গভীর ভাবে ছিল, যে তার প্রকাশে বিন্দুমাত্র জটিলতা নেই। নিজের মধ্যেই একটা আলাদা জীবনের বৃত্ত তৈরি করেছিলেন তারাপদ।

নিজের জীবন দিয়ে যা বুঝতেন, যা দেখতেন তাই-ই সহজ ভাষায় হাজির করতেন। ‘এক জন্ম’-এর মতো এক অদ্ভুত জীবন দর্শনের পাশাপাশি রাখা যায় ‘কাঁসার গেলাস’ কবিতাটি। যেখানে অতীতের দিকে ফিরে দেখা নিজে। তার সঙ্গেই মিলিয়ে দেখা বর্তমান ‘আমি-কে’। কবিতার হাত ধরেই যেন নিজেকে খুঁজতেন তিনি। জোর করে কাঠিন্য নয় বরং নিজের সাধারণ জীবনের মতোই আনন্দ করে লেখা প্রতিটি লাইন। সেই পথেই পর্ব-২, বিশেষ সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি, ২০২৬

হাজির হন আরও একজন— মিনতি রায়। কবি নিজেকে নিয়েও কম কৌতুক করেননি। সবুজ পাঞ্জাবি গায়ে সবুজ পাশপোর্ট হাতে মূল শিয়ালদা স্টেশনে ছেঁড়া তালি জুতো পায়ে যে কিশোরটি এসে পৌঁছেছিল, তাঁকে অবশ্য কলকাতা মনে রাখেনি—কিন্তু কবি ভোলেননি আদৌ। তাই নিজেকে নিয়ে তাঁর অজস্র কৌতুক।

“এক নম্বর বোকা

দু নম্বর বোকাকে ডেকে বললো,

সিনারিটা একবার তাকিয়ে দ্যাখো।”^{১৮}

কবিতায় ‘হিউমার’ আনার কারণেই তারাপদ রায় কবি হিসেবে বিশিষ্টতা অর্জন করেছেন। মনে রাখা দরকার যে ‘হিউমার’ নয়, ‘স্যাটায়ার’ বা ‘আয়রনি’ নয়, ‘হিউমার’ হল নির্মল হাসি, যা অপরের মুখ ম্লান করে। শ্রেষ্ঠ ‘হিউমরিস্ট’ তিনিই, যিনি নিজেকে নিয়ে রসিকতা করতে পারেন। এ প্রসঙ্গে বাংলা সাহিত্যের স্বনামধন্য গল্পকার শিবরাম চক্রবর্তীর গল্পগুলি স্মরণীয়। নিজের নাম নিয়ে রসিকতা করার সুযোগও শিবরাম ছাড়েননি। তারাপদ রায় তাঁর অনেকগুলি রম্যরচনায় শিবরাম চক্রবর্তীর নামোল্লেখ করেছেন। তাছাড়া, তিনিও তাঁর কবিতায় নিজেকে নিয়ে রসিকতা করেছেন এবং এদিক থেকে তাঁকে ‘বাংলা কবিতার শিবরাম’ বলা যেতে পারে—

“টি, আই, টি অর্থাৎ তারাপদ ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্টের

একজন ভালো চেয়ারম্যান চাই।

মজা নালা, বোকা রাস্তা, বাজপড়া বাড়ি

তারই মাঝখান দিয়ে দু’ একটা সোজা রাস্তা চাই,

চাই লম্বা, নাকউঁচু, স্মার্ট ম্যানসন

টি, আই, টি’ র জন্যে জনসাধারণের সহযোগিতাও চাই।”^{১৯}

ঈশ্বরকে উদ্দেশ্য করে তারাপদ লেখেন— “ফিলিপ্স অসরামের চেয়ে ঢের ভালো/এখনো তোমার সূর্য, এত লক্ষ বৎসরেও ফিউজ হলো না?”^{২০} এরকম প্রকাশভাবনাতেও, নিঃসন্দেহে, বৈচিত্র্য আছে। স্বয়ং তারাপদই বলেছিলেন, তাঁর জীবন কোনও কবির জীবন নয়। বরং আর পাঁচজনের মতোই সামান্য গৃহস্থের সংসার। তবে সে তো পরের কথা। ষাটের দশকে যখন বেশ কিছু তরুণ বাংলা সাহিত্য, কবিতাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখছে, তখন সেই স্বপ্নের নদীতে ভিড়েছিলেন তিনিও। সুনীল, শক্তি, শরৎকুমার, সন্দীপনের সঙ্গে শুরু হল উত্তাল যাপন। আর সেসব ছল্লোড়ের অন্যতম আকর্ষণ ছিলেন তারাপদ রায় নিজে। যেমন গলার স্বর, তেমন তাঁর গল্পের ভাঁড়ার। একটা সময় তারাপদ রায়ের বাড়িতেই বসত বন্ধুদের আড্ডার আসর।

নিজের মধ্যেই একটা আলাদা জীবনের বৃত্ত তৈরি করেছিলেন তারাপদ। সহজ, সাবলীল সেই ভাষা। এই সরলতার আড়ালে প্রচ্ছন্ন থাকে এক গভীর ব্যঙ্গাত্মক স্বর। যেমন, “আমাকে বাচাল যদি করেছে মাধব, বন্ধুদের করে দিও কালা।”^{২১} এই উক্তিটি লৌকিক বা সাধারণ কথোপকথনের ভঙ্গিমায় রচিত হলেও, এর গভীরে লুকিয়ে থাকে আধুনিক মানুষের যোগাযোগের প্রতি বিতৃষ্ণা এবং নিজের বিচ্ছিন্নতাকে সুরক্ষিত রাখার তীব্র আকাঙ্ক্ষা। এই সহজ ভাষা ব্যবহারের মাধ্যমে তিনি পাঠকের উপর আনুষ্ঠানিক কাব্যিক কাঠামোর বোঝা না চাপিয়ে সরাসরি অনুভূতিতে আঘাত করতে সক্ষম হন।

তার মধ্যেও নিজস্ব দর্শন, যাপনের ভিড়। আড্ডাছলেই প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘তোমার প্রতিমা’। তখনও মহিম হালদার স্ট্রিটেই থাকতেন তারাপদ রায়। প্রথম কবিতার বইয়ের ভেতরেই থেকে যায় মুদ্রণ প্রমাদ। ‘মহিম হালদার স্ট্রিট’-এর ‘মহিম’ বদলে যায় ‘মহিষ’-এ। যা নিয়ে পরে ঠাট্টা করতেও ছাড়েননি অনেকে। এসবের ভেতর দিয়েই স্বতন্ত্র জায়গা করে নিয়েছিল তাঁর কবিতা।

তারা পদ রায় সচেতনভাবে প্রচলিত ছন্দ বা কাঠামো থেকে সরে এসে গদ্যের স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিমা গ্রহণ করেন। তাঁর কবিতা প্রায়শই তাঁর রম্যরচনার গদ্যের মতো সাবলীল, যা পাঠককে মুহূর্তেই আকৃষ্ট করে। এই গদ্য-কবিতারীতি বাংলা কাব্যে এক স্বাতন্ত্র্য কবির মর্যাদা এনে দিয়েছে, যেখানে পরিহাস-বিরূপ মিশ্রিত বাকধারা শিল্পের নতুন পথ উন্মোচন করেছে। তিনি এই শৈল্পিক স্বাতন্ত্র্যের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করেছেন যে, কবিতা মহৎ বা উচ্চতর শিল্প থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। এটি দৈনন্দিন শব্দ এবং অনুভূতিকে তার মহত্বে স্থাপন করে।

তারা পদ রায় মধ্যবিভক্ত জীবনকে কাব্যের কেন্দ্রবিন্দুতে এনেছেন, কারণ তিনি নিজেই ছিলেন সেই জীবনের অংশ। তিনি নিজের জীবনকে নেহাতই ‘ঘরগৃহস্থী’ বলে দাবি করেন এবং বলেন। এই স্ব-স্বীকৃত সাধারণত্বের মধ্যে তিনি এক দার্শনিক সত্য আবিষ্কার করেন। পরিশ্রমে ও কল্পনায় কোনও পার্থক্য থাকে না ‘কোন প্রভেদ থাকে না জীবিকা ও কবিতায়’। এই অবস্থান বাঙালি মধ্যবিভক্তের মননে শিল্প ও কর্মজীবনের সংজ্ঞাকে নতুন করে গড়ে তোলে। তিনি প্রমাণ করেন যে কবিত্ব কোনও উচ্চমার্গীয় বৈশিষ্ট্য নয় বরং তা জীবনের অভেদত্বে বিরাজ করে। একজন কবি যখন নিজেই সেই আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার অংশ, তখন তাঁর মধ্যবিভক্ত জীবনচিত্রটি কেবল বাইরের পর্যবেক্ষণ নয়, এটি ভেতরের এক স্বীকারোক্তি, যা তাঁর কবিতাকে এক বিশেষ বিশ্বাসযোগ্যতা ও গভীরতা দান করে।

তারা পদ রায়ের কবিতা একেবারেই আলাদা ধরনের। তাঁর কবিতা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ছোট ছোট ঘটনা, হাসি-কান্না, অসম্পূর্ণতা আর অবহেলিত মুহূর্তগুলোর মধ্যেই লুকিয়ে থাকে মানুষের গভীর সত্য। তাঁর কবিতার ভাষা খুব সহজ সরল হলেও, তার ভেতরে আছে মধ্যবিভক্ত জীবনের দুঃখ, দেশভাগের যন্ত্রণা, শহরের ক্লান্ত জীবন আর মানুষের নৈতিক টানাপোড়েনের অনুভব। তারা পদ রায়ের কবিতায় হাসি খুব গুরুত্বপূর্ণ। তবে এই হাসি শুধু আনন্দের জন্য নয়। তিনি এই হাসির মাধ্যমে সমাজ, রাষ্ট্র, সাহিত্যজগত এমনকি নিজেকেও প্রশ্ন করেছেন। অনেক সময় তাঁর কবিতা পড়তে পড়তে আমরা হেসে উঠি, কিন্তু সেই হাসির পরেই মনে হয়—এর ভেতরে লুকিয়ে আছে গভীর কষ্ট বা বেদনা। এই হাসি আর কষ্ট একসঙ্গেই তাঁর কবিতাকে আলাদা করে তোলে।

কৃত্তিবাস গোষ্ঠীর কবি হয়েও তিনি অন্যদের মতো বড় বড় ভাবনা বা জটিল ভাষার পথে হাঁটেননি। তিনি কবিতার কেন্দ্রে এনেছেন সাধারণ মানুষকে, যে মানুষটি কখনও অফিসে কাজ করে, কখনও উদ্বাস্তু হয়ে ঘুরে বেড়ায়, কখনও সংসারের দায়িত্বে জর্জরিত, আবার কখনও ঈশ্বরকেও নিয়ে হালকা ঠাট্টা করে। অনেক সময় কবি নিজেই তাঁর কবিতার চরিত্র হয়ে ওঠেন। এই নিজেকে নিয়ে হাসতে পারার ক্ষমতাই তাঁর কবিতাকে আলাদা পরিচয় দিয়েছে। অনেকেই তারা পদ রায়কে চেনেন রম্য লেখক হিসেবে। এতে তাঁর কবিসত্তা কিছুটা আড়ালে থাকে ঠিকই, কিন্তু মন দিয়ে পড়লে বোঝা যায় তাঁর কবিতায় সাধারণ মানুষের জীবনের ছবি সম্পূর্ণ হয় না। তিনি দেখিয়েছেন, কবিতা লেখার জন্য বড় তত্ত্ব বা জটিল দর্শন প্রয়োজন নেই। দরকার জীবনের দিকে সংবেদনশীল চোখে তাকানো এবং সহজভাবে সত্য কথা বলার সাহস।

সব শেষে বলা যায়, তারা পদ রায়ের কবিতা শুধু আনন্দ দেয় না, আমাদের ভাবনাকেও নাড়িয়ে দেয়। তাঁর কবিতার হাসির আড়ালে যে প্রশ্নগুলো লুকিয়ে থাকে, সেগুলিই তাঁর কবিতার সবচেয়ে বড় শক্তি। এই কারণেই তাঁর কবিতা আজও নতুন মনে হয় এবং বাংলা কবিতায় তিনি একজন সত্যিকারের স্বতন্ত্র কবি হিসেবে স্মরণীয়।

তথ্যসূত্র:

১. রায়, তারাপদ। শ্রেষ্ঠ কবিতা। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯৬, পৃ. ২৯।
২. তদেব, পৃ. ৮।
৩. তদেব, পৃ. ৮২।
৪. তদেব, পৃ. ৮২।
৫. তদেব, পৃ. ৩৯।
৬. তদেব, পৃ. ৪৫।
৭. তদেব, পৃ. ৪৫।
৮. তদেব, পৃ. ৪৯।
৯. তদেব, পৃ. ৪৯।
১০. তদেব, পৃ. ৪৯।
১১. তদেব, পৃ. ৭৮।
১২. তদেব, পৃ. ৭৮।
১৩. তদেব, পৃ. ৭৯।
১৪. রায়, তারাপদ। শ্রেষ্ঠ কবিতা। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯৬, পৃ. ১০৭।
১৫. রায়, তারাপদ। শ্রেষ্ঠ কবিতা। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯৬, পৃ. ৭৭।
১৬. রায়, তারাপদ। রচনাসমগ্র, পঞ্চম খণ্ড। লালমাটি প্রকাশন, সম্পাদনা নিমাই গরাই, প্রথম প্রকাশ ২০২৩, ৩ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, পৃ. ৪৪৭।
১৭. তদেব, পৃ. ৪৫৩।
১৮. রায়, তারাপদ। শ্রেষ্ঠ কবিতা। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯৬, পৃ. ৬০।
১৯. রায়, তারাপদ। রচনাসমগ্র, দ্বিতীয় খণ্ড। লালমাটি প্রকাশন, ৫/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, বইমেলা ২০১৫, পৃ. ৪৮৪।
২০. রায়, তারাপদ। শ্রেষ্ঠ কবিতা। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯৬, পৃ. ৩০।
২১. রায়, তারাপদ। শ্রেষ্ঠ কবিতা। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯৬, পৃ. ৩৮।



‘মহানদী’: প্রবাহমান উপাখ্যান

বেবী পারভীন, গবেষক, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর, অসম, ভারত

Received: 06.01.2026; Accepted: 13.01.2026; Available online: 28.02.2026

©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

Abstract

Anita Agnihotri's novel *Mahanadi* (2015) stands out as a remarkable example in the tradition of river-centric novels. In *Mahanadi*, there is no conventional backdrop of plot, story, or narration. The novel does not focus on a specific region or settlement; rather, as the river flows, twists, and turns, new people emerge in the narrative. Starting from the Malbhum region of Chhattisgarh, the Mahanadi travels over five hundred crores of distance, eventually merging into the Bay of Bengal. The novel does not follow a continuous storyline and is divided into twelve chapters.

It portrays the lives of weavers, blacksmiths, farmers, artisans, fishermen, and forest-dwelling people, alongside the displacement of hundreds of individuals in the name of dam construction and development. In April 1948, the then Chief Minister of Odisha, Dr. Harekrushna Mahatab, inaugurated the Hirakud Dam through Prime Minister Jawaharlal Nehru. At that time, 24 impoverished, illiterate families were uprooted from Jamda without any preparation. These landless, nearly destitute tribal and marginalized families were never provided alternative housing, nor did they receive any compensation. They had to leave behind their homes, household belongings, and cultivated fields.

The author shows how the weavers were reduced to wage laborers in their own craft. For the artisans of Maniabandh, survival required daily struggle; the scarcity of capital made their lives unbearable. Extreme poverty and lack of resources strained marital relationships and even extinguished the basic desire to survive. Karna's suicide in the novel highlights this harsh reality. The artisans' poverty is so severe that the same vessel they use to dye cloth is used to cook rice. Many women from fishing families, like Parvati, often do not get enough food daily; their children suffer from the heat in urban areas.

The novel spans a vast region, from the Malbhum plateau in Chhattisgarh to the estuary of the sea, reflecting both human and environmental dimensions along the river's journey.

Keywords: Helpless wildlife, Hirakud Dam, displaced people, water blasting, weavers, forest-human interaction

প্রথম পর্ব ‘বৈদ্যরাজ’ এ এসেছে ফরেস্টার অবধূত সিং, গোঁড় আদিবাসী তুলারাম ধুরু ও তার পত্নী পুনরি এবং ছত্রিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী সুজন কুমারের প্রসঙ্গ। তুলারাম ধুরুকে এক ডাকে মানুষ চেনে বৈদ্যরাজ বলে। গ্রামের কোন কোন আলসে স্বার্থপর মানুষ মছল কুড়ানোর সুবিধার্থে বনের ঘাসে আগুন লাগিয়ে দেয়। ফলে পুড়ে ছাই হয়ে যায় ঘাস। ঘাসের সঙ্গে পুড়ে নষ্ট হয়ে যায় ভূমিতে পড়ে থাকা বীজ, লতাগুল্ম, পড়ে থাকা বরা পাতা যা বৃষ্টির জলে পচে পরিণত হতো জৈব সারে। ঔপন্যাসিকের ভাষায়, “অরণ্য তার ত্বক, পিঠ, বুক, মুখের

হাসি সবকিছুর ভাঁজে, পরতে জমিয়ে রাখে নানা সম্পদ অসময়ের জন্য”। আর এসব এক নিমেষে শেষ করে দেয় কিছু স্বার্থপর মানুষ। ‘সন্দুর’ নামের নদীটিতে বাঁধ দেওয়ার ফলে নদীটির জলভান্ডার বিশাল এক অরণ্য অঞ্চল, গাছপালা এবং পশুপাখিদের বিচরণভূমিকে ডুবিয়ে দেয়। এই জল শাল, বিজা, সাজা, হলুদ, আমলকী গাছেদের, অজস্র শিয়াল, ডাক হরিণ, লঙ্গুর, ভালুক, উড়ু কুঁচকাঠবিড়ালি, হায়না, কুমির, ভোঁদড়, মাছরাঙা, ধনেশ, জলপিপি, কুম্ভাটুয়া, দয়েল, অজস্র সাপ এবং সরীসৃপ সমস্ত কিছুকেই শেষ করে দিয়েছে এক লহমায়। গুটি কয়েক মানুষের সুবিধার্থে মানুষ বাঁধ তৈরি করে দিনের পর দিন নিশ্চিহ্ন করে দিচ্ছে বহু প্রাণ। আধুনিক পৃথিবীর এই জ্বলন্ত সমস্যা অনিতা অগ্নিহিত্রী ‘মহানদী’ উপন্যাসে সহমর্মিতার সাথে তুলে ধরেছেন। অবিবেচক মানুষদের নির্বিচারে বন ধ্বংস করার কারণে বনাঞ্চলে প্রাণীদের জায়গার টানাটানি, তাদের থাকার জায়গা মানুষ কেটে পুড়িয়ে ধ্বংস করছে দিনের পর দিন, গ্রীষ্মে খাওয়ার জল নেই যখন তখন আগুনের ভয়, চোরা শিকারির ভয়, পালিয়ে কোথাও গ্রামে ঢুকলে মানুষের মার, ট্রেনে কাটা পড়ছে হাতি, বাঘ, সম্বর হরিণ। উপন্যাসে লেখিকা দেখিয়েছেন চলতি গাড়ির ধাক্কায় মারা পড়েছে কচি একটা হায়না, বয়স ছ’মাসও হয়নি। এভাবেই প্রতিনিয়ত হারিয়ে যাচ্ছে অসংখ্য বন্যপ্রাণ।

এক হৃদয় ভারাক্রান্ত করা কাহিনী পর্ব হল ‘মল্ল সই’। মহানদীর বন্যায় কটক ও অববাহিকা অঞ্চল প্লাবিত হয়, হীরাকুদ বাঁধ নির্মাণ করে তাই সম্বলপুরের ২০০ গ্রামকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় জলের তলায়-রাজ্যের উপকূল অঞ্চলের স্বার্থে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের বলি দেওয়া হয়। মহানদীর কূলে সদা জলে ছিল ছিল কুঠোরপালি থেকে তাদের খেদিয়ে দেওয়া হয়েছিল পাহাড় জঙ্গলে ঘেরা জুজুমারা পঞ্চগয়েতের নুয়াবলভায়। তাদের অসহায় চোখের সামনে তাদের নিজের হাতে লাগানো খেতের পাকা ধান ডুবে গিয়েছিল। সরকার বলেছিল-

“ওসব রেখে যাও আর আকাটা গাছটাছও। তোমাদের টাকা ধরে দেওয়া হবে-ওই সব রেখে যাওয়া জিনিসের মূল্য। সে ক্ষতিপূরণ আর কোনওদিন আসেনি। একর পিছু ৪০০ টাকা মতো নিয়ে ওদের চলে আসতে হয়েছিল। কুঠোরপালির এরাই ছিল হীরাকুদ বাঁধভাসিদের শেষ উদবাস্ত দল।”^১

শ-দেড়েক মানুষের জীবনের ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ-চল্লিশ বছরের উপার্জন সব শূন্য হয়ে গিয়েছিল একদিনে। হিমিরানী ঘরছাড়া মানুষদের কষ্টের কথা মুখে বলতে পারতো না বলে বালক কুবের কে ডানা ছটফটনো পাখিদের কথা বলে ঘুম পারাতো-

“পাখিগুলি জলের উপর গোল হয়ে ওড়ে আর ওড়ে। কে বলে দেবে কোন গাছে ছিল তাদের না ফোটা- ডিম, তাদের না উড়তে শেখা ছানারা”^২

বাস্তব্যুত হওয়া মানুষদের নুয়াবলভায় গিয়ে অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয়েছিল। সেখানে কোন নদী ছিল না। সরকার থেকে যে কয়েকটি কুয়ো খুঁড়ে দিয়েছিল তার জল পানের যোগ্য ছিল না। বন কেটে জমি খালি করতেই কুড়ি বছর লেগেছিল, চাষের কোন জমি ছিল না। বৃদ্ধদের কথায়-

“বন কেটে জমি খালি করে চাষের উপযুক্ত করে তুলতেই কেটে গেল আমাদের যৌবনকাল।... ডাক্তার আসত আট দিনে এক দিন। দিগরে হাসপাতাল ছিল না। মানুষ মরার হাল হলে মুখে একটু মহানদীর জল দিয়ে বসে বসে দেখতাম”^৩

কি নিদারুণ যন্ত্রণায় কষ্টে দিন কেটেছে ভাবাও যায় না। এই বাস্তব্যুত কিসান, কুলতা, গোন্ড, নাপিত, ধোপাদের সরকার তো খেদিয়ে দিয়েছিল তার সাথে আমিন ইঙ্গপেণ্টের রাও জোঁকের মতো রক্ত চুষে খেয়েছিল। বৃদ্ধরা জানায়-

“ঘুষ চাইতো সবাই। না দিলে ভুলভাল মেপে দিত জমির চৌহদ্দি। টাকাঅলা আর উপর জাতদের ভালো ভালো নিচু জমি বেছে বেছে দিত... ওদের জন্যই তো মরলাম আমরা”^৪

হীরাবুদের জলভান্ডারের জন্য যারা ঘর আর জমি ছেড়েছিল তারা কেউই ন্যায্য ক্ষতিপূরণ পায়নি। ঘরের দাম, গাছের দাম, জমিয়ে দাম সবকিছু ধার্য করা হয়েছিল বাজারদরের অনেক নিচে। হীরাবুদ বাঁধের ভিত পাথর স্থাপন করতে এসে স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু বলেছিলেন যে কষ্ট যদি পেতেই হয় তবে দেশের স্বার্থে কষ্ট স্বীকার করো। কষ্ট তারা পেয়েছে ঠিকই তবে সেটা কতখানি দেশের জন্য এবং আর কতখানি ক্ষমতাশালী শ্রেণীর স্বার্থপরতায়- তা ভাবার বিষয়।

হীরাবুদ জলভান্ডার থেকে বেরিয়ে মহানদী সম্বলপুর হয়ে সুবর্ণপুরে ঢুকেছে। এই ‘সুবর্ণপুর’ পর্বে লেখিকা জানিয়েছেন হীরাবুদ বাঁধ বাঁধার পর থেকে নদীতে মাছ কমা শুরু হয়েছে। শুধু তাই নয় সোনপুরে, কিয়াকাটাতে নদীর উপর ব্রিজ তৈরির ফলে নৌকো চালানো যাদের বংশানুক্রমিক বৃত্তি ছিল তারা কাজ হারা হয়ে নিঃস্ব হয়েছেন। সবচেয়ে যা ভাবনার বিষয় লেখিকা তুলে ধরেছেন তা হল জলে ব্লাস্টিং। স্থানীয় লোক, ধীবর কেওটরা অল্প পয়সার লোভে এই চক্রে জড়িয়ে গিয়েছিল। ব্লাস্টিং- এ বড় মাছ মরে, অসাধু লোভী ব্যবসায়ীরা সেই মাছ কম দামে দ্রুত বিক্রি করে। প্রতিনিয়ত ব্লাস্টিং এর ফলে জল হয়ে যায় ভীষণ পরিমাণে দূষিত। লেখিকা লিখেছেন-

“লাগাতার জলে ব্লাস্টিং আর চিংড়ি মারার জন্য বিষ দেওয়ার ফলে মাছের ফলন কমে তলানিতে ঠেকেছে ঝরাপাড়া”^৫

এই পর্বে আছে দুটি কাহিনী- সত্যেন্দ্র স্মিতা সুবলের কাহিনী আর কৈবর্ত মাঝি নীলকণ্ঠের জীবন হারানোর কাহিনী। অভাব অনটনের মধ্যেও সুবলের মধ্যে সাহিত্য রচনা সুগুণ প্রতিভা বিদ্যমান। আর তার পাশে রক্ষাকর্তার মত পাশে থেকেছেন উদার মনোভাবাপন্ন অধ্যাপক সত্যেন্দ্র প্রধান। ঝাড়খণ্ডের মেয়ে দিল্লিতে কর্মরত অধ্যাপিকা স্মিতা কুজুর ও পঁচাত্তর বছর বয়সী প্রবীণ গান্ধীবাদী সাবিত্রী দেশমুখ এর সংগ্রামী সত্তা উপন্যাসে উঠে এসেছে। নীলকণ্ঠ ওরফে গঙ্গারাম এর জেলে জীবনের বেদনা লেখিকা সুনিপুন ভাবে এঁকেছেন। অভিশপ্ত হীরাবুদ বাঁধ ও তার উপর নির্মিত ব্রিজ নৌকার মাঝিদের পাশাপাশি জেলে জীবনকেও সংকটাপন্ন করে তুলেছে। স্মিতার ভাবনার মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক নিজের ভাবনাই ব্যক্ত করেছেন-

“প্রকৃতি, পাহাড়, নদী জল, মৃত্তিকাজাত ঐশ্বর্য তা কি আর ভূমির সন্তানদের আছে?”^৬

তাঁত শিল্পীদের জীবনের নিদারুণ বাস্তব চিত্র উঠে এসেছে ‘উপনদী’ পর্বটিতে। ‘তেল’ হল মহানদীর সবচেয়ে বড় উপনদী। তেল ও মহানদীর সঙ্গমে আছে বৈদ্যনাথ নামের গ্রামটি। এই গ্রামেরই রমেশ মেহের প্রতিভাহীন তাঁত শিল্পী থেকে হয়েছে সম্পন্ন ব্যবসায়ী। অনেক তাঁতি গ্রামে তাঁতিকে কাজ জোগানের লক্ষ্যে গড়ে উঠেছিল অসংখ্য সমবায় সমিতি। কিন্তু এগুলি প্রায় বেশিরভাগই সুতো-মজুরির দুর্নীতিতে ডুবে গিয়েছিল, খাতা কলমে শয়ে শয়ে তাঁতির নাম লিখে রাখে তারপর সেই নাম গুলো ব্যবহার করে ভুয়ো উৎপাদনের হিসেব দেখিয়ে সরকারি ভর্তুকি নেয়। এমনকি সমিতির স্টক দেখানো হয় বাজার থেকে হোলসেল দরে কাপড় কিনে। এই সমবায় সমিতি এক দশমাংশ তাঁতিকেও কাজ জোগাতে পারে না। তাঁত শিল্পীরা হারে হারে টের পেয়েছে-

“যে তারা আসলে শিল্পী নয়, তাঁত মজুর মাত্র।”^৭

তারা বুঝেছে সমিতির ভরসায় থাকলে মাসের সাত দিনের বেশি কাজ তারা পাবে না এবং শুকিয়ে মরতে হবে। লেখিকা তুলে ধরেছেন শিল্পীদের কিভাবে তাঁত শিল্পী থেকে মজুরে পরিণত করা হয়েছে। মাস্টার উইভার-

‘মাস্টার’ এর দল সমিতির ভগ্নদশা থেকে উঠে এসে মজুরদের মালিকে পরিণত হয়েছে। ভাড়ায় নেওয়া বড় বড় কারখানায় মজুর খাটায় আর লাভ করে নিজের আখের গুছিয়ে নেয়। মাথার ওপর ছাদ, নীচে দুই পা রাখার গর্ত, তাঁতটি এবং নিজের শরীর- এসব ছাড়া তাঁতির নিজস্ব বলতে আর কিছুই নেই। নিজের শরীর জ্বালিয়ে পুড়িয়ে অকালেই ঝরে যায় তাদের জীবনটুকু। চোখে চশমা চড়ালেও সে চশমা বদলানোর সামর্থ্য থাকে না তাদের। বর্ষায় গর্তের মধ্যেই দুটি পা কনকন করতে থাকে, জ্বর হলেও কাজ ছেড়ে ওঠার কোন উপায় তাঁতির নেই। আধপেটা খেতে খেতে দশ দিনের জ্বরে বেঘোরে মরে যাওয়া গেছে সাধারণ ঘটনা। উপন্যাসে এসেছে কাপড়ে কেমিক্যাল রঙের পরিবর্তে ভেষজ রঙের ব্যবহারের প্রসঙ্গ। মূল্য বৃদ্ধির বাজারে পঞ্চাশ বছরেও তাঁতিদের কোন মজুরি বাড়েনি। পিছু হটতে হটতে তাঁতিদের দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে। সুনিপুণ দক্ষতায় ঔপন্যাসিক তুলে ধরেছেন কিভাবে মজুরদের শোষণ করা হয়-

“রমেশ দ্রুত ভেবে নিচ্ছিল, মজুরি বাড়ার আগে- কোথা থেকে কত স্টক সে পুরনো দামে তুলতে পারবে- যাতে মাস ছয়েক তার লাভের টাকায় হাত না পড়ে। হ্যাঁ, অবশ্য দামও সে বাড়াবে-বাইরের বাজারে বলবে, নিজে থেকে মজুরিদের মাইনে বাড়িয়েছে, কাজেই বাড়ি দামটা যাবে শ্রমিকদের হাতে- এতে দামী দোকানে সমাজে পরিচিত ক্রেতারা খুশি হন-মনে করেন, এই জিনিস কিনে তারাও সামাজিক কর্তব্য করছেন।”^৮

মজুরি বাড়ানোর আন্দোলনে তাঁত শিল্পী, বুনাকারদের একজোট করা খুবই পরিশ্রম ও সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। বিষয়টা রমেশের মতো ব্যবসায়ীদের ভালোমতোই জানা থাকে বলেই টাকার ব্যবহার করে মজুরি বাড়ানোর আন্দোলন ভেস্তে দিত তারা। সুবর্ণপুরের তাঁতের এত নাম ডাক থাকা সত্ত্বেও ঝরা মেয়েদের গায়ে তাদের শাড়ি উঠত না। কারণ তাঁতের একটা সস্তা শাড়িও চারশোর কম নয়, তারা পরে একশো কুড়ি টাকার ছাপা মিলের শাড়ি। ঔপন্যাসিক এখানে তাঁতিদের অবর্ণনীয় দুঃখ দারিদ্র্যের ছবি এঁকেছেন।

‘প্রত্নবিষাদ’ পর্বে এসেছে হারাধন মাস্টার ও গন্ধ আদিবাসীদের জীবন যাপন। হারাধন মাস্টারের প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য ও ইতিহাসের অনুসন্ধান আসলে নিজের মাতৃভূমির প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা প্রদর্শন। ‘নির্জন, গভীর’ পর্বে ঊনপঞ্চাশ বছর বয়সী সাংবাদিক রঙ্গ অভয়ারণ্যের গভীরে কোর এরিয়ার ছোট, বিচ্ছিন্ন গ্রাম গুলোর খবর সংগ্রহ করতে গিয়েছিল। কিন্তু দারিদ্র্যের উলঙ্গ রূপ দেখতে এসে অস্বস্তি বোধ করে। শারীরিক চাহিদা, ইচ্ছেমতো দীর্ঘদিনের সঙ্গিনীকে একঘেয়েমির অজুহাতে ছেড়ে দেওয়া, অরণ্য অঞ্চলে অবর্ণনীয় দারিদ্র্যে ভোগা মানুষগুলোর কথা শোনার মধ্যে যে কৃত্রিমতা তা রঙ্গ চরিত্রটিকে একটি অমানবিক চরিত্র রূপে চিত্রিত করেছে। রঙ্গের প্রশ্ন শুনেই বঞ্চিত নিরাপত্তাহীন বিচ্ছিন্ন জনপদ ক্ষোভে হয়ে উঠেছিল মারমুখী। সুমনা চরিত্রটি সহকর্মী সচেতন সংবেদনশীল নারী রূপে অঙ্কিত হয়েছে। এই পর্বে রঙ্গ আদিবাসী হরমু চরিত্রটি একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র। তার মুখে বর্ণিত গল্পগুলি পাঠকের মন ভরিয়ে দেয়। এই পর্বটিতেই জানা যায় সাবিত্রী ও স্মিতা কেন কোথায় এসেছিলেন আর কেনই বা তারা জনতা দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলেন। নিয়মগিরি পর্বত অঞ্চলে বক্সাইট খনন নিয়ে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সঙ্গে শিল্পসংস্থার টানা লড়াইয়ে এক নিরপেক্ষ তৃতীয় সংস্থার অনুরোধে সরেজমিনে তদন্তে এসেছিলেন সাবিত্রী ও স্মিতা। এই বিষয়ে স্থানীয় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে কিছু আলোচনা করতেই নির্দিষ্ট সময় ঠিক করে তারা থানায় গিয়েছিলেন। জনতা যখন সাবিত্রী ও স্মিতা কে থানার মধ্যেই আক্রমণ করেছিল তখন পুলিশ জনতাকে কোনরকম আটকানোর চেষ্টা করেনি। এই প্রসঙ্গে চরম বাস্তবতা মূলক বাক্য উঠে এসেছে উপন্যাসে-

“রাষ্ট্রের হয়ে শিল্প যখন ক্ষমতাশীল জনমতকে নিয়ন্ত্রিত করতে সফল হয়, তখন পুলিশ কে লাঠিও চালাতে হয় না।”^৯

ঔপন্যাসিক উপন্যাসে এই প্রসঙ্গে লিখেছেন যে শাসকপক্ষ চালিত রাজ্যে এমন ঘটনা ঘটলে কেন্দ্র না দেখার ভান করে থাকে অন্যদিকে বিরোধী শাসিত রাজ্যের সমালোচনা শাসক দল করলে বিরোধীদল আইন শৃঙ্খলায় হস্তক্ষেপ এর অভিযোগ নিয়ে আসে। অনিতা অগ্নিহোত্রী সুনিপুণভাবে সমকালীন রাজনীতিকে তুলে ধরেছেন। অমর্ত্য মুখোপাধ্যায় ‘অনিতা অগ্নিহোত্রীর মহানদী: একটি বিমোহিত, অসংলগ্ন প্রতিক্রিয়া’ তে লিখেছেন, ‘অনিতার এই উপন্যাস পড়ে আমরা বুঝি যে অত্যাচারী রাষ্ট্র আর বৃহৎ বেসরকারি পুঁজির এই নব্য উদারনৈতিক প্রণয়ের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের প্রতিবাদের রাস্তা বন্ধ।’

অভয়ারণ্য কোর এরিয়ার মধ্যে যে গ্রামগুলি রয়েছে সেই গ্রামগুলিতে বহু বছর ধরেই মানুষ বসবাস করতো, অরণ্যই ছিল তাদের চারপাশে অভয়ারণ্য ঘোষিত হয়নি তখন। একসময় অরণ্যের গভীরতায় আঘাত হেনেছিল কুঠার। শুরু হয়েছিল জল, ফল ও পশু মাংসের জন্য মানুষ ও পশুর দ্বন্দ্ব। তার চেয়েও অনেক বেশি বিপদ হেনেছিল বহিরাগত ব্যবসায়ীদের লোভ। পরবর্তীতে শিল্প শেষ পেরেকটি পুঁতে দেয়। তাদের লোভে লাগাম দিতেই এসেছিল জঙ্গল আইন, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন। কিন্তু অভয়ারণ্য চিহ্নিত হয়ে যাওয়ার পরে অরণ্যের কোলে শৈশব থেকে লালিত অরণ্য- সন্তানদের আশ্রয় হয়ে উঠলো অনিশ্চিত। এর ফলশ্রুতিতেই একের পর এক অরণ্য গ্রাম ঠিকানাহীন মানুষের বাসভূমিতে পরিণত হয়েছিল। হরমু এমনই এক সবদিক থেকে বঞ্চিত গ্রামের বাসিন্দা। হরমুর গ্রামের বাসিন্দাদের দুঃখ, দুর্দশা, দারিদ্রতা শহরবাসী মানুষের ভাবনারও বাইরে। চারিদিকে ঘন জঙ্গলের মধ্যে পাতা বা টালি ছাওয়া মাটির ঘরে বাইশ তেইশ টা পরিবার। এই গ্রামের মানুষ দারিদ্র ও অপুষ্টিতে ভুগে ভুগে সময়ের আগেই বলসে বুড়ো হয়ে গিয়েছে। চাষের জন্য জল থাকেনা, কোর এরিয়া হওয়ায় নদীর জল তুলতে পারেনা। বর্ষার জলে ভরসা করে যতটুকু ধান, মকাই, শাকসবজি ফলায় সেইসব নীলগাই, বরাহ আর হাতির দল পায়ে দলে নষ্ট করে দেয়। গ্রামবাসীদের আক্ষেপ-

“বনের প্রাণীর রক্ষার জন্য আইন আছে, মানুষের পেটের ক্ষিদে মেটাবার জন্য কোনও আইন নেই। খালি হাতে, তাড়া করে ওদের ভাগাই। আগুন জ্বালতে পারবো না কোর এরিয়ার মধ্যে আগুন বারণ। খালি হাতে লড়ে লড়ে আমরা হয়রান হয়ে গেছি।”^{১০}

খাদ্যের অভাবে তারা জঙ্গল থেকে কন্দমূল তুলে খায়। খেজুরের চাটাইয়ে কন্দমূল শুকোতে দেখে সুমনার বুকের ভেতরটা ছটফট করে উঠেছিল। ঔপন্যাসিক এই পর্বে অরণ্য বাসি মানুষদের দুঃখ দুর্দশার সুনিপুণ ছবি অত্যন্ত সহমর্মিতার সাথে তুলে ধরেছেন।

কন্টিলো গ্রামে কাঁসারিদের বসবাস এবং কাঁসা ধাতু নির্মাণে কাঁসারীদের অমানুষিক পরিশ্রম ঔপন্যাসিক তুলে ধরেছেন। কাঁসার পাত্র তৈরি করতে কাঁসারিদের ‘বুকের রক্ত মুখে উঠে আসে’-তবু ক্রেতার কাঁসার সঠিক মূল্য বোঝেনা। ‘নীলমাধব’ পর্বে উঠে এসেছে সমকালীন অন্ধপ্রদেশ ও ছত্রিশগড় সীমান্ত অঞ্চলে মাওবাদী উগ্রপন্থী সংগঠনগুলির প্রসঙ্গ। মাওবাদীদের সঙ্গে লড়াইয়ে আশু কামারের পুলিশ পুত্রের উরুর ওপর থেকে দুটি পা কেটে বাদ দিতে হওয়ায় আশুর পরিবারকে ক্ষতবিক্ষত করেছিল। ১৯৯৯ এর মহাবাত্যায় বাবা মা হারা শিশু সন্তানকে শবর রমণী শনিচড়ীর সাহায্যে মানুষ করেছিল আশবরী। আশাবরী শিশু কন্যার নাম রেখেছিল ঝাঞ্জা। অকাল বর্ষণ ও ঘূর্ণিঝড়ে উপকূল অববাহিকা অঞ্চলের বিধ্বস্ততা উপন্যাসে উঠে এসেছে।

‘টানি ও ভরনি’ পর্বে আছে বান্ধু শিল্পী উপমন্যু ও তার ভাই নিরঞ্জন এর কাহিনী। উপমন্যু পুরনো সংগ্রহের ব্যাকুলতার জন্য অনেক ঠকেছেন। দীর্ঘ ছয় বছরের নিরলস পরিশ্রমে তিনি রেশম বস্ত্রের ওপর জয়দেবের গীতগোবিন্দ লিখেছেন। এই দীর্ঘ সময়ে নিরামিষ আহার, স্ত্রী সঙ্গ ত্যাগ এবং চার বছরের শিশু সত্যবান হয়ে উঠেছে দশ বছরের সবল বালক। শিল্পের জন্য শিল্পীর এই আত্মত্যাগ, সাধনা কুর্নিশ জানানোর মতো বিষয়। ‘ময়নাতদন্ত’ পর্বে মানিয়াবন্ধের বুনাকারদের জীবনচিত্র এঁকেছেন ঔপন্যাসিক। মানিয়াবন্ধে প্রত্যেক ঘরে অভাব

অনটন লেগেই থাকে। অভাবের পাঁকে মানুষ এমন ভাবে ডুবে থাকে যে তাদের মাথাপিছু আয় কত সেটা তারা হিসেব করার সময় পায় না। মহাজন সুদের টাকা গুনে নেয়, পাইকারি কাপড়ের ব্যবসাদার সুতো, রং দানন দিয়ে যায় দরজার কাছেই। দাননদাররা দরজায় আসে বলে প্রতি কাপড়ে পঞ্চাশ টাকা করে কম মজুরি দেয়। বুনাকারদের এমন মনের জোর, দেহের বল নেই যে হাটে গিয়ে নিজে বেঁচে আসবে। ঔপন্যাসিক লিখেছেন-

“দারিদ্র্য মানুষের শিরদাঁড়ার ভিতরে ঘুণ ধরিয়ে দেয়। কতখানি পঙ্গু হয়ে যায় মানুষ, তা সে নিজেও জানে না।”^{১১}

মানিয়াবন্ধে শতাব্দিক হতদরিদ্র পরিবার আছে যাদের না আছে চাষের জমি না আছে তাঁত। দানন নিয়ে বান্ধসুতোর কাজ করে। মহাজনের কাছে পরাধীন দিন আনা দিন খাওয়া এই বান্ধকাজের কোনও শিল্প মূল্য থাকে না। রঙ্গনী বান্ধকার কর্ণকুমার তোষ অভাব অনটনে সুতো রাঙ্গানোর কেমিক্যাল- পটাশিয়াম নাইট্রেট খেয়ে মারা যায়। এটা আত্মহত্যা হলেও আসলে এটা মার্ডার। উপন্যাসে এসেছে গত আট বছরে সাতচল্লিশটা মৃত্যু ঘটেছে এই সুতোর রাঙানোর কেমিক্যাল দিয়ে। সরকার, রাজনৈতিক নেতারা ভালো করেই জানে যে অভাব অনটনে মৃত্যু ঘটছে কিন্তু তদন্ত রিপোর্টে কখনোই লেখা থাকে না এই অনাহারের কারণে মৃত্যুর কথা। টেক্সটাইল ইন্সপেক্টর অরুণ কে ময়না তদন্ত রিপোর্টে সরকারের কাছে পেশ করতে হয় যে কর্ণ কুমার সত্যিই অভাবে মরেনি, ক্ষিদেয় মরেনি।

অধিকাংশ তাঁতমজুরের ঘরেই রং ফোটার আলাদা পাত্র থাকে না, একই পাত্রে রং ফোটায়, আবার সেই পাত্র ধুয়েই ভাত রাঙ্গা করে। বিষাক্ত কেমিক্যাল পেটে গেলেও তাদের সামর্থ্য থাকে না আর একটা পাত্র কেনার। কাজের মরশুমে পুরো পরিবার মিলে মাসে আয় হয় দেড় থেকে দু হাজার। এই যৎসামান্য টাকায় কি করে যে সংসার চলে, কতটা অভাব অনটনে চলতে পারে এই টাকায় তা অনুমান করতেও কষ্ট হয়। এদের কারো জমি নেই কেবল মজুরির টাকায় ভরসা। উপন্যাসে এসেছে চল্লিশ বছর বয়সী তাঁত মজুর কে সত্তরের বৃদ্ধ মনে হয়। এই পর্বেই আছে দুই বৃদ্ধ ও বৃদ্ধার প্রসঙ্গ। সেই বৃদ্ধটির নতুন চশমা দেখে বালকের মতো চিৎকার করে কেঁদে উঠেছিল অরুণ। চশমাটি ছিল-

“সম্পূর্ণ ভাঙ্গা নয়, ফ্রেমে ধরা আছে দুটি ফাটা ও পাঁচশ কাঁচ, একদিকে একটি তার দিয়ে ডাটি বানানোর চেষ্টা হয়েছে, অন্যদিকে একটি মোটা দড়ি.... এটা মাঝে মধ্যে পরা হয়। নতুন কিনা।”^{১২}

অনিতা অগ্নিহোত্রী লিখেছেন যে স্বাধীনতার ষাট বছর পর আমাদের এক গুণী কারিগরের চশমাটি এইরকম। ‘মোহানা’ পর্বে প্রকাশ পেয়েছে সার কারখানার বিষে ভেতর নদীতে মাছ আসে না, অন্যদিকে বার নদীতে কুমিরের ডিম দেওয়ার কারণে মাছ ধরা নিষিদ্ধ হয়। এ কারণে ছেলের বৃত্তি অনিশ্চিত হয়ে পরে। জেলে পরিবারের পার্বতীর মত বহু নারী অল্পসংকটে ভোগে। পার্বতীর ছেলে শহরে হোটেলে কাজ নিতে বাধ্য হয় এবং সেখানেও অত্যাচারের শিকার হয়। কিন্তু লুনকুয়া একটা সময় সমৃদ্ধ কুমোর শিল্পীদের গ্রামে পরিণত হয়।

ছত্রিশগড়ের মালভূমি থেকে মহানদীর পথ চলা শুরু হয়েছিল। জগৎসিংহপুরের বঙ্গোপসাগরে এসে তার যাত্রা শেষ হয়। হীরাকুদের উচ্ছিন্ন মানুষের দীর্ঘশ্বাসে ঝঞ্ঝা তাড়িত উপকূল অঞ্চলের আর্ত কান্না আজও মিশে আছে। কুবের, নীলকণ্ঠ, সুবল, হরমু জানি, শম্ভু মহাকুদ, হারাধন ভোই, আশু কাঁসার, কর্ণ কুমার, পার্বতী এদের কখনো পরস্পরের সঙ্গে দেখা হবে না। কিন্তু মহানদীর সূত্রে জীবন যাপনের বৃত্তান্তে তারা বাঁধা পড়ে যাবে।

তথ্যসূত্র:

১. অগ্নিহোত্রী, অনিতা। মহানদী। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা- ৭৩, প্রথম প্রকাশ: ২০১৫, পৃ. ৪২।
২. তদেব, পৃ. ৪৮।
৩. তদেব, পৃ. ৫১।
৪. তদেব, পৃ. ৫১।
৫. তদেব, পৃ. ৮৪।
৬. তদেব, পৃ. ৭৮।
৭. তদেব, পৃ. ৯৩।
৮. তদেব, পৃ. ১০৪।
৯. তদেব, পৃ. ১৪৯।
১০. তদেব, পৃ. ১৬৯।
১১. তদেব, পৃ. ২৬৮।
১২. তদেব, পৃ. ২৯০।

সহায়ক প্রবন্ধ:

১. ভট্টাচার্য, শম্পা। মহানদী। চলমান জীবনের আখ্যান।
২. মুখোপাধ্যায়, অমর্ত্য। অনিতা অগ্নিহোত্রীর মহানদী। একটি বিমোহিত, অসংলগ্ন প্রতিক্রিয়া।



রবীন্দ্র নৃত্যনাট্য, প্রেম বনাম ন্যায়: একটি পর্যবেক্ষণ

প্রিহিলা সুলতানা, গবেষক, ফোকলোর বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী, বাংলাদেশ

Received: 20.01.2026; Accepted: 30.01.2026; Available online: 28.02.2026

©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

Abstract

This article analyzes the conflict between love and justice inherent in Rabindranath Tagore's dance dramas Chitrangada and Shyama. This conflict is not merely emotional; rather, it is rooted in deeper crises of self-identity, morality, and socio-cultural structures. Through an examination of dramatic characters, symbols, philosophical ideas, and social contexts, the article brings to light this dual experience. Tagore's two dance dramas thus offer fresh perspectives on modern feminist thought and humanistic ethics.

Keywords: Love and Justice, Self-Identity, Moral Conflict, Feminist Thought, Humanistic Ethics

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা (১৯৩৬) ও শ্যামা (১৯৩৯) বাংলা সাহিত্যের এমন দুই অনন্য সৃষ্টি, যেখানে নাটক, সংগীত, নৃত্য ও কাব্য একত্রে মিশে এক পরিপূর্ণ শিল্পরূপ লাভ করেছে। এই দুই নৃত্যনাট্যের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে এক গভীর দ্বন্দ্ব, প্রেম এবং ন্যায়। এই দ্বন্দ্ব শুধু নাটকীয় ঘটনার মধ্যেই নয়, বরং চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক দ্বিধা, নৈতিক সংকট এবং আত্ম— উন্মোচনের মধ্য দিয়ে এক বহুমাত্রিক মানবিক সত্যে রূপান্তরিত হয়েছে। তাঁর রচিত নৃত্যনাট্যসমূহ বাংলা নাট্যধারায় এক গুরুত্বপূর্ণ নবধারার সূচনা করে, যা কেবল শিল্পের আঙ্গিকগত উৎকর্ষ নয়, নৈতিক, দার্শনিক এবং সমাজ— সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিতেও গভীর তাৎপর্য বহন করে। রবীন্দ্রনাথের এই নৃত্যনাট্যগুলির মধ্যে চিত্রাঙ্গদা এবং শ্যামা বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক, কারণ এই দুই রচনায় প্রেম ও ন্যায়— এই দুটি পরস্পরবিরোধী অথচ মানব অস্তিত্বের কেন্দ্রীয় অনুভবের মধ্যে এক অনুপম দ্বন্দ্ব তুলে ধরা হয়েছে। বিশ্বনাট্য সাহিত্যে প্রেম ও ন্যায়ের দ্বন্দ্ব নতুন কিছু নয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এই দ্বন্দ্বকে উপস্থাপন করেছেন ভারতীয় ঐতিহ্য, পৌরাণিক কাহিনি ও সামাজিক প্রেক্ষাপটের ভেতর দিয়ে। যেখানে চিত্রাঙ্গদা প্রেম ও আত্মপরিচয়ের এক মানবিক অভিযাত্রা, সেখানে শ্যামা প্রেমের জন্য ন্যায়ের বিসর্জনের এক নৈতিক সংকট। এই দুই নাটকে চরিত্রগুলি একদিকে প্রেমের আকাঙ্ক্ষা ও আত্মসমর্পণে প্রবৃত্ত, অন্যদিকে তারা এক গভীর দায়িত্ববোধ ও ন্যায়বোধের মুখোমুখি দাঁড়ায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাট্যচিন্তা ও নাট্য সৃষ্টি তাঁর সামগ্রিক সাহিত্যকর্মের একটি মৌলিক অঙ্গ। তিনি কেবল নাট্যকারই ছিলেন না, ছিলেন একজন নাট্য দার্শনিক। যিনি নাটককে কাব্য, সংগীত, নৃত্য এবং দর্শনের সংমিশ্রণে এক পূর্ণাঙ্গ শিল্পরূপে নির্মাণ করেছেন। তাঁর নাট্য ভাবনা ইউরোপীয় নাট্যচর্চা ও ভারতীয় নাট্য ঐতিহ্য— উভয়ের মিলনস্থলে দাঁড়িয়ে গড়ে উঠেছে। বিশেষ করে ভারতীয় দর্শনের অন্তর্গত আত্মা, কর্ম, ধর্ম, মোক্ষের মতো ধারণাগুলিকে তিনি নাট্যসাহিত্যের গভীরে সংযুক্ত করেছেন। প্রেম এবং ন্যায়— এই দুই মানবিক অভিজ্ঞতা সাহিত্য ও নাটকের চিরন্তন উপাদান। প্রেম মানে ব্যক্তিগত

আকাঙ্ক্ষা, আবেগ ও নিবেদন; অন্যদিকে ন্যায় মানে সামাজিক নৈতিকতা, কর্তব্যবোধ ও বিচারবুদ্ধি। ভারতীয় কাব্যতত্ত্বের ‘ধর্ম’ ও ‘শৃঙ্গার’— এর দ্বৈততা এবং পাশ্চাত্য দর্শনের প্লেটো— অ্যারিস্টটলীয় নৈতিকতা, উভয়ের ভেতরেই এই দ্বন্দ্ব বিদ্যমান। অ্যারিস্টটলের Poetics —এ ট্রাজেডির কেন্দ্রে থাকে ন্যায়ের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, আর প্রেম সেখানে বিপর্যয়ের কারণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। রবীন্দ্রনাথ এই দ্বন্দ্বকে শুধুমাত্র নাটকীয় সংকট হিসেবে ব্যবহার করেননি, বরং এক দার্শনিক অন্বেষার স্তরে উন্নীত করেছেন। তাঁর নাট্যচিন্তায় প্রেম ও ন্যায় পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, বরং পরিপূরক এবং দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েই চরিত্রদের আত্ম উত্তরণ ঘটে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা ও শ্যামা— এই দুটি রচনার ভেতর দিয়ে রবীন্দ্র— ভাবনার একটি মৌলিক ও তাৎপর্যপূর্ণ দিক প্রকাশিত হয়, তা হলো ‘বিচারচেতনা’র বিবর্তন। প্রেম ও ন্যায়ের দ্বন্দ্ব রবীন্দ্রনাথ কেবল আবেগ নয়, বরং এক উচ্চতর নৈতিক উপলব্ধির পথে দর্শককে নিয়ে যেতে চেয়েছেন।

চিত্রাঙ্গদা: স্বরূপ সন্ধানের মধ্য দিয়ে প্রেম—ন্যায়ের টানাপোড়েন:

চিত্রাঙ্গদা মণিপুর রাজকন্যা, যিনি জন্মসূত্রে যোদ্ধা, আর পুরুষ বেশে রাজকার্য পরিচালনায় অভ্যস্ত। যখন তিনি অর্জুনকে ভালোবাসেন, তখন প্রেমকে লাভ করতে সৌন্দর্য রূপে আশ্রয় নেন। এখানেই শুরু হয় আত্মপরিচয় ও প্রেমের মধ্যে সংকট। এর মধ্যে আত্মপরিচয়, সম্মান এবং প্রেমের প্রতি ন্যায়বোধের দাবি স্পষ্ট। প্রেম যদি প্রকৃত হয়, তবে তা নারীকে কেবল সৌন্দর্য রূপে নয়, সম্পূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে গ্রহণ করবে— এটাই চিত্রাঙ্গদার বিশ্বাস। এখানে প্রেম শেষ পর্যন্ত সত্য ও ন্যায়ের সাথে সামঞ্জস্য খুঁজে পায়; ‘চিত্রাঙ্গদা’ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত একটি নৃত্যনাট্য, যা মণিপুরের রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদার আত্মপরিচয়, প্রেম এবং আত্মমর্যাদার কাহিনি। এই নাটকে অর্জুনের প্রতি চিত্রাঙ্গদার প্রেম একদিকে ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা, অন্যদিকে নারীর স্বরূপ ও সম্মানের প্রশ্নকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। প্রেম এখানে আত্মপ্রকাশের একটি মাধ্যম হলেও, তা কখনো কখনো আত্মবিস্মরণের কারণও হয়ে দাঁড়ায়।

চিত্রাঙ্গদা রবীন্দ্রনাথের ‘পুরুষ বেশ ধারণী নারী’র একটি অনন্য রূপক। চিত্রাঙ্গদা মনঃপ্রাণে পুরুষের মতো গড়ে ওঠা এক রাজকন্যা, যিনি অর্জুনের প্রেমে পড়ে নারীত্বের অন্বেষা শুরু করেন। কিন্তু সেই প্রেম অর্জুনের জন্য তাকে নিজেকে বদলাতে হয়। চিত্রাঙ্গদার দ্বন্দ্ব— সে কি নিজের প্রকৃত সত্তাকে লুকিয়ে প্রেম পাবে, না প্রেমিকের কাছে নিজেকে প্রকাশ করবে? এ দ্বন্দ্ব ব্যক্তিগত আবেগ এবং আত্মমর্যাদার সংঘাত। এই সংঘাত প্রেম ও ন্যায়— দুইয়েরই পুনর্মূল্যায়ন। এখানে প্রেম স্বীকার করে আত্মপরিচয়কে, আর ন্যায় বোঝায় নারীর আত্ম— মর্যাদাবোধ। রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা কেবল একটি প্রেমগাথা নয়, এটি এক নারীর স্বরূপ সন্ধানের কাহিনি। চিত্রাঙ্গদা চায় অর্জুনের প্রেম, কিন্তু সে প্রেম চায় তার নারীত্বের রূপে, নয়, তার বীরত্বের পরিচয়ে। চিত্রাঙ্গদা নিজেকে রূপবতী করে তোলে এবং সেই রূপেই অর্জুন তাকে ভালোবাসেন। কিন্তু এই ভালবাসা তার নিজের কাছে সত্য বলে প্রতিভাত হয় না। এখানেই প্রশ্ন ওঠে— প্রেমের মধ্যে কি ন্যায়বোধ থাকা উচিত? যে প্রেম সত্য স্বরূপকে অস্বীকার করে, তা কি ন্যায়সঙ্গত? চিত্রাঙ্গদা যখন নিজের বীরঙ্গনা পরিচয়ে ফিরে আসে, তখন সে প্রেম এবং আত্মপরিচয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনের দাবি তোলে। এই দাবিই একটি নৈতিক প্রশ্নে পরিণত হয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্যটি মূলত মণিপুরের রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদার পৌরাণিক কাহিনিকে কেন্দ্র করে নির্মিত হলেও, এর গভীরে নিহিত রয়েছে এক নারীর আত্মপরিচয়ের সন্ধান। এ নাটকে রবীন্দ্রনাথ নারীর অস্তিত্ব, ভূমিকা, আত্মপ্রতিষ্ঠা ও সমাজ— নির্ধারিত নারী পরিচয়ের সংকটকে নাট্যরূপে প্রকাশ করেছেন। চিত্রাঙ্গদার কাহিনি কেবল প্রেম বা রূপান্তরের নয়, এটি নারীর স্বাধীনতা, আত্মমর্যাদা ও আত্মনির্ভরতার এক শিল্পিত নিবেদন। চিত্রাঙ্গদার মূল উৎস মহাভারতের অশ্বমেধ পর্বে বর্ণিত কাহিনি, যেখানে অর্জুন তার তীর্থযাত্রার

পথে মণিপুরে গিয়ে চিত্রাঙ্গদার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। তবে মহাভারতে চিত্রাঙ্গদা এক পরিপার্শ্ব চরিত্র মাত্র। রবীন্দ্রনাথ এই কাহিনিকে নতুন আঙ্গিকে ব্যাখ্যা করে একটি স্বাধীন, আত্মপ্রত্যয়ী নারীচরিত্র নির্মাণ করেন। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল এমন এক সমাজ নির্মাণ, যেখানে নারী কেবল প্রেমের বস্তু নয়, বরং এক কর্মনিষ্ঠ, বুদ্ধিসম্পন্ন, আত্মপরিচয় সম্পন্ন মানুষ। এই দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে চিত্রাঙ্গদা চরিত্রটি আত্ম সন্ধানী হয়ে ওঠে।

নাট্যটিতে চিত্রাঙ্গদা প্রথমে অর্জুনের প্রেমে পড়েন, কিন্তু অর্জুন তাকে দেখে শুধুমাত্র একজন রাজপুত্র হিসেবে। এখানেই চিত্রাঙ্গদার আত্ম সন্দেহ জন্ম নেয়— সে কি আদৌ একজন নারী? সে কি প্রেম পাওয়ার উপযুক্ত? এই সংকট থেকেই সে দেবতার কাছে প্রার্থনা করে এক বছর সৌন্দর্য লাভের জন্য। এই রূপান্তরের মাধ্যমে সে অর্জুনের প্রেম পায়, কিন্তু অন্তর্দ্বন্দ্ব তীব্র হয়— সে জানে, এই প্রেম তার নিজের স্বরূপের প্রেম নয়, একটি আরোপিত রূপের জন্য পাওয়া। এই প্রশ্নের মধ্যেই নিহিত নারীর আত্ম সন্ধান— সে কেবল বাহ্যিক সৌন্দর্য নয়, তার আসল সত্তা নিয়ে প্রেম পেতে চায়। শেষ পর্যায়ে চিত্রাঙ্গদা তার রূপান্তরিত রূপ ত্যাগ করে অর্জুনের সামনে তার প্রকৃত রূপে উপস্থিত হয়। চিত্রাঙ্গদা কেবল একজন প্রেমিকা নয়, বরং একজন সক্রিয়, ইচ্ছাশীল নারীসত্তা হিসেবে আত্ম প্রতিষ্ঠিত হয়। সে আর অপেক্ষমাণ নয়, সে নিজেই চয়নকারী। এখানে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টভাবে সেই পুরুষতান্ত্রিক কাঠামোকে ভেঙে দেন, যেখানে নারীকে কেবল পুরুষের চোখে কাম্য রূপেই দেখা হয়। চিত্রাঙ্গদার আত্মপ্রতিষ্ঠার কাহিনি আজও সমান প্রাসঙ্গিক। নারীকে ঘিরে সামাজিক গঠন ও প্রত্যাশা আজও বহুলাংশে বাহ্যিক রূপ, আচরণ, ও গৃহকেন্দ্রিক ভূমিকার মাধ্যমে সংজ্ঞায়িত হয়। চিত্রাঙ্গদা এই ধারণার বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী সাংস্কৃতিক ভাষ্য। সে ঘোষণা করে, নারী কেবল প্রেম প্রার্থিনী নয়, কর্ম যোদ্ধা, চিন্তাশীল।

চিত্রাঙ্গদা নাটকে বিচার চেতনা সূচিত হয় আত্মপরিচয়ের প্রতি সামাজিক স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে। চিত্রাঙ্গদা পুরুষপ্রধান পৃথিবীতে নিজের সত্যরূপ লুকিয়ে অর্জুনের ভালোবাসা পেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পরিণামে বুঝতে পারেন, যে প্রেমে নিজেকে লুকাতে হয়, তা স্থায়ী নয়। এ এক অস্তিত্বমূলক বিচার, যেখানে ব্যক্তি স্বীকৃতি পায় নিজের সত্যস্বরূপ প্রকাশ; শ্যামার আত্মত্যাগ এক নৈতিক উচ্চতর সিদ্ধান্ত, যা রবীন্দ্রনাথের নৈতিকতা ও করুণরসের অভিজ্ঞান বহন করে। রবীন্দ্রনাথ নৃত্য, সংগীত ও আবৃত্তির নাট্যমাধ্যমে যে আবেগঘন পরিবেশ নির্মাণ করেন, তার মধ্য দিয়ে দর্শকের মনে এক নৈতিক জিজ্ঞাসার আবহ তৈরি করেন। বিচার এখানে শুধুই সংলাপ বা কাহিনির বিষয় নয়, বরং গীত— নৃত্যের মধ্য দিয়ে এক ধীর, প্রগাঢ় অভ্যন্তরীণ উত্তরণের অনুভব। চিত্রাঙ্গদা ও শ্যামায় রবীন্দ্রনাথ নৃত্যনাট্য রীতির মাধ্যমে শুধু আখ্যান বলেননি, বরং প্রতিটি চরিত্র ও ঘটনাকে একটি রূপকে পরিণত করেছেন। চিত্রাঙ্গদা হয়ে ওঠেন নারী সত্তার প্রতীক, শ্যামা হয়ে ওঠেন এক গভীর আত্মগ্লানির প্রতিচ্ছবি। প্রেম ও ন্যায়ে দ্বন্দ্ব এখানে এক ঐশ্বরিক নান্দনিক ভাষা পায়, যা নাট্যরীতির সীমানা অতিক্রম করে জীবনের বৃহত্তর তাৎপর্যের দিকে ইঙ্গিত করে। চিত্রাঙ্গদা রবীন্দ্রনাথের ‘পুরুষ বেশ ধারণী নারী’র একটি অনন্য রূপক। চিত্রাঙ্গদা মনঃপ্রাণে পুরুষের মতো গড়ে ওঠা এক রাজকন্যা, যিনি অর্জুনের প্রেমে পড়ে নারীত্বের অশ্বেষা শুরু করেন। কিন্তু সেই প্রেম অর্জুনের জন্য তাকে নিজেকে বদলাতে হয়। চিত্রাঙ্গদার দ্বন্দ্ব— সে কি নিজের প্রকৃত সত্তাকে লুকিয়ে প্রেম পাবে, না প্রেমিকের কাছে নিজেকে প্রকাশ করবে? এ দ্বন্দ্ব ব্যক্তিগত আবেগ এবং আত্মমর্যাদার সংঘাত।

শ্যামা: অপরাধবোধ ও প্রেমের আত্মবিসর্জন:

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্যামা নৃত্যনাট্যটি প্রেম, আত্মদান, নৈতিকতা ও ক্ষমার এক গভীর নাট্যরূপ। এটি কেবল একটি নৃত্যনাট্য নয়, বরং নৈতিক দ্বন্দ্ব ও আত্মবোধের এক অন্তর্ঘাটা। প্রেম ও বিচারের সংঘাতে, অপরাধ ও

মুক্তি দ্বন্দ্ব, চরিত্রগুলো যে আত্ম সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে যায়, তা মানবিকতার গভীরতম প্রশ্নগুলিকে ছুঁয়ে যায়। নাটকের কাহিনিতে রাজদরবারে চোর সন্দেহে আটকে পড়ে বৈদেশিক তরুণ বাজিকর বজ্রসেন। প্রকৃত অপরাধী হলেও রাজনর্তকী শ্যামা বজ্রসেনকে ভালোবেসে তাঁকে বাঁচাতে চায়। এর জন্য সে নির্দোষ যুবক উৎকর্ষকে মিথ্যা অপরাধে ফাঁসিয়ে দেয়। পরবর্তীতে তার বিবেক জাগরণ ও আত্মদানের মধ্য দিয়ে নাট্যরূপে এক জটিল নৈতিকতা গড়ে ওঠে। শ্যামা চরিত্রটি মূলত এক অভিজাত রাজনর্তকী, যিনি ক্ষমতাসম্পন্ন কিন্তু অনুভূতিপ্রবণ। প্রথমে সে ভালোবাসার বশবর্তী হয়ে এক অন্যায় করে বসে, যা তার আত্মগ্লানি এবং উপলব্ধিকে জন্ম দেয়। নাটকের অন্তিম পর্যায়ে সে নিজেই উৎকর্ষের জীবনের বিনিময়ে আত্মবলি দেয়। তার আত্মপল্কির পর্যায়ে উচ্চারিত স্বীকারোক্তি কেবল ব্যক্তিগত অনুশোচনা নয়, এটি এক নৈতিক পুনর্জন্ম— অপরাধের মধ্যে দিয়ে উপলব্ধি ও পরিশুদ্ধির নাট্যরূপ। বজ্রসেন, উত্তীয় ও শ্যামা— এই তিনটি চরিত্রের সংঘাতে নাটকটির নৈতিক বিন্যাস রচিত হয়। বজ্রসেন প্রেমিক, ন্যায়— দূত, আর শ্যামা প্রেম ও ন্যায়ের দ্বিধাগ্রস্ত মানুষ। তাদের প্রত্যেকের অবস্থান মানবিক মূল্যবোধের ভিন্নতর দিককে প্রতিফলিত করে। আত্মদানের মধ্য দিয়ে শ্যামা নিজের অপরাধ ও ভালোবাসা উভয়কেই বিশুদ্ধ করে তোলে। নাট্যরূপে এটি রবীন্দ্র— ভাবনার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক— প্রেমের মধ্যে আত্মদানের ভাব, যা কাব্য চিন্তার “ভক্তি” ও “করুণ রস”—এর ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা বহন করে। নাটকটি আজও প্রাসঙ্গিক, কারণ, এটি প্রশ্ন তোলে— ন্যায় কি কেবল আইনগত রায়, না কি বিবেকের ভিতরে সত্য উপলব্ধি? শ্যামা চরিত্রটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ সে শুধুমাত্র এক নারীর প্রেমময় আকাঙ্ক্ষা নয়, বরং একজন নৈতিক মানুষ, যে আত্মদানের মধ্য দিয়ে নিজের মুক্তি খুঁজে পায়।

চরিত্রচিহ্ন ও দ্বন্দ্বের রূপান্তর:

চিত্রাঙ্গদা এবং শ্যামা— দুইজনেই প্রেমের জন্য নিজের ন্যায়বোধকে প্রশ্ন করেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এক আত্মিক উত্তরণে পৌঁছান। চিত্রাঙ্গদার প্রেম স্বীকৃতি লাভ করে আত্মপরিচয়ের মধ্য দিয়ে, আর শ্যামার প্রেম আত্মবিসর্জনের মধ্য দিয়ে। এই দুই বিপরীত ভঙ্গিমা আসলে রবীন্দ্রনাথের মানবিক দর্শনের দুই দিক। এই দুই চরিত্রে প্রেম ও ন্যায় একে অপরের বিরোধী নয়, বরং একান্ত আন্তঃসম্পর্কিত।

- **চিত্রাঙ্গদার মনস্তত্ত্ব:** চিত্রাঙ্গদার চরিত্রের মধ্যে একটি তীব্র মানসিক দ্বন্দ্ব রয়েছে— সে একদিকে নিজেকে পুরুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, অন্যদিকে তার প্রেমের প্রতি তার আত্মবিশ্বাসের সংকট রয়েছে। চিত্রাঙ্গদার মনোভাবের বিপরীতে সমাজের প্রত্যাশা এবং সত্তার দ্বন্দ্ব উঠে আসে।
- **শ্যামার আত্মত্যাগ:** শ্যামার চরিত্রে একটি গভীর আত্মত্যাগের তথ্য রয়েছে, যা প্রেম এবং ন্যায়ের সম্পর্ককে আরও একত্বীকৃতভাবে প্রকাশ করে। শ্যামা ন্যায়ের জন্য নিজের ভালোবাসাকে বিসর্জন দেয়, এটি একটি উঁচু মানসিক লেভেলের সিদ্ধান্ত, যেখানে আত্মত্যাগের দর্শন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সাইকোলজিক্যাল দৃষ্টিকোণ থেকে শ্যামার এমন সিদ্ধান্তের পেছনে তার অভ্যন্তরীণ সংগ্রাম এবং বাস্তবতা বুঝতে সাহায্য করবে।
- **তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ:** প্লেটো, হেগেল, এবং ফ্রয়েডের মতো দার্শনিকদের চিন্তা এবং তত্ত্বগুলো প্রেম এবং ন্যায়ের সম্পর্ককে বুঝতে সাহায্য করবে। প্লেটোর চিন্তা, প্রেমের আরাধনা এবং ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা একে অপরের সাথে সম্পর্কিত বলে মনে করতেন, যেখানে ন্যায় মানুষের আত্মার সমন্বয় ঘটায়। এর মাধ্যমে চিত্রাঙ্গদা ও শ্যামার চরিত্রগুলোর মানসিক অস্থিরতা এবং তাদের প্রেমের সংগ্রামের সঙ্গে ন্যায়ের প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ।
- **হেগেলের দ্বন্দ্ব তত্ত্ব:** হেগেল বিশ্বাস করতেন যে, প্রেম এবং ন্যায়ের মধ্যে একটি অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব রয়েছে, যা সম্পর্কের পরিবর্তনশীল প্রকৃতিতে ফুটে ওঠে। এই দ্বন্দ্ব বাস্তবে চিত্রাঙ্গদা ও শ্যামার ভেতরে প্রতিফলিত হতে পারে। যেখানে তারা নিজেদের ন্যায়ের জন্য যুদ্ধ করলেও, তাদের প্রেমের ধরণ সে যুদ্ধে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

- **বৈষম্যহীন ও আধুনিক সমাজের উপাদান:** আজকের সমাজে, প্রেম এবং ন্যায়ের সম্পর্ক আরও জটিল এবং পরস্পরবিরোধী হতে পারে। যেখানে একদিকে প্রেমের প্রকাশ আরও স্বাধীন এবং বৈষম্যহীন হতে চায়, অন্যদিকে ন্যায়ের সংজ্ঞা আরও বেশি সুনির্দিষ্ট এবং আইনি— সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে উঠেছে। এটি রবীন্দ্রনাথের নাটকের প্রতি আধুনিক পাঠক এবং দর্শকের প্রতিক্রিয়াও প্রভাবিত করে।

এই দুই নাট্য কর্মে রবীন্দ্রনাথ প্রেমকে নিছক আবেগ নয়, এক নৈতিক এবং ন্যায়িক সত্তা হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। প্রেম যদি ন্যায়বিচারের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তবে তা আত্মবিশ্বাসের কারণ হতে পারে— এই বার্তাই শ্যামার মাধ্যমে তিনি দিয়েছেন। আবার, চিত্রাঙ্গদার মাধ্যমে প্রেমকে আত্মপরিচয়ের এক স্বীকৃত উপাদানে রূপান্তর করেছেন। চিত্রাঙ্গদা এবং শ্যামা— দুইজনেই প্রেমের জন্য নিজের ন্যায়বোধকে প্রশ্ন করেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এক আত্মিক উত্তরণে পৌঁছান। চিত্রাঙ্গদার প্রেম স্বীকৃতি লাভ করে আত্মপরিচয়ের মধ্য দিয়ে, আর শ্যামার প্রেম আত্মবিসর্জনের মধ্য দিয়ে। এই দুই বিপরীত ভঙ্গিমা আসলে রবীন্দ্রনাথের মানবিক দর্শনের আত্মপরিচয়ের এক নিঃশব্দ প্রতীক। এই দুই চরিত্রে প্রেম ও ন্যায় একে অপরের বিরোধী নয়, বরং একান্ত আন্তঃসম্পর্কিত। চিত্রাঙ্গদা একজন বীর নারী, যিনি অস্ত্র ধারণ করেন, যুদ্ধ করেন এবং নারীত্বকে গৌরবের সাথে পুনঃস্থাপন করেন। শ্যামা, তার বিপরীতে, এক শিল্পী নারী— একজন নর্তকী, যার ক্ষমতা, প্রেম ও সৌন্দর্য দ্বারা প্রভাব বিস্তার করা, কিন্তু যিনি নিজের কর্মফলকে অস্বীকার না করে পরিণতির মুখোমুখি হন। দুই চরিত্রই নারীর নতুন শক্তি স্বরূপকে উপস্থাপন করে, তবে দুটি ভিন্ন মাত্রায়— একজন নারীবাদী স্বাধীনতায়, অন্যজন নৈতিক আত্মোৎসর্গে। চিত্রাঙ্গদাতে ব্যবহৃত ভাষা, সংগীত ও নৃত্য একটি উজ্জ্বল আত্মবিশ্বাসী আবেগকে ধারণ করে— নায়িকার উত্তরণ এক সাহসী সংলাপে রূপায়িত। রবীন্দ্রনাথের নায়িকারা— চিত্রাঙ্গদা ও শ্যামা— প্রেমে আক্রান্ত হন, কিন্তু সেই প্রেমের পথ কখনোই সরল নয়। চিত্রাঙ্গদা নারী পরিচয় লুকিয়ে প্রেম পেতে চান, শ্যামা অন্যায় করে প্রেমিককে রক্ষা করতে চান। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথ চরিত্রগুলিকে এক অন্তর্দ্বন্দ্বের মুখোমুখি করেন, যেখানে প্রেমের আবেগকে অতিক্রম করে ন্যায়ের প্রতি প্রত্যয় গড়ে ওঠে। এই নৃত্যনাট্য দুটি শুধু রবীন্দ্র— যুগের প্রতিচ্ছবি নয়, বরং আধুনিক যুগেও নারীর অধিকার, নৈতিক দ্বিধা, ব্যক্তিস্বার্থ খোঁজ এবং প্রেমের দায়— এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে সাহায্য করে। রবীন্দ্রনাথ নাটকীয়তা এবং কবিত্বকে একত্র করে যে মানবিকতাবাদী কাব্যনাট্য নির্মাণ করেছেন, তা আজও এক চিরকালীন আলোকবর্তিকা।

রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যে সংগীত কেবল সহায়ক নয়, তা নিজেই এক ভাষা। চিত্রাঙ্গদাতে সংগীত নাট্যকর্মের আবেগ ও নৈতিক দ্বন্দ্বকে বহন করে। রবীন্দ্রনাথের নাট্যচর্চার পরবর্তী পর্যায়ে এক অভিনব রীতির জন্ম হয়— নৃত্যনাট্য। ইউরোপীয় ব্যালে, অপেরা এবং জাভা— বালি দ্বীপপুঞ্জের প্রভাবিত নৃত্যনাট্য রীতিকে রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় আবহে নতুন জীবন দেন। প্রথম দিকের সংগীত নাট্য, যেমন: তাসের দেশ, চণ্ডালিকা, পরে চিত্রাঙ্গদা ও শ্যামা— এই ধারার উন্নততর রূপ। এই নৃত্যনাট্যগুলোতে নাটকের সংলাপ প্রায় বিলুপ্ত; বদলে এসেছে গীতিনাট্য রীতির আধিপত্য। গানে, নৃত্যে, মুখাভিনয়ে, দেহভাষায় চরিত্রগুলির আবেগ, দ্বন্দ্ব ও আত্মিক সংকট উদ্ভাসিত হয়। ফলে, দর্শক একটি অভিজ্ঞতার অংশ হয়ে ওঠে— এটি আর কেবল দৃশ্য নয়, বরং অনুভবের ক্ষেত্র। নাটক কেবল বিনোদন নয়, এটি মানুষের নৈতিক বিকাশ, আত্মানুসন্ধান এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার এক গভীর মাধ্যম। তাঁর নাটকে দেখা যায় ন্যায়— অন্যায়, সত্য— মিথ্যা, প্রেম— ত্যাগ, ব্যক্তিস্বার্থ ও বৃহত্তর স্বার্থের সংঘাত। রক্তকরবী, অচলায়তন, ডাকঘর ইত্যাদি নাটকে এসব দার্শনিক প্রশ্নের দ্বন্দ্বিক প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। নৃত্যনাট্যে রবীন্দ্রনাথ এমন এক নাট্যভাষা নির্মাণ করেন যেখানে সংগীত, নৃত্য ও কাব্য একত্রে নাট্য বিষয়বস্তুকে বহন করে। এখানে দার্শনিক চিন্তা ও মানবিক আবেগ সমানভাবে উপস্থিত। প্রেম ও ন্যায়, আত্মত্যাগ ও কর্তব্য— এই দ্বন্দ্বগুলিকে তিনি দেহাভিনয় ও গানের মাধ্যমে একটি দৃশ্যমান অভিজ্ঞতায় রূপান্তর

করেন। চিত্রাঙ্গদা ও শ্যামা— এই দুই নৃত্যনাট্যে রবীন্দ্রনাথ নাট্য— দর্শনের সর্বোচ্চ রূপটি উপস্থাপন করেছেন। এই নাট্যরীতির মাধ্যমে তিনি নাটকের আঙ্গিকগত সীমানা ভেঙে দিয়ে একটি নতুন শিল্পরূপ সৃষ্টি করেন, যা একাধারে নাটক, সংগীত ও নৃত্যের সমন্বয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা ও শ্যামা— উভয়েই প্রেম এবং ন্যায়ের মধ্যকার এক জটিল দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে নির্মিত। এই দ্বন্দ্ব কেবল ব্যক্তিগত আবেগের নয়, এটি গভীরভাবে সামাজিক, নৈতিক এবং দার্শনিক একটি প্রশ্ন। রবীন্দ্রনাথ প্রেম ও ন্যায়ের দ্বৈত সত্তাকে নাটকীয়ভাবে প্রকাশ করেছেন এবং সেই দ্বন্দ্ব কীভাবে মানবচরিত্রের অন্তর্নিহিত সংঘর্ষকে প্রতিফলিত করে।

প্রেম এবং ন্যায়— এই দুই মানবিক অভিজ্ঞতা সাহিত্য ও নাটকের চিরন্তন উপাদান। প্রেম মানে ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা, আবেগ ও নিবেদন; অন্যদিকে ন্যায় মানে সামাজিক নৈতিকতা, কর্তব্যবোধ ও বিচারবুদ্ধি। ভারতীয় কাব্যতত্ত্বের ‘ধর্ম’ ও ‘শৃঙ্গার’—এর দ্বৈততা এবং পাশ্চাত্য দর্শনের প্লেটো— অ্যারিস্টটলীয় নৈতিকতা, উভয়ের ভেতরেই এই দ্বন্দ্ব বিদ্যমান। অ্যারিস্টটলের— এ ট্রাজেডির কেন্দ্রে থাকে ন্যায়ের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, আর প্রেম সেখানে বিপর্যয়ের কারণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। রবীন্দ্রনাথ এই দ্বন্দ্বকে শুধুমাত্র নাটকীয় সংকট হিসেবে ব্যবহার করেননি, বরং এক দার্শনিক অন্বেষণের স্তরে উন্নীত করেছেন। তাঁর নাট্যচিন্তায় প্রেম ও ন্যায় পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, বরং পরিপূরক, এবং দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েই চরিত্রদের আত্ম উত্তরণ ঘটে। শ্যামা এক কবি— কল্পিত রাজ্যের কাহিনি, যেখানে শ্যামা নামক নর্তকী প্রেমিককে রক্ষা করতে এক নিরপরাধ যুবককে মৃত্যুদণ্ডে পাঠান। এখানে প্রেম আসে এক নৈতিক অপরাধের বিনিময়ে। শ্যামা ও বজ্রসেন— এই দুই চরিত্র প্রেম ও ন্যায়ের বিপরীত মেরুতে দাঁড়ালেও, শেষ পর্যন্ত নাটক তাদের আত্ম উপলব্ধির মধ্য দিয়ে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ঘটায়। এখানে প্রেমের মোহ, অপরাধবোধ, এবং ন্যায়ের প্রত্যাবর্তন একটি আধ্যাত্মিক পরিশুদ্ধির নাট্যরূপ পায়।

প্রেম এবং ন্যায়ের দ্বন্দ্বের সঙ্গতি ও বৈসাদৃশ্য:

- রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলিতে প্রেম এবং ন্যায়ের মধ্যে একটি জটিল দ্বন্দ্ব বা সংগতি রচিত হয়। যেখানে একদিকে প্রেম মানুষের অন্তর্গত অনুভূতি, আবেগ এবং ইচ্ছার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে, অন্যদিকে ন্যায় সামাজিক এবং নৈতিক আদর্শের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। প্রেম কখনো কখনো ব্যক্তি বা সমাজের নৈতিকতার সাথে সাংঘর্ষিক হতে পারে। উদাহরণ হিসেবে, চিত্রাঙ্গদা নাটকে, চিত্রাঙ্গদা প্রেমের জন্য যে সংকল্প গ্রহণ করেন, তা তার রাজ্য এবং তার জাতিগত দায়িত্বের সাথে সাংঘর্ষিক হয়ে ওঠে। তিনি তার প্রেমিকের (অর্জুন) সঙ্গে থাকার জন্য তার রাজ্যের শাসন এবং ঐতিহ্যকে বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হন। এতে দেখা যায়, প্রেমের ক্ষেত্রে ঐতিহ্য এবং ন্যায়ের ধারণা চ্যালেঞ্জ হয়ে ওঠে। এই দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ মানবিক ইচ্ছা এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার মধ্যে সমন্বয়ের প্রশ্ন তোলেন।

- এটি শুধু নাটকের মধ্যে নয়, বরং সমাজের মধ্যেও এক ধরনের অন্তর্দ্বন্দ্ব তৈরি করে। প্রেম কখনো কখনো মানবিক ইচ্ছার প্রতি সামাজিক বাধা সৃষ্টি করতে পারে এবং এই দ্বন্দ্বের মীমাংসা কীভাবে করা হবে, তা লেখকের গভীর তাত্ত্বিক প্রশ্ন। রবীন্দ্রনাথের কাজগুলো এই দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে চিত্রিত হয়, যেখানে প্রেম এবং ন্যায়ের মধ্যকার অসামঞ্জস্য নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয় এবং কিছু সময় একে অপরকে সম্পূরকও মনে হয়।

- ধর্ম এবং নৈতিকতা দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রবীন্দ্রনাথের নাটকে। বিশেষ করে শ্যামা নাটকে, যেখানে নৈতিকতা এবং ধর্মীয় আইনগুলি মানুষের ব্যক্তিগত অনুভূতি ও ইচ্ছার সাথে বিরোধ সৃষ্টি করে। শ্যামা নাটকটি মূলত এক নারী চরিত্রের সংগ্রামকে তুলে ধরে। যেখানে ধর্মীয় ও সামাজিক আইন নারীকে আত্মনিয়ন্ত্রণ করতে বলে। কিন্তু শ্যামা নিজের অন্তর্গত অনুভূতির ভিত্তিতে সেই নৈতিকতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যায়।

- ধর্মের সাথে সম্পর্কিত নৈতিকতা এখানে প্রশ্নের মুখে পড়ে। বিশেষত সমাজে নারীর স্থান এবং অধিকার নিয়ে। এই নাটকে শ্যামার যে আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং তাঁর প্রাকৃতিক অধিকার (যেমন প্রেমের স্বাধীনতা) চাওয়ার পর্ব-২, বিশেষ সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি, ২০২৬

আগ্রহ, তা ধর্মীয় বা নৈতিক মানদণ্ডের বিপরীতে। রবীন্দ্রনাথ এই দ্বন্দ্বকে একটি বড়ো সামাজিক এবং রাজনৈতিক সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে দেখান। এছাড়া, তিনি ধর্মীয় নিয়মের পাশাপাশি মানবিক অনুভূতির গুরুত্বও তুলে ধরেন। যা একটি নিছক নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ছড়িয়ে পড়ার পরিবর্তে মানুষকে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং আত্মিক মুক্তির জন্য উদ্যোগী করে।

- রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলি সাধারণত সমাজের ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে গড়ে ওঠে। ১৯শ শতকের বাংলার ঔপনিবেশিক শাসন, ধর্মীয় সংস্কৃতি, সামাজিক বিভাজন এবং সম্পর্কের নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে তিনি তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। বিশেষ করে, তাঁর নাটকে যে-সব চরিত্র দেখা যায়, তারা সাধারণত ঐতিহাসিক সময়ের সমাজে নিজস্ব অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সংগ্রাম করেন।

- চিত্রাঙ্গদা নাটকে, একটি রূপক চরিত্রের মাধ্যমে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের রীতিনীতি এবং তার প্রভাবকে খুঁজে পাওয়া যায়। চিত্রাঙ্গদা যে ধরনের ত্যাগ এবং সংগ্রাম করেন, তা ঐতিহাসিকভাবে নানান সমাজের একেবারে অন্যরকম, যেখানে নারীর অধিকার এবং স্বাধীনতা শুধুমাত্র এক ধরনের আধ্যাত্মিক এবং সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এই প্রেক্ষাপটে, রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলি যে সময়ের রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগ্রাম এবং দর্শনকেই প্রতিফলিত করে, তা যদি বিশ্লেষণ করা যায়, তবে সমালোচকরা দেখতে পাবেন, কীভাবে ঔপনিবেশিক, ধর্মীয় এবং সমাজতান্ত্রিক কাঠামো রচনার ভেতর আসলে স্বাধীনতা এবং সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

- আজকের সমাজে প্রেম এবং ন্যায়ের সম্পর্ক কীভাবে বোঝা হয়, তা এক নতুন আলোকে দেখা যেতে পারে। আধুনিক বিশ্বে, যেখানে নারীর অধিকার, লিঙ্গ সমতা এবং মুক্তচিন্তার মতো বিষয়গুলি মুখ্য হয়ে উঠছে, রবীন্দ্রনাথের কাজগুলো আধুনিক দর্শনের জন্য প্রাসঙ্গিক। বিশেষ করে, শ্যামা নাটকে যে সমাজের নারীর প্রতি অধিকার এবং প্রেমের স্বাধীনতা নিয়ে যা বলা হয়েছে, তা আজকের সমাজে নতুনভাবে আলোচিত হতে পারে। নারী আন্দোলন, লিঙ্গ সমতা, এবং আত্মনির্ভরতার প্রশ্নগুলো আজকের দিনে এক ধরনের নৈতিক ও রাজনৈতিক আলোচনায় জায়গা করে নিয়েছে, যেখানে রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলি নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে পাঠযোগ্য হয়ে উঠেছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে, রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলির পুরোনো রাজনৈতিক এবং সামাজিক অবস্থান আধুনিক সমাজের সাথে মেলানোর কাজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এমনকি, প্রেম এবং ন্যায়ের সম্পর্কের আধুনিক ব্যাখ্যা, বিশেষত নারীর অধিকার এবং সমতা নিয়ে, অনেক তাত্ত্বিক আলোচনার বিষয় হয়ে উঠতে পারে।

- রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলি শুধুমাত্র তার সময়ের সামাজিক বাস্তবতাকে প্রদর্শন করেনি, বরং এগুলি এখনও আমাদের আধুনিক চিন্তাধারায় প্রভাব ফেলছে। সমাজে প্রেম, ন্যায়, এবং মানুষের অধিকার নিয়ে যে সংগ্রাম ছিল, তা আধুনিক নাট্যকর্মীদের জন্য একটি নতুন দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে।

- যদি রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলির পর্যালোচনা করা হয়, তবে এটি স্পষ্টভাবে বলা যাবে যে, তার কাজের মধ্যে আধুনিক থিয়েটার, সমাজনীতি এবং মানুষের মানসিকতাতেও ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। চিত্রাঙ্গদা এবং শ্যামা নাটকের তাত্ত্বিক মূল্য শুধু একদিক দিয়ে সীমাবদ্ধ নয়। বরং এটি বিভিন্ন ধরনের দর্শন এবং রাজনৈতিক তত্ত্বের প্রসঙ্গকে পুনঃ বিশ্লেষণ করার সুযোগ সৃষ্টি করে।

- রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা ও শ্যামা— এই দুটি নৃত্যনাট্য প্রতীক ব্যবহারে পরিপূর্ণ। এখানে প্রতিটি চরিত্র ও ঘটনাবলির অন্তরে লুকিয়ে আছে এক গভীর দার্শনিক অর্থ ও নাট্য প্রতিমা। ‘চিত্রাঙ্গদা’ চরিত্রটি কেবল একজন রাজকন্যা বা নারী নন, তিনি নারী— অস্তিত্বের এক দ্বৈত— চরিত্র: একদিকে তিনি পুরুষতান্ত্রিক সৌন্দর্য— প্রতিষ্ঠিত সমাজের প্রতিভূ, অন্যদিকে তিনি আত্মপ্রতিষ্ঠায় দৃঢ়, ক্ষমতাবান এক নারীর প্রতিচ্ছবি। শ্যামা—তে নাম চরিত্র ‘শ্যামা’ প্রতীকী স্তরে প্রেম, রাজনীতি ও অপরাধবোধের এক জটিল সম্মিলন। সে কেবল প্রেমে

বিভোর নারী নন, বরং সমাজব্যবস্থার এক বিচিত্র প্রতিচ্ছবি। যে ভালোবাসার নামে এক নিরীহ ব্যক্তিক বলি দেন, পরে আত্মগ্লানিতে নিজেই আত্মহুতি দেন। এই প্রতীকবাদ রবীন্দ্রনাথের নৈতিক দ্বন্দ্ব ও মানবিক আত্মোপলব্ধির প্রকাশ। এখানে নাট্য প্রতিমা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে:

- চিত্রাঙ্গদা'র রূপান্তর (নারীত্বের প্রতীক)
- অজুর্নের অস্ত্র ও শ্যামার কণ্ঠ (ক্ষমতা ও আত্মসমর্পণের প্রতীক)
- বাহু বল বনাম হৃদয়ের বল (সামাজিক কাঠামোর বিরুদ্ধে আত্মবিস্তার)

উপসংহার:

রবীন্দ্রনাথের এই দুই নৃত্যনাট্যে প্রেম ও ন্যায়ের দ্বন্দ্ব শুধুই নাটকীয় উপাদান নয়, বরং এটি তাঁর নৈতিক, দার্শনিক ও সমাজ—মনস্তাত্ত্বিক ভাবনার একটি শক্ত ভিত্তি। এই দ্বন্দ্বের ভেতর দিয়েই রবীন্দ্রনাথ মানব সভার গভীরতম সংকট ও সম্ভাবনার সন্ধান করেছেন। আত্মবিরোধ ও নাট্যদ্বন্দ্বিকতা রবীন্দ্রনাথের চরিত্রগুলোকে এক গভীর মানবিক স্তরে প্রতিষ্ঠা করে। এরা নিছক নাট্য চরিত্র নয়, বরং আত্ম সন্ধানী, পর্যবেক্ষণকারী মানব প্রতিনিধি। আত্মবিরোধ তাদের দুর্বলতা নয়—বরং এটি তাদের আত্মপ্রত্যয়ের পথ, বরং চরিত্র গঠনের চিত্রাঙ্গদা ও শ্যামা—উভয়েই কোনো রোমান্টিক চিত্ররূপ নয়, বরং বাঙালি নারীচরিত্রের আত্মবিকাশের প্রতিভূ। রবীন্দ্রনাথ তাঁদের প্রেমিকা হিসেবে নয়, আত্মজ্ঞানী নারী হিসেবে রচনা করেছেন। এই আত্মজ্ঞান কখনো প্রেম দিয়ে, কখনো ভাগের ভেতর দিয়ে, কখনো ন্যায়বোধের বিরুদ্ধে গিয়েও প্রকাশ পেয়েছে। চিত্রাঙ্গদা ও শ্যামা—এই দুই নাট্য কর্মে প্রেম ও ন্যায়ের দ্বন্দ্ব এক গভীর নন্দনতাত্ত্বিক অভিজ্ঞতায় রূপান্তরিত হয়। এই দ্বন্দ্ব কেবল নৈতিক অথবা আবেগগত নয়—বরং এটি সৌন্দর্যের স্বরূপ, প্রকাশভঙ্গি, এবং দর্শকের নন্দন চেতনার অভ্যুত্থানের একটি নাট্যমূল্য। চিত্রাঙ্গদা ও শ্যামা কেবল প্রেম ও ন্যায়ের দ্বন্দ্ব নয়, এগুলো হলো ঔপনিবেশিক সাংস্কৃতিক সংকটের প্রতিফলন। এই নাট্য কর্মে রবীন্দ্রনাথ একদিকে প্রেম, আত্মত্যাগ, ন্যায় ও আত্মপরিচয়ের দ্বন্দ্ব উপস্থাপন করেন, অন্যদিকে এই দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে ঔপনিবেশিক জাতিসত্তার গভীর অনুসন্ধানও চালান। এই অধ্যায় আমাদের দেখায়—কীভাবে নাট্যরূপে সাংস্কৃতিক সংকটের উত্তর পাওয়া যায়, আর আত্ম সন্ধান হয়ে ওঠে একটি রাজনৈতিক ও নন্দনতাত্ত্বিক প্রত্যয়। এই নাট্যরূপে রবীন্দ্রনাথ পরিবেশন ভঙ্গির মাধ্যমে এক নতুন নাট্য বিন্যাস সৃষ্টি করেন, যা দর্শককে শুধু আমোদিত নয়, ভাবিতও করে। এই পরিবেশনার ধরন দর্শক—চেতনার গভীরে গিয়ে নিজের অস্তিত্ব, ন্যায় ও প্রেমের প্রশ্নে সংশয় জাগায়। রবীন্দ্রনাথের নায়িকারা—চিত্রাঙ্গদা ও শ্যামা—প্রেমে আক্রান্ত হন, কিন্তু সেই প্রেমের পথ কখনোই সরল নয়। চিত্রাঙ্গদা নারী পরিচয় লুকিয়ে প্রেম পেতে চান, শ্যামা অন্যায় করে প্রেমিককে রক্ষা করতে চান। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথ চরিত্রগুলিকে এক অন্তর্দ্বন্দ্বের মুখোমুখি করেন, যেখানে প্রেমের আবেগকে অতিক্রম করে ন্যায়ের প্রতি প্রত্যয় গড়ে ওঠে। এই নৃত্যনাট্য দুটি আধুনিক যুগেও নারীর অধিকার, নৈতিক দ্বিধা, ব্যক্তিস্বত্বের খোঁজ এবং প্রেমের দায়—এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে সাহায্য করে। রবীন্দ্রনাথ নাটকীয়তা এবং কবিত্বকে একত্র করে যে মানবিকতাবাদী নৃত্যনাট্য নির্মাণ করেছেন, তা আজও এক চিরকালীন আলোকবর্তিকা।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্র রচনাবলী, খণ্ড ১৩। শান্তিনিকেতন: বিশ্বভারতী, বৈশাখ ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ।
২. ঘোষ, অজিতকুমার। বাংলা নাটকের ইতিহাস। অষ্টম সংস্করণ। কলকাতা: জেনারেল, জুন ১৯৯৯।
৩. ইলাহী, কে. মউদুদ। গবেষণা পদ্ধতি এবং প্রতিবেদন প্রণয়ন। ঢাকা: নভেল পাবলিশিং হাউস, মে ২০০৬।
৪. রায়, মিনতি কুমার। রবীন্দ্রনাথ: রূপে ও রসে। কলকাতা: ধানসিড়ি প্রকাশনা, নভেম্বর ২০১৪।

৫. ঘোষ, শঙ্খ। কালের মাত্রা ও রবীন্দ্রনাটক। কলকাতা: দেশ পাবলিশিং, ১৯৬৯।
৬. আইয়ুব, আবু সয়ীদ। পান্থজনের সখা। কলকাতা: দেশ পাবলিশিং, ১৯৭৩।
৭. ভট্টাচার্য, মালিনী। নারী ও রবীন্দ্রনাথ। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৩।
৮. চক্রবর্তী, মৃণালকান্তি। রবীন্দ্রনাথের নাট্যচিন্তা ও নাট্যকর্ম। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০০২।
৯. মিত্র, অরুণজিৎ। রবীন্দ্র নাট্যের নাট্যতত্ত্ব। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০১৮।
১০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। চিত্রাঙ্গদা। শান্তিনিকেতন: বিশ্বভারতী, ১৯৩৬।
১১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। শ্যামা। শান্তিনিকেতন: বিশ্বভারতী, ১৯৩৯।



‘পোস্টমাস্টার’ গল্পে উপনিবেশের রাজনীতি, গল্পবয়ান: দুটি অনুবাদ

অজয় শীলশর্মা, গবেষক, বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 13.02.2026; Accepted: 26.02.2026; Available online: 28.02.2026

©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

Abstract

Translation is a form of art through which the distinct culture of one nation enters the cultural sphere of another. In the modern era, translation has thus emerged as an important medium of communication. When anti-colonial politics gained momentum in Bengal, translation became a necessary means of presenting indigenous culture to the wider world. In a country like India, translation is truly relevant for understanding the diverse social texts of society and for comprehending one another’s worlds. Moreover, in the contemporary period, translation has become an essential tool for articulating the voices of marginalized communities.

This paper examines how two different translations of Rabindranath Tagore’s short story “The Postmaster” have represented cultural contexts. It analyzes how the narrative constructed by the story within its historical moment is appropriately reflected in translation. Although several problems exist within the translations – which at times fail to fully convey the cultural specificity of the source text – the paper discusses in detail how such limitations have been addressed through the use of annotations and explanatory notes.

Keywords: Translation Studies, Cultural Representation, Colonial and Anti-Colonial Context, Narrative Discourse, Marginalized Voices

১

চিহ্ন-কেন্দ্রিক সামাজিক পরিসরে সামগ্রিক মূল্যায়নের ভরকেন্দ্র রূপে ভাষাই হতে পারে হাতিয়ার, চিহ্নের বহুমুখিতা বর্তমান সমাজচিন্তা ও সাহিত্যচর্চাকে প্রভাবিত করে। এই চর্চাকে গড়ে তুলতে পারা যাবে কেবলমাত্র ভাষাবিজ্ঞানের আলোচনার মধ্য দিয়ে। দীর্ঘদিনের বিদ্যায়তনিক চর্চায় ভাষাকে মূল্যায়ন করা হয় ধ্বনি, কারক প্রভৃতি আলোচনার সীমায়িত পরিসরে। কিন্তু সাহিত্য আলোচনা শুধুমাত্র এই ধ্বনিতাত্ত্বিক কাঠামোয় সংঘটিত নয়, বরং আমাদের সমাজ-সাহিত্যে এমন কিছু শব্দ/চিন্তা রয়েছে যার মধ্যে সময় ও সাহিত্যের নন্দনতাত্ত্বিক কাঠামো গড়ে নিতে সুবিধা হয়। একটি সাধারণ উদাহরণ সহযোগে আলোচনা শুরু করা যেতে পারে। যেমন ‘লাল’ রং ট্রাফিক সিগনালে একটি নির্দিষ্ট অর্থকে চিহ্নায়িত করে, কিন্তু লালের বদলে অন্য কোনো রং সেই অর্থ পরিবেশন করে না। চিহ্ন বদলের সঙ্গে সঙ্গে অর্থ বদলের একটি সম্পর্ক রয়েছে–

“The transformation of sign something they designates has its roots in the change of nature of truth.”^১

সাহিত্যের তাত্ত্বিক কাঠামোতে আলোচনা করতে হবে দ্বৈত শব্দ কীভাবে অন্য শব্দের কতটা কাছাকাছি বা কতটা একে অপরের পরিপূরক। বিচারের বিষয় হতে পারে শব্দ কী করে ভাষার ব্যাঞ্জনাতে তুলে ধরতে পারছে। যেহেতু অনেক সময় ভাষার ব্যবহার শুধুমাত্র আক্ষরিক নয় বরং আলংকারিক। এই আলংকারিকতাকে বোঝা অন্য ভাষায় কীভাবে সম্ভব। এমনই বোঝা যাবে শব্দের আন্তঃসম্পর্ক থেকে। এক্ষেত্রে সাহিত্যের নন্দন বলতে ভাষার নন্দনকেও বোঝাবে। ভাষার এই নন্দন একলব্য বয়ানে সম্ভব? কোনো বিষয়কে অবিকল তুলে ধরা একলব্য বয়ানে সহজসাধ্য নয়। অনুবাদের তাত্ত্বিক পরিসরেও এই নিয়ে দ্বন্দ্ব রয়েছে, এই দ্বন্দ্বের প্রভাব ব্যবহারিক পরিসরেও (praxis level) রয়েছে। অনুবাদের প্রাথমিক তত্ত্বকাঠামোতে Metaphase^১ একটি তাত্ত্বিক পরিসর কিন্তু তা সর্বগ্রাহ্য নয়। একটি শব্দের রূপান্তর হলেই তার ভাবমাদুর্য অনুবাদে থাকবে এমন কথা জোর গলায় বলা যায় না। অনুবাদের সময় অনুবাদকে চরিত্রের আবেগের উৎসভূমি ও সংস্কৃতিকে মাথায় রাখতে হয়— এমনকি দ্রোণাচার্য বয়ান (source language text) ও একলব্য বয়ানকে^২ (target language text) উপলব্ধি করতে হবে।

“....এবং বারংবার পরিবর্তনের ফলে কোনোটা মূলের ত্রিসীমানাতে পৌঁছাতে পারেনি বটে তবে এগুলো যে মহাকাব্যের প্রতিধ্বনি। তাদের সঙ্গে আমি নিরন্তর সংশোধনের ফলেই একলব্যের সম্পর্ক পাতিয়েছি।”^২

অনুবাদের ভাবমাদুর্য তুলে ধরতে দ্রোণাচার্য বয়ান এবং একলব্য বয়ানের যৌথতার এলাকায় প্রবেশ করতে হয়। নিরন্তর এই প্রশ্নচিহ্ন পাঠকের হৃদয়ে পাঠ্যবস্তু সম্পর্কে বিভিন্ন দিকের সন্ধান দেয়। পাঠ্যবস্তুর এই বিচিত্র রূপকে যথাযথ অনুধাবন করতে পারলে পারদর্শী অনুবাদকের জন্ম হতে পারে। তাই পাঠক চিহ্নিত করতে পারে দেবদার স্পিডাক, ফ্রেডের স্ট্রেচি, শকুন্তলার বুদ্ধদেব বসুর অনুবাদকে। এই চেনার পথ সরলরৈখিক নয়। এই বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় অনেক সময় শব্দবন্ধকে গুরুত্ব দিতে হয়। শব্দবন্ধকে codify করে অনুবাদক এগিয়ে যায়। ফলত নতুন এলাকার জন্ম হয়। নতুন এলাকা পূর্বতন এলাকার প্রতিভাস, কিন্তু সত্যিই কি প্রতিভাস? দুটি আখ্যানকে পাশাপাশি বসিয়ে পর্যালোচনাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। দ্রো ব ≠ এ ব বা দ্রো ব = এ ব যে সমীকরণই হোক না কেন জ্ঞানতাত্ত্বিক (epistemology) কাঠামোই সেই সমান বা অসমানের জায়গাগুলিকে চিহ্নিত করা হবে অনুবাদ প্রকল্পের এলাকাতে।

বাংলা সাহিত্যের বিস্তৃত পাঠে বোঝা যায় অনুবাদ বর্তমান সময়ে জনপ্রিয়তা অবলম্বন করলেও একটা সময়ে তা নিয়ে খুব বেশি উৎসাহ ছিল না কিন্তু ভারতবর্ষের মতো দেশে সমাজের বিভিন্ন পাঠকে অনুধাবন করতে, পারস্পরিক জগতকে বোঝার ক্ষেত্রে অনুবাদের সত্যিই প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে, এছাড়া বর্তমান সময়ে প্রান্তিক মানুষের কণ্ঠস্বরকে প্রকাশ করতে অনুবাদের আশ্রয় নিতে হয়। তবে উপনিবেশপর্বে বঙ্গসাহিত্যের ইংরেজি অনুবাদের ক্ষেত্রে এক দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে, উপনিবেশের সময়পর্বে শাসকের কাছে নিজেদের ঐতিহ্য

^১ (ক) ড্রাইডেন (১৬৩১-১৭০০) যে তিন ধরনের অনুবাদের কথা বলেছেন তা হল Metaphase, paraphrase, imitations Metaphase বলতে বোঝায় Words by Words. Lines by lines translation.

^২ (খ) বর্তমান রচনায় দ্রোণাচার্য বয়ান ও একলব্য বয়ান যথাক্রমে Source Language ও Target language- এর পরিবর্তে ব্যবহৃত হবে।

কখনো কখনো একলব্য বয়ানের পরিবর্তে অনুবাদ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। একলব্য বয়ান, ও দ্রোণাচার্য বয়ান যথাক্রমে এ ব ও দ্রো ব হিসাবে প্রবন্ধে উল্লেখিত। নামটি নেওয়া হয়েছে দেবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের “তর্জমার তর্জনী বা একলব্যের বুড়ো আঙুল” প্রবন্ধ থেকে।

বা সংস্কৃতিকে তুলে ধরতে অনুবাদই ছিল একমাত্র মাধ্যম। অনেক সময় সেই পথে নানা বাঁধা আসে, এমনকি যথাযথ অনুবাদের অভাবে বিশ্বের কাছে নিজেদের সংস্কৃতিকে পৌঁছাতে বেশ বেগ হতে হয়েছে, অনেক লেখকের যথার্থ অনুবাদ বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দেওয়া যায়নি, বাংলা সাহিত্যে অগ্রণী সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তার ক্ষেত্রে এ বক্তব্য সত্য। এ প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন লেখকের জনপ্রিয় উপন্যাসের প্রথমপর্ব অর্থাৎ ‘পথের পাঁচালী’ উপন্যাসের অনুবাদ শুরু হয়েছে এইভাবে—

“Harior Roy was a Brahmin. He lived in a small brick-built house in the village of Nischindipur. It was the last house at the extreme northern end of the village. He was not well-to-do. All he had to live on was the meagre rent from a tiny plot of land he had inherited from his father and some fees paid to him by a few households he served as family priest.”^৩

গ্রন্থপাঠে মনে হয় উপনিবেশপর্বে পল্লী বাংলার যথার্থ চিত্রপট তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়েছেন অনুবাদক তাছাড়া সাংস্কৃতিক পরিসরের আরো যত্ন নেওয়া উচিত কেননা ‘family priest’ এই শব্দের ব্যাখ্যা দেওয়া আবশ্যিক। তাছাড়া বাংলা গদ্যের যে সুললিত লয় রয়েছে তা অনুবাদে অনুপস্থিত। যদিও অনুবাদ যে বার বার প্রতারণা করে সে সত্য আরেকবার পাঠক স্মরণ করে। অনুবাদ কর্মের মধ্যে বিভূতিভূষণকে খুঁজে পাওয়া বেশ দুষ্কর। সমকালীন নানা ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে একথা খাঁটে না তার প্রমাণ মেলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যের ইংরেজি অনুবাদ। তিনি অনুবাদের মধ্যদিয়ে বিদেশে পরিচিতি লাভ করেছিলেন। তাই তাঁর অনুবাদের আলোচনা করতে গেলে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব চিন্তাভাবনা যা তাঁর সাহিত্যের অনুবাদে প্রভাব বিস্তার করেছিল তা আমাদের স্মরণে রাখতে হবে।

২

১৯৯৮ বঙ্গবাদের ‘হিতবাদী’ পত্রিকাতে ‘পোস্টমাস্টার’ গল্পটি প্রকাশ পায়। শিলাইদহ পর্বে যে সকল গল্প প্রকাশ পায় এটি প্রথম দিকের প্রকাশ। গল্পের মধ্যে এক পোস্টমাস্টার যিনি শহর থেকে গ্রামে এসেছে চাকরি সূত্রে কিন্তু গ্রামের পরিবেশের সঙ্গে মানাতে না-পেরে ফিরে যাচ্ছে এবং তার আগমন-নিষ্ক্রমণের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ গৈঁথে দিয়েছেন একটি প্লট যা বৃহত্তর রাজনীতির অঙ্গ। নব্য উপনিবেশিত সমাজে কীভাবে উপনিবেশ অক্টোপাশের মতো জাল বিছিয়ে ধরেছে তারই একটি নমুনা পাঠকের সামনে হাজির করেছেন লেখক তবে প্রত্যক্ষত রাজনীতির অংশ হিসেবে এই চিত্রকে স্পর্শ করা যাবে না বরং সূক্ষ্ম সাংস্কৃতিক প্রতিবেশে খোলনলচের সুলুক-সন্ধান করতে পারলে গল্পের পরিধিকে বুঝতে সুবিধা হবে। আপাতভাবে পোস্টমাস্টার একটি বাস্তব চরিত্র, তাকে লেখক দেখেছেন, কথা বলেছেন এবং সেইরকম এক চরিত্রকে গল্পের মধ্যে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। লেখক বাস্তব জীবনে যে চিত্র দেখেছেন তার নমুনা দেওয়া যাক—

“এখানকার পোস্টমাস্টার এক একদিন সন্দের সময় এসে আমাদের এইরকম ডাকের চিঠি সম্বন্ধে নানান গল্প জড়ে দেয়। আমাদের কুঠির বাড়ির একতলাতেই পোস্ট অফিস –বেশ সুবিধা। চিঠি আসা মাত্রই পাওয়া যায়। পোস্টমাস্টারের গল্প শুনতে বেশ ভালো লাগে। বিস্তার অসম্ভব বেশ গম্ভীর ভালো বলে যায়।”^৪

এই পোস্টমাস্টারের সঙ্গে গল্পের পোস্টমাস্টারের কী সাদৃশ্য পাওয়া যায় না? আসলে যে চরিত্রের মধ্যে তিনি গল্পের নানা স্তরকে গ্রথিত করেছেন তার মধ্যে রয়েছে আধুনিকতা নামী ভাবনা, যা গল্পের নায়কের সঙ্গে বাস্তবের নায়ককে আলাদা করেছে এটা ঠিক এই স্তরভেদকে ধরতে গেলে উপনিবেশের রাজনীতিকে জানতে হয়। আমাদের গল্পের নায়ক কবিতা লেখে এবং আওড়ায়, মনের মধ্যে রোমান্টিকতার রেশ চলে কিন্তু আমাদের

মনে হয় এই নায়ক সদ্য আধুনিকতার ফসল কিন্তু সে গ্রামের বাস্তবতার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারে না তখনই তার মনে হয় এই গ্রাম বদ্ধ জলাশয় এখান থেকে মুক্তি পাওয়া জরুরি, গল্পের শুরুতে লেখক আমাদের তারই ঈঙ্গিত দিয়েছেন। গল্পের এইরকম সুর কীভাবে দেবেন্দ্রনাথ মিত্র ও উইলিয়াম রাদিচের অনুবাদের এসেছে তা আমাদের আলোচ্যকেন্দ্র। পোস্টমাস্টারে এই নিসঙ্গ জীবন যাপনের মধ্যে অবশ্যই কবিতা লেখার সুত্রপাত, যা এক ধরনের মানসিক তৃপ্তি, উলাপুর গ্রামে তার অখণ্ড অবসরের মধ্যে থাকে নিসঙ্গ জীবন যাপনের দৃশ্য। এই চিত্রকে আরো বেশি ভাবে প্রকট করবার জন্য অনুবাদক জানালেন—

“His Calcutta background made him a bad mixer – in an unfamiliar place he was either arrogant or ill at ease. So, there was not so much contact between him and the residents in the area.”^৫

রাদিচের এই অংশটির অনুবাদ অনেকটি বেশি কাব্যিক কিন্তু দেবেন্দ্র মিত্রের অনুবাদ অনেক বেশি আক্ষরিক আমাদের মনে হয় রাদিচের এই অনুবাদ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যের যথার্থ মূল্যায়ন করতে পেরেছিল। যদিও এই অনুবাদ ছাড়াও পূর্বজের অধীনে যে অনুবাদ হয়েছে তাকে মান্যতা দিতেই হবে। রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশাতেই দেবেন্দ্রনাথ মিত্র এই অনুবাদ করেছিলেন এবং ১৯১৮ সালে ‘মাসি এন্ড দ্য আদার স্টোরিজ’ গ্রন্থে স্থান পায়। তাই মনে হয় এই অনুবাদ রবীন্দ্রনাথ অনুমোদন দিয়েছিলেন, তবে গল্পের নায়কের যে নিসঙ্গতা তাকে এই বধ্যভূমি ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। অখণ্ড অবসরের হাত থেকে রেহাই মিলতে রতন নামে এক বালিকার শিক্ষাদানের প্রতি নজর দেয়। পিতৃ-মাতৃ হারা এই কন্যা তার বাড়িতে কাজ করত, রান্নার জোগাড় করে দিত কিন্তু বাক্যালাপের মধ্যে কোনো প্রকার তৃপ্তি পায় না পোস্টমাস্টার। দেবেন্দ্র মিত্রের অনুবাদ সম্পর্কে ‘The Manchester Guardian’ পত্রিকায় লেখা হয়েছিল--

“.....The postmaster, in which a lonely and neglected man leaves a girl alone and neglected are exquisitely and simply human.”^৬

আমাদের পোস্টমাস্টার lonely সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু neglected কেন? এই সমস্ত কিছুকে যথাযথ তুলে ধরতে রবীন্দ্রনাথ রচিত মূল টেকস্ট বা দ্রো ব-এর সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ মিত্রের এ.ব বয়ানের তৌলনিক পর্যালোচনা, অনুসঙ্গে রাদিচের পোস্টমাস্টার গল্পকেন্দ্রিক এ.ব নির্মাণকে সংযুক্ত করে আলোচনার পরিসরকে তুলে ধরা যেতে পারে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে নায়কের জীবনে আছে নিসঙ্গতা। এই নিসঙ্গতা গল্পের মধ্যে এসেছে মধ্যবিত্তের সামাজিক কারণে একদিকে নায়কের এই অহংবোধ তবে লেখক খুব বেশি সেদিকে খুব গুরুত্ব দিতে চাইছেন না বরং তিনি অনেক বেশি নজর দিয়েছেন চরিত্রের মধ্যে সামাজিক বিচ্ছিন্নতার দিক ঈঙ্গিত দিয়েছেন। আধুনিকতার মূল কেন্দ্রস্থল কলকাতা, সেখানের সঙ্গে অজ পাড়া উলাপুর অবশ্যই আলাদা। পোস্টমাস্টারের সঙ্গে রতনের সম্পর্কের মধ্যে রয়েছে কলকাতা বনাম উলাপুর অথবা শহর বনাম গ্রামের সম্পর্ক। তাদের দু’জনের কথোপকথনের মধ্যে কোথাও প্রভু-ভূত্যের প্রসঙ্গ বার বার আসে। তবে এই প্রসঙ্গে মনে হয় উপনিবেশের মডেলে গড়ে ওঠা একজন নাগরিকের এই ছাড়া কোনো উপায় ছিল না, এই গ্রামবাংলার মধ্যে পোস্টমাস্টার নিজের জীবনের নেমে আসে অকাল অবসাদ অন্যদিকে নিজের স্মৃতিপটে ভেসে আসে পিতা-মাতার স্মৃতি মন্তন অর্থাৎ কলকাতার আবেশ। উপনিবেশের পরিকল্পনায় গড়ে ওঠা আধুনিকতার প্রসারের সীমাবদ্ধতা দায়ী হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। প্রগতির সামূহিকতার প্রশ্নে কিছুটা গলদ ছিল তাই চাকরি জীবনে শহর ছাড়ার পরে সেই গলদ ধরা পড়ে, এবং এনলাইটমেন্ট দীক্ষিত যুবকের মধ্যে থাকে নিজেকে পৃথক করার

নানা ছক, তাই স্বেচ্ছায় গৃহবন্দি হওয়া ছাড়া কোনো উপায় থাকে না। এছাড়া অন্যের সঙ্গে কথোপকথনে থাকে এক স্বাভাবিক উপেক্ষা। এপ্রসঙ্গে ঐতিহাসিক মনে করেন—

“The colonial middle class in Calcutta no less than other centers of power, was simultaneously placed in position of subordination in area relation and a position dominance in another.”^১

কলকাতার মধ্যবিত্তের সমস্যার মূল কারণ এখানে লুকিয়ে রয়েছে এবং ক্ষমতার ভরকেন্দ্রে থাকার সুবাদে প্রতিটা মুহুর্তে নিজেদের প্রভু ভাবতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে এবং যে কারণে কলকাতার অভ্যাস অনুসারে তোলা জলে স্নান করা থেকে শুরু করে গুরু-গম্ভীর ভাবে চলা ফেরার মধ্যে রয়েছে মধ্যবিত্তের সামাজিক আদলের প্রতিচ্ছবি। গল্পের মধ্যে আমরা বার বার দেখেছি রতনকে সে নির্দেশ দিচ্ছে, কিন্তু গল্পের মধ্যে রতন কোথাও আদেশ অমান্য করেনি প্রতিটি উপদেশ বা আদেশ নির্দিধায় শুনেছে।

অনুবাদের মধ্যে থাকে নিজের সংস্কৃতিকে তুলে ধরা কিন্তু অধিকাংশ অনুবাদে তা অনুপস্থিত থাকে, ভারতীয় ভাষা সাহিত্যের ক্ষেত্রে অনুবাদ মূল ভাবনাকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে নানা রকম সমস্যা হওয়া স্বাভাবিক কেননা ভারতীয় ভাষা বলতে কোনো নির্দিষ্ট ভাষা হয় না, বিভিন্ন প্রদেশের ভাষার যেমন স্বতন্ত্র রূপ আমরা পাই তেমন তাদের নানা সংস্কৃতিকে আলাদাভাবে শনাক্ত করা সম্ভব তাই সংস্কৃতির কোনো একমাত্রিক বয়ান আমাদের সামনে নেই এবং সময়ের নিরিখে সেই সংস্কৃতির নানা বদলও ঘটেছে যা ভিন্ন সময়ের অনুবাদে ধরা বেশ মুশকিল। গল্পপাঠে আমরা জানতে পারি রতন নাম্নী বালিকা যখন সে পোস্টমাস্টারের সঙ্গে ব্যক্তিগত জীবনের কাহিনি বলে চলে তখন পোস্টমাস্টারের বাবা-মাকে নিজের বাবা মা বলে উল্লেখ করে এবং এক্ষেত্রে আমাদের মনে হয় অনাথা রতন চায় একটু স্থিতি, নিজের না-পাওয়া যন্ত্রণার কিছুটা লাঘব করা তাছাড়া আমাদের মনে হয় উপনিবেশপর্বে বা উনিশশতকে বাঙালি জীবনের যাপন-প্রণালীতে ছিল পরিচায়িকার সঙ্গে মধ্যবিত্ত জীবনের এইরকম সম্পর্ক। আমাদের উল্লিখিত অনুবাদের ক্ষেত্রে দুটি ভিন্ন রূপ আমরা পেতে পারি, এবার দেখে নেওয়া যাক—

- I. And so, it came about that girl would allude to his people as mother, brother and sister, as if she had known them all her life.
- II. Ratan referred to the postmaster’s family – his mother, sister and brother – as if they were her own.

দুটি অনুবাদ যুগোপযোগী তবে প্রথম অনুবাদক অর্থ্যাৎ দেবেন্দ্রনাথ মিত্রের অনুবাদ শুধুমাত্র আক্ষরিক করেননি একইসঙ্গে তিনি ভারতীয় তথা বঙ্গ সংস্কৃতির নানা স্তরকে উদ্ঘাটন করবার জন্য তিনি ফুটনোটের ব্যবহার করেছেন যা পাঠকের সঙ্গে একধরনের আলাপ বলা চলে, আপাতভাবে বঙ্গদেশীয় পাঠকের বুঝতে অসুবিধা না-হলেও বিদেশি পাঠকের পক্ষে বোঝা অসম্ভব হয়ে ওঠে তাই সংযুক্ত ফুটনোট সকল সমস্যার নিরশন করেছে বলে আমাদের মনে হয়—‘Family servants call the master and mistress father and mother and the children elder brother and sister.’— তাই বলা চলে এই সাংস্কৃতিক কোডকে চিহ্নিত করতে না-পারলে গল্পের মূল ভাবনা অধরা থাকবে। কেননা অধিকাংশ পাঠক দু’জনের সম্পর্কের বিন্যাসকে প্রেমের সম্পর্কে নিয়ে যাবে কিন্তু আমাদের মনে হয় এই ফুটনোট একধরনের সাবধান বাণী। অন্যদিকে রাদিচে মূলত অনুবাদ করেছেন আক্ষরিক সেখানে তিনি ফুটনোট দেননি তাই এক্ষেত্রে প্রথম অনুবাদটি বার্তা প্রদানের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য উপাদান। প্রথম অনুবাদটির ক্ষেত্রে বলা চলে গল্পের মধ্যে আরো বেশ কয়েকটি পর্ব রয়েছে যেখানে ফুটনোট ছাড়া কোনোপ্রকার ভাষ্য নির্মাণ করা বেশ কঠিন। যখন লেখক গ্রামের চিত্রপট ব্যবহার করছে—

“সন্ধ্যার সময় যখন গ্রামের গোয়ালঘর হইতে ধূম কুণ্ডলায়িত হইয়া উঠিত, বোপে বোপে বিল্লি ডাকিত, দূরে গ্রামে নেশাখোর বাউলের দল খোল-করতাল বাজাইয়া উচ্চঃস্বরে গান জুড়িয়া দিত....।”^৮

দেবেন্দ্রনাথ মিত্র এক ফুটনোট সহযোগে অনুবাদ করলেন-

“When in the evening the smoke began to curl up from the village cow-sheds and the cicalas chirped in every bush when faquirs of the baul sect song.”^৯

রবীন্দ্রনাথ যে চিত্র এঁকেছেন তার মধ্যে সাংস্কৃতিক চিহ্ন বর্তমান। এই চিহ্নকে এ.ব নির্মাণের মধ্যে প্রতিফলিত করতে হলে সন্তর্পণে অনুবাদককে করতে হয়। অনুবাদক যথাযথভাবে এই জায়গায় নিজের মুনসিয়ানা দেখিয়েছেন। অনুবাদক গোয়ালঘর থেকে ধোঁয়া বের হওয়ার কারণ হিসাবে একটি ফুটনোট ব্যবহার করেছেন (Smoky fires are lit in the cow-sheds to driven of mosquitoes), যা যথাযথ। প্রকৃতপ্রস্তাবে বিদেশি পাঠকের কাছে ‘গোয়ালঘর’ একটি অপরিচিত শব্দ তাই অনূদিত হলেও সেখানে ধোঁয়া কেন সন্ধ্যাকালীন কুণ্ডলীকৃত হয়ে বেরিয়ে আসত তা বোঝা অসম্ভব সেই সমস্যা দূর করবার জন্য এই নোট খুব জরুরি বলে মনে হয়। রাদিচে যদিও এইরকম কোনো পরিসর তাঁর অনুবাদে রাখেননি।

কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ মিত্র নেশাখোর বাউলের দলকে অনুবাদ করলেন The faquirs of the Baul, এটা কীভাবে সম্ভব? বাউল এবং ফকির দুটি শব্দ-চিহ্ন ভারতীয় ধর্মসাধনার সঙ্গে জড়িত। কিন্তু অনুবাদে দুটিকে একই গোত্রের মধ্যে আনা হয়েছে। এমনকি ‘নেশাখোর’ শব্দটি অনুবাদে হারিয়ে গেছে। একথা সর্বজনবিদিত দুই সম্প্রদায়ে ধর্মসাধনার মধ্যে গান যেমন যুক্ত, তেমনি তাদের যাপন প্রণালীতে নেশারও একটি স্থান রয়েছে। অনুবাদের মধ্যে যে সাংস্কৃতিক রাজনীতির যোগসূত্র রয়েছে তা এখানে প্রতীয়মান। অনুবাদে বাদ্যযন্ত্রেরও অনুবাদ হয়নি। অনুবাদক যেন নিজের পরিসরকে ছোটো করে এনেছেন, ক্রমশ বিদেশি পাঠকের কথা ভেবে যতটা বাঙালি সংস্কৃতিকে ছেঁতে দেওয়ার যায় সে চেষ্টা করেছেন এই অংশে। উদ্ধৃতাংশটি রাদিচে করেছেন-

“In the evening, when smoke curled up from the village cow- sheds, crickets grated in the bushes, a band of intoxicated Baul singers in the far village sang raucously to drums and cymbals, and even a poet if seated alone on the dark veranda might have shuddered a little at trembling leaves....”^{১০}

রাদিচের এ ব নির্মাণ কিছুটা সাযুজ্য রক্ষা করতে পেরেছেন। কিছুটা বলছি এই অর্থে তাঁর অনুবাদে ফকির শব্দটি নেই অথচ প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মসাধনার বাইরে বাউল/ফকিরদের অবদান উল্লেখযোগ্য। তাই অনুবাদককে দুটি শব্দ-চিহ্নকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হবে। এবং নেশাখোর বাউলের দলকে তিনি ‘a band of intoxicated Baul singers’ তা নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের যথাযথ অনুবাদ হিসেবে দেখা যেতে পারে।

তবে আমাদের মনে হয় অনুবাদের ক্ষেত্রে মূল অনুবাদ বা দ্রোব এর যথাযথ প্রতিফলনের ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট অনুবাদকে গুরুত্ব বা পাথেও করলে চলবে না বরং একাধিক অনুবাদ পাশাপাশি রেখে পড়া ভালো তাহলে গল্পের মূল সুর আত্মস্থ করা যাবে। রাদিচে অনুবাদের ক্ষেত্রে ফুটনোট দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন না এতে তিনি হয়তো মনে করেন তাহলে অনুবাদের মূল ভাবনা বিগ্নিত হবে কিন্তু অনেক সময় অনুবাদের ক্ষেত্রে যখন শব্দ সংযোজন করেছেন, অতিরিক্ত শব্দ প্রয়োগ করেছেন তখন দেখা গিয়েছে অনেক সময় অতিরঞ্জন বলে মনে হয়েছে এবং বাঙালি সংস্কৃতির প্রকাশের ক্ষেত্রে বেমানান বলে মনে হয়েছে, সেরকম দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যাক—

- I. ‘Ratan would then hastily light the fire, and toast some unleavened bread, which, with the cold remnants of the morning meal, was enough for their suffer.’
- II. ‘Ratan would quickly light the fire and cook some chapati; they made their supper out of that’.

দ্বিতীয় অনুবাদটি রাদিচের, এখানে রুটি বলতে ‘chapati’ বুঝিয়েছেন অথচ চাপাটির সঙ্গে বাঙালিয়ানার কোনো সম্পর্ক নেই, বরং প্রথমটি অনেক বেশি প্রাণ পেয়েছে। এই দৃশ্যপট হল বর্ষণ মুখর সন্ধ্যাতে গ্রামের নিস্তব্ধ পরিবেশে পোস্টমাস্টার রতনকে তার পরিবারের স্মৃতি মনে পড়ে কীনা জানতে চাইছিল, সেইসময় সেই বিষাদময় স্মৃতি আনতে যে দীর্ঘশ্বাস বা হতাশার সুর বেজেছে তা পাঠক হৃদয়কেও নাড়া দিয়েছে এবং দুজনের গল্পের মধ্যে সন্ধ্যা অতিবাহিত হয়ে পড়ে তখন এই অন্ধকার রাতে কোনোরকমে নিজেদের খাবার জোগাড় করতে গিয়ে রতন সকালে বেঁচে যাওয়া বাশি রুটি সৈঁকে নিয়েছে যা অনুবাদে হয়েছে- ‘toast some unleavened bread’ এই ভাবনার সঙ্গে বাঙালিয়ানা বা গ্রামবাংলার দৃশ্যপটের সাযুজ্য আছে কিন্তু চাপাটি মোটেও বাঙালি খাবার নয় ফলত এই দৃশ্যপটের সঙ্গে যায় না। আবার অনুবাদের দিকে লক্ষ করলে মনে হয় অনুবাদক কিছুটা যোগ করছেন যদিও সে অধিকার তাঁর রয়েছে কিন্তু সেখানে অনেক সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। এখানে তাড়াতাড়ি খাবার তৈরি করতে হবে কেননা তার দাদাবাবু খেয়ে নেবেন এবং পল্লীগ্রামে যখন ঝড় উঠবে বা বর্ষণের পর যা স্বাভাবিক ক্রম বলে মনে হয় তা প্রথম অনুবাদে হয়েছে কিন্তু দ্বিতীয় অনুবাদে সম্পূর্ণ উলটো পথে হেঁটেছেন। এখান বলা হল যে চুল্লি জ্বলে নতুন করে কয়েকটি চাপাটি তৈরি করল। এইরকম নমুনা আরো অনেক দেওয়া যায়—

এই নিতান্ত নিঃসঙ্গ প্রবাসে ঘনবর্ষায় রোগকাতর শরীরে একটুখানি সেবা পাইতে ইচ্ছা করে। তপ্ত ললাটের উপর শাঁখাপরা কোমল হস্তের স্পর্শ মনে পড়ে। এই ঘোর প্রবাসে রোগযন্ত্রনায় স্নেহময়ী নারীরূপে জননী ও দিদি পাশে বসিয়া আছেন, এই কথা মনে করিতে ইচ্ছা করে এবং এস্থলে প্রবাসীর মনের অভিলাষ ব্যর্থ হইল না।^{১১}

দেবেন্দ্রনাথ মিত্র এই অংশের অনুবাদ করলেন-

“In the loneliness of his exile, and in the gloom of the rains, his ailing body needed a little tender nursing. He longed to remember the touch on the forehead of soft hands with tinkling bracelets, to the presence of loving womanhood, the nearness of mother and sister.”^{১২}

‘তপ্ত ললাটের উপর শাঁখাপরা কোমল হস্তের স্পর্শ মনে পড়ে’ লাইনটির অনুবাদ যা হয়েছে তা পাঠক উপরোক্ত উদাহারণ থেকে বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না, কিন্তু ‘শাঁখাপরা কোমল হস্ত’ কে ‘soft hands with tinkling bracelet’ হিসেবে বর্ণনা করেছেন সে জায়গায় রদিচে ‘conch-shell bangles’ করেছেন, আমাদের মনে রদিচে অনেক বেশি আমাদের সংস্কৃতিকে ভুলে ধরেছেন কেননা ‘শাঁখাপরা হাত’ আমাদের সংস্কৃতির ধারক তাই সেই জায়গার যথার্থ অনুবাদ প্রয়োজন ছিল যা দেবেন্দ্রনাথ মিত্রের অনুবাদে অনুপস্থিত।

৩

গল্পের পরিণতির দিকে মনে হয় শহুরে নায়ক সে ফিরে গেছে নিজের স্থানে কিন্তু আমাদের মনে হয় তার কি এই উলাপুরের যাবতীয় কাহিনি মনে থাকবে? নিশ্চয়ই নয় সে বার্তা লেখক গল্পের মধ্যে দিয়েছে। নৌকা মধ্যে বার বার স্মৃতি মনে পড়লে কিন্তু গল্পের নায়ক মধ্যবিত্তের মনন নিয়ে নিজের মনে একটি দার্শনিক পরিসর তৈরি করে নেয়। মনে করেন জীবনের ব্যাপ্তিতে এই রকম ঘটনা আসলেও তা ভুলে যাওয়ার মধ্যে থাকে সামাজিক ও মানসিক স্থিতি। তাই তার মনে রতনকে মনে পড়ার দৃশ্য আসলেও সে বার বার ভুলে যাওয়ার

চেষ্টা করেছে। কিন্তু অনুবাদকের মধ্যে এই দৃশ্য তুলে ধরার ক্ষেত্রে অনেক সতর্ক থাকতে হয় কেননা গল্পের শেষে বার বার বলেছেন রতনের জীবনের পরিণতির কথা। পাঠক তার প্রতি একপ্রকার অনুকম্পা তৈরি করে, কিন্তু আবেগের প্রবল্য থেকে অনুবাদক নিজেকে নিভৃত স্থানে রাখতে চান অনেক সময় অনুবাদক বেশ কিছু জায়গা ছেড়ে দিয়ে অনুবাদ করেন। দুটি ভিন্ন ভাষার মধ্যে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান করে তখন দুটি ভাষার পারস্পরিক দায়বদ্ধতার প্রতিচ্ছবি ধরা পড়তে বাধ্য তার জন্য প্রধান ভাষা বা দ্রোবকে ছব্ব তুলে ধরতে হবে সে দায় অনুবাদকের নেই। এ প্রসঙ্গে ওয়ালটার বেঞ্জামিন জানান-

“Translation is ultimately serve the purpose of Expressing the Central reciprocal relationship between languages.”^{১৩}

কিন্তু এই central reciprocal relation-এর দিকে জোর দিলে অনেক সময় দ্রো ব-এর originality হারিয়ে যায়। আমাদের গল্পের ক্ষেত্রে সেই সত্য ফুটে উঠেছে।

ভ্রান্তি কিছুতেই ঘোচে না, যুক্তিশাস্ত্রের বিধান বহুবিলম্বে মাথায় প্রবেশ করে, প্রবল প্রমাণকেও অবিশ্বাস করিয়া মিথ্যা আশাকে দুই বাহুপাশে বাঁধিয়া.....তখন চেতনা হয় এবং দ্বিতীয় ভ্রান্তিপাশে পড়িবার জন্য চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে।^{১৪}

এই অংশটি অনুবাদ থেকে সম্পূর্ণ বাদ গেছে দেবেন্দ্রনাথ মিত্রের অনুবাদে, এক অল্পবয়স্কা সম্বন্ধে লেখক যা লিখেছেন তখন তো তার একটি নিজস্ব রাজনীতি রয়েছে। সেখানে মেয়েটির মননগত দিক পাঠক অনুভব করে। রতনের আবেগ, রতনের নিঃসঙ্গতা সবটাই এখানে পরিস্ফুট হয়েছে। অথচ দেবেন্দ্র মিত্র এই গুরুত্বপূর্ণ অংশের অনুবাদ করলেন না। শেষ পরিচ্ছেদে যেটুকু অনুবাদক অনুবাদ করলেন তা বিদেশি পাঠকের কথা ভেবে। তিনি এটুকু বুঝেছেন রতনের উপরোক্ত লাইন বর্ণিত এই ইমেজটির কোনো মূল্য নেই। তাই অনুবাদক জোর দিলেন এই পরিচ্ছেদের central idea-র দিকে।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. Heidegger, Martin. 1959. On the way to Language. New York. Harper and Raw. P-123.
২. দত্ত, সুবীন্দ্রনাথ। ২০১০, কাব্য সংগ্রহ। ভূমিকা। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং। পৃ-২৫৪।
৩. Clark, T.W. and Tarapada Mukherjee. 2015. Pather Panchali Songs of the Road. India: Twelfth impression, Harper's Collins, p-3.
৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। ছিন্নপত্র। ২১ সংখ্যক পত্র, বিশ্বভারতী, ১৩১৯, পৃ-৬০।
৫. Tagore, Rabindranath. 2011. Kabulliwalha Stories, William Radice, Delhi: Penguin. p-14.
৬. Kundu, Kalyan, Imagining Tagore: Rabindranath Tagore, Tagore Center, UK, p. 311.
৭. Chatterjee, Partha, The nation and its fragments, Oxford, 1999, p. 36.
৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্র রচনাবলী। সার্বশতবর্ষ সংস্করণ, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, পৃ-২৬।
৯. Tagore, Rabindranath. 2012. Mashi and Other Stories. Delhi: Second Impression, Rupa Pvt. Ltd., P-118.
১০. Tagore, Rabindranath. 2011. Kabulliwalha Stories, William Radice, Delhi: Penguin. p-14.
১১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্র রচনাবলী। সার্বশতবর্ষ সংস্করণ, দশম খণ্ড। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। ২৮।
১২. Tagore, Rabindranath. 2012. Mashi and Other Stories. Delhi: Second Impression, Rupa Pvt. Ltd. P-122.
১৩. Walter, Benjamin, collected work, vol-1, Harvard press-258
১৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্র রচনাবলী। সার্বশতবর্ষ সংস্করণ, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, পৃ-৩০।



লোকসংস্কৃতি এবং উপজাতি সমাজ: একটি জীবন দর্পণ

তমাল আদক, স্বাধীন গবেষক, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 06.01.2026; Accepted: 13.01.2026; Available online: 28.02.2026

©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

Abstract

Folk culture is a reflection of the folk people; all aspects of the customs, norms, reforms, beliefs, and life practices of folk society are integral parts of folk culture. The Indian subcontinent is a nation-state formed through a synthesis of art, culture, and diversity, where tribal society has emerged as an inseparable component. Generally, in the context of the Indian social system, folk culture carries forward a stream of tradition that includes the lifestyle of common people, their rituals and practices, religious and social beliefs, customs, arts, and entertainment, on the basis of which culture is formed.

On the other hand, the communities that have developed within the social system around distinct cultural identities, using religious beliefs as a unifying force, are identified as tribal societies. In this essay, I have attempted to present a brief discussion on folk culture and the tribal social system, analyzing various aspects of both folk culture and tribal society. This discussion is actively connected with issues such as the historical background of the emergence of folk society, the continuity of the tribal past, colonialism, Sanskritization, and socio-political factors.

In the twenty-first century, it is observed that the traditions of folk culture and the continuity of tribal society are, in many places, gradually fading, while the framework of global social structures and the influence of modernization are gaining prominence. It is humanity itself that must discover ways to break free from this Western shadow and its constraints. On the foundation of this humanistic cultural awakening, people will be able to revive their eternal life traditions and cherished cultural heritage, which will become a mirror of life for all humankind.

Keywords: Colonialism, Tribal Society, Global Society, Modernization, Sanskritization

লোককাহিনি বা লোকসংস্কৃতি বলতে সাধারণত সাধারণ মানুষের জীবনযাপন, চিন্তাভাবনা, বিশ্বাস ও সংস্কৃতিগত অনুভূতির স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশকে বোঝানো হয়। এটি মূলত মানুষের ঐতিহ্যবাহী বিশ্বাস, পৌরাণিক কাহিনি, লোককথা, গান, নৃত্য, প্রবাদ, আচার-অনুশীলন এবং সামাজিক রীতিনীতির সমন্বয়ে গঠিত। লোকসংস্কৃতি প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে মানুষের মুখে মুখে, বাক্যালাপের মধ্য দিয়ে এবং দৈনন্দিন জীবনের অভ্যাসে প্রবাহিত হয়ে এসেছে। লিখিত রূপের আগেই লোকসংস্কৃতি মানুষের সামাজিক স্মৃতির ভাণ্ডার হিসেবে কাজ করেছে।

লোকসংস্কৃতি একটি অঞ্চলের ভাষা, জীবনধারা ও সামাজিক বাস্তবতাকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরে। স্থানীয় আখ্যান ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে মানুষের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, সংগ্রাম ও বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটে। আদিম সমাজব্যবস্থায় লোকসংস্কৃতি ছিল সামাজিক ঐক্য ও সংহতির অন্যতম প্রধান বাহক। বিশেষত উপজাতি পর্ব-২, বিশেষ সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি, ২০২৬

সমাজের নারী-পুরুষেরা তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি, বিশ্বাস, ধর্মীয় আচরণ ও জীবনদর্শন লোককাহিনির মাধ্যমে প্রকাশ করত।

প্রাচীন ভারতবর্ষে লোকসংস্কৃতি ছিল গৌরবময় ঐতিহ্যের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এটি কেবল বিনোদনের মাধ্যম নয়, বরং সমাজকে শিক্ষিত করা, নৈতিকতা গঠন এবং সংস্কৃতিগত পরিচয় রক্ষার একটি শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবেও কাজ করেছে। লোকসংস্কৃতি তাই আজও আমাদের ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ের অমূল্য সম্পদ।

ঐতিহাসিক পটভূমি:

মানুষের বিশ্বাস, ধ্যানধারণা, দৃষ্টিভঙ্গি, মন-মানসিকতা এবং জীবনলক্ষ্যের চেতনার সমন্বয়ে যে সামগ্রিক জীবনবোধ গড়ে ওঠে, তারই প্রকাশকে বলা হয় সংস্কৃতি। সংস্কৃতি কেবল সাহিত্য, সংগীত বা শিল্পকলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাপন, আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, বিশ্বাস ও সামাজিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে তা বিস্তৃতভাবে প্রকাশ পায়। সংস্কৃতির বিকাশের ধারায় সমাজের আপামর জনসাধারণের মধ্যে যে সাংস্কৃতিক রূপ ও ঐতিহ্য গড়ে ওঠে, তাকেই সাধারণভাবে ‘লোকসংস্কৃতি’ বলা হয়।

ইংরেজি Folklore শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হলো ‘লোকসংস্কৃতি’। Folk এবং Lore—এই দুটি শব্দের সমন্বয়ে Folklore শব্দটি গঠিত। এখানে Folk অর্থ সাধারণ মানুষ, জনগোষ্ঠী বা জাতি এবং Lore অর্থ ঐতিহ্যগত জ্ঞান, শিক্ষা, উপদেশ, বিশ্বাস ও অভিজ্ঞতা। ১৮৪৬ সালে উইলিয়াম থমস প্রথম গ্রামীণ ও নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতিকে বোঝাতে Folklore শব্দটি ব্যবহার করেন। পরবর্তীকালে ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশে—বিশেষত ফিনল্যান্ড, সুইডেন, জার্মানি ও যুক্তরাষ্ট্রে—লোকসংস্কৃতি বিষয়ক আধুনিক গবেষণা বিস্তৃত হওয়ার ফলে এর বিষয়বস্তু আরও ব্যাপক ও বহুমাত্রিক রূপ লাভ করে।

অপরদিকে উপজাতি সমাজ বলতে এমন একটি সামাজিক গোষ্ঠীকে বোঝায়, যাদের নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি, রীতি-নীতি ও জীবনধারা রয়েছে। Tribe শব্দটি ল্যাটিন Tribus থেকে এসেছে, যার অর্থ বসবাসের স্থান বা গোষ্ঠী। উপজাতিরা সাধারণত নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলে বসবাস করে তাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে লালন করে থাকে। ভারতীয় উপমহাদেশে সিন্ধু সভ্যতার পর থেকে ইন্দো-আর্য, অস্ট্রো-এশিয়ান, তিব্বতী-বর্মণ, সাঁওতাল, মুন্ডা, গোল্ড প্রভৃতি উপজাতিগোষ্ঠী ভারতীয় সমাজে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করে। এই উপজাতি সমাজ তাদের শিল্প, সংগীত, নৃত্য, আচার-অনুষ্ঠান ও লোকবিশ্বাসের মাধ্যমে নিজস্ব সাংস্কৃতিক পরিচয় সংরক্ষণ করে আসছে। ফলে লোকসংস্কৃতি ও ঐতিহাসিক বৈচিত্র্যকে গভীরভাবে উপলব্ধি করার জন্য উপজাতি সমাজ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন একান্তভাবে প্রয়োজনীয়।

উপজাতি সমাজে লোকসংস্কৃতি:

পৃথিবীর বিভিন্ন সংস্কৃতির একটি বৃহৎ সমাহারের আবাসস্থল হল ভারত ভূখণ্ড। যার মধ্যে উপজাতীয় সমাজগুলি মানব সংগঠনের সবচেয়ে প্রাচীন রূপকগুলির প্রতিনিধিত্ব করে। ভারতের উপজাতি জনগোষ্ঠীকে বলতে বোঝায় যারা আলাদা রাষ্ট্র গঠন করতে পারেনি কিন্তু নিজস্বতা রক্ষা করে তারা একটি আলাদা সংস্কৃতি গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছে। ভারতের ইতিহাস সমাজে বিভিন্ন পরিবর্তনের সাক্ষী থেকেছে উপজাতের জনগোষ্ঠী। এই জনগোষ্ঠীগুলি বেশিরভাগই কৃষিকাজ বা পশুপালন সম্পর্কিত প্রাথমিক কার্যকলাপ জড়িত ছিল। যাদের মধ্যে কিছু শিকারী-সংগ্রাহক ছিল। এই উপজাতি সমাজের গোষ্ঠীগুলি জীবিকা নির্বাহের জন্য এক স্থানে থেকে অন্য স্থানে চলে যেতে। সময়ের কালক্রমে এই গোষ্ঠীগুলি যৌথ মালিকানা ভিত্তিতে সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল।

ভারতে উপজাতি সমাজ ত্রয়োদশ এবং চতুর্দশ শতাব্দীতে পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের আধিপত্য ছিল। আধুনিক ভারতে বিহার, ঝাড়খন্ড বেশ কয়েকটি অঞ্চলে উপজাতি জনগোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটেছিল। এছাড়াও মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, ছত্রিশগড়, পশ্চিমবঙ্গ, মধ্যপ্রদেশ, ত্রিপুরা, অন্ধ্রপ্রদেশের গোন্ডদের আবির্ভাব ছিল লক্ষণীয়। ভারতের উপজাতি সমাজের মধ্যে উল্লেখযোগ্য জনগোষ্ঠীগুলি হল মগ, মুরং, মারগা, চাকমা, বগ, তাম্বেংগা, সাঁওতাল, গারো ইত্যাদি।

ভারতের লোকসংস্কৃতির ধারা প্রাথমিক ক্ষেত্রে ব্রিটিশ প্রশাসনিক প্রধানরা স্থানীয় সংস্কৃতির চর্চার অধ্যয়ন শুরু করেছিল। দেশে পরাধীন আপামর জনগণকে শাসন করার লক্ষ্যে পরবর্তীতে মিশনারীরা ভারতে এসে মিশনারি শিক্ষার প্রবর্তনের সচেষ্ট হলেও তারা স্থানীয় ভাষা শিক্ষার জ্ঞান অর্জনের হয়েছিল বিশেষ তৎপরও। পরবর্তীতে ঔপনিবেশিক সময় পর্বে দেখা যায় মিশনারী এবং ব্রিটিশ প্রশাসকরা দেশের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও ভাষাগত জটিলতার প্রতি মুগ্ধ হয়েছিলেন নানা ক্ষেত্রে। স্থানীয় জনগণের জীবনধারা, আচার, অনুষ্ঠান মৌখিক, ঐতিহ্য, রীতিনীতি ইত্যাদি সম্পর্কে নানা ধরনের তথ্য লিপিবদ্ধ করতে আগ্রহী হয়েছিলেন পাশ্চাত্যবাদীরা। ভারতের উপজাতি গোষ্ঠীগুলির ওপর গবেষণা বহু ইংরেজি কবি সাহিত্যিকরা তাদের মৌলিক ঐতিহ্য বিশেষ করে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলে উপজাতিদের লোকসংস্কৃতি চর্চার উপর অধ্যয়নের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়পর্বে ভারত বহু সংখ্যক গবেষক তাদের পৌরাণিক কাহিনি, মহাকাব্য, কিংবদন্তি, শিল্পকলা ইত্যাদি অন্বেষণের মাধ্যমে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতিক গভীরতা নির্ণয় ব্রতী হয়েছিলেন। এভাবে স্বাধীন ভারতে লোককাহিনি অধ্যয়ন বৃদ্ধি পেতে শুরু করে যা উপজাতি সমাজ তার নিজস্ব রসে সমৃদ্ধ হয়ে নিজেদেরকে ঐক্যবোধে আবৃত করতে সক্ষম হয়। এইভাবে বর্তমান সময়ে বিভিন্ন কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে লোককাহিনি বিভাগ চালু করা হয়েছে।

উপজাতি ও লোকসংস্কৃতি:

ভারতীয় উপমহাদেশে উপজাতি সমাজের অস্তিত্ব সভ্যতার উষালগ্ন থেকেই লক্ষ করা যায়। আদিম মানবসমাজের বিকাশধারায় উপজাতি সম্প্রদায়গুলি প্রকৃতির সঙ্গে গভীর সম্পর্ক বজায় রেখে নিজেদের জীবনযাত্রা, বিশ্বাস ও সংস্কৃতি গড়ে তুলেছে। বর্তমান সময়ে ভারতে প্রায় ৭০৫টি স্বীকৃত উপজাতি সম্প্রদায় বসবাস করে, যাদের মোট জনসংখ্যা এক কোটিরও বেশি। ভারতের সংবিধানে এই উপজাতি সম্প্রদায়গুলির সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষার জন্য **পঞ্চম তফসিল (Schedule V)**-এর মাধ্যমে বিশেষ স্বীকৃতি ও সুরক্ষা প্রদান করা হয়েছে।

উপজাতি সমাজ মূলত গোষ্ঠীকেন্দ্রিক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ সমাজব্যবস্থা। এই সমাজগুলি নিজস্ব রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠান, ধর্মীয় বিশ্বাস, লোকাচার ও ঐতিহ্যের মাধ্যমে একটি স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক পরিচয় গড়ে তুলেছে। উপজাতি সমাজে ব্যক্তির চিন্তা, কর্ম ও জীবনবোধের মধ্য দিয়েই লোকসংস্কৃতির প্রকাশ ঘটে। তাদের দৈনন্দিন জীবনচর্চা, কৃষিকাজ, শিকার, উৎসব ও সামাজিক আচার লোকসংস্কৃতির ধারক ও বাহক হিসেবে কাজ করে। উপজাতি লোকসংস্কৃতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো তাদের নিজস্ব ভাষা ও শিল্পচর্চা। বিভিন্ন উপজাতির আলাদা আলাদা ভাষা, উপভাষা, লোকসংগীত, নৃত্য, চিত্রকলা, ভাস্কর্য ও হস্তশিল্প রয়েছে। এই সব শিল্পরূপ কেবল বিনোদনের মাধ্যম নয়, বরং তাদের ইতিহাস, জীবনসংগ্রাম ও সামাজিক মূল্যবোধের প্রতিফলন। লোকগান, নৃত্য ও চিত্রকলার মাধ্যমে তারা প্রকৃতি, দেবতা ও মানবজীবনের পারস্পরিক সম্পর্ককে তুলে ধরে। উপজাতি সমাজ প্রধানত পল্লী বা গ্রামীণ জীবনকেন্দ্রিক। বন, পাহাড়, নদী ও প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে তাদের জীবন ও সংস্কৃতি অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। ফলে প্রকৃতিনির্ভর জীবনযাত্রাই তাদের লোকসংস্কৃতির মূল ভিত্তি গঠন করেছে। এই সমাজে সংস্কৃতি মূলত সংহত ও সমষ্টিগত, যা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিরক্ষর মানুষের দ্বারা সৃষ্ট।

লিখিত সাহিত্য অপেক্ষা মৌখিক স্মৃতিনির্ভর লোককথা, গান, প্রবাদ, কিংবদন্তি ও আখ্যানের মাধ্যমে উপজাতি লোকসংস্কৃতি প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে প্রবাহিত হয়ে আসছে।

সব মিলিয়ে বলা যায়, উপজাতি সমাজ ভারতের লোকসংস্কৃতির এক অমূল্য ভাণ্ডার। আধুনিকতার চাপ সত্ত্বেও এই সমাজের লোকসংস্কৃতি আজও ভারতীয় সংস্কৃতিকে বৈচিত্র্যময় ও সমৃদ্ধ করে তুলেছে।

উপজাতি সমাজে লোকসংস্কৃতি বিকাশের পথে চ্যালেঞ্জসমূহ:

- সভ্যতার আদিকাল থেকেই ভারতের বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে নানা উপজাতি জনগোষ্ঠীর বসবাস লক্ষ্য করা যায়। এই উপজাতি সমাজ তাদের নিজস্ব জীবনধারা, বিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠান, লোকগাথা, লোকনৃত্য, লোকসংগীত ও শিল্পকলার মাধ্যমে একটি স্বতন্ত্র লোকসংস্কৃতি গড়ে তুলেছে। প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কই তাদের সংস্কৃতির মূল ভিত্তি। তবে একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে এই সমৃদ্ধ লোকসংস্কৃতি নানা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে।
- প্রথমত, **নিজস্বতার অভাব** উপজাতি সমাজে একটি গুরুতর সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অতীতে যে ঐক্যবোধ ও পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে লোকসংস্কৃতি প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে সঞ্চারিত হতো, আধুনিক জীবনের চাপে তা অনেকাংশে ভেঙে পড়েছে। এর ফলে লোকাচার ও ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা ব্যাহত হচ্ছে।
- দ্বিতীয়ত, **যথার্থ ও সচেতন শিক্ষার অভাব** লোকসংস্কৃতির বিকাশে অন্তরায় সৃষ্টি করছে। আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে সাংস্কৃতিক শিক্ষার সমন্বয় না হওয়ায় বহু উপজাতি তরুণ প্রজন্ম নিজেদের লোকসংস্কৃতির গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারছে না।
- তৃতীয়ত, **লিঙ্গ বৈষম্য** এখনও বহু উপজাতি সমাজে বিদ্যমান। নারী সমাজের যথাযথ অংশগ্রহণ ও স্বীকৃতি না থাকায় লোকসংস্কৃতির বিকাশ সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ছে।
- চতুর্থত, **অর্থনৈতিক দুরবস্থা** একটি প্রধান চ্যালেঞ্জ। দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী উপজাতি পরিবারগুলির পক্ষে জীবিকার সংগ্রামে সংস্কৃতিচর্চা গৌণ হয়ে যায়, ফলে লোকসংস্কৃতির অগ্রগতির পথ রুদ্ধ হয়।
- পরিশেষে, **বিশ্বায়ন ও আধুনিকতার প্রভাব** উপজাতি সমাজের উপর গভীর প্রভাব ফেলেছে। প্রযুক্তি, ভিনদেশি সংস্কৃতি ও ভোগবাদী মানসিকতার ফলে ঐতিহ্যবাহী লোকসংস্কৃতি ধীরে ধীরে গুরুত্ব হারাচ্ছে। তাই সরকারি উদ্যোগ, শিক্ষার প্রসার ও সামাজিক সচেতনতার মাধ্যমে উপজাতি লোকসংস্কৃতি সংরক্ষণ ও বিকাশ একান্ত প্রয়োজন।

উপজাতি সমাজকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি আলোচনার প্রয়োজনীয়তা:

সভ্যতার উষালগ্ন থেকে লোক কাহিনি মানব সমাজের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই লোককাহিনিগুলির মাধ্যমে সমাজের মূল্যবোধ, বিশ্বাস এবং ঐতিহ্যকে এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছায়। লোকসংস্কৃতির মধ্যে দিয়ে দেশের মানব বৃত্তান্তের পরিবর্তন আসে। দেশ ও দেশের ঐতিহ্যকে প্রসার সাধনে মানব সম্পর্ক উন্নতি ঘটানো সম্ভব। তবে যুগে পরিবর্তে আজ আমরা এক উদারনৈতিক বিশ্বায়ন নির্ভর যে সমাজ ব্যবস্থায় এসে উপস্থিত হয়েছি তাতে দেখা যাচ্ছে বৈদ্যশিক রুচিবোধ সাধারণ মানুষকে গ্রাস করছে। উপজাতি সমাজের লোককাহিনি কদর ও সৃষ্টির প্রেরণা হারিয়েছে। এখন গরুর গাড়ির চালক কিংবা মাঝির খেয়া ঘাটের গানে একাকীত্ব দূর করার প্রয়োজন হয় না। মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ যত আধুনিক যন্ত্র মানুষকে গানের খোরাক জোগাচ্ছে যেখানে থাকে না কোন সৃজনশীল মৌলিকত্বের ছাপ। ফলে লোক সাহিত্য ও লোকসংস্কৃতি সৃষ্টি মুখ পর্ব-২, বিশেষ সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি, ২০২৬

হয়ে উঠেছে স্তব্ধ। উপজাতি সমাজের আচার-আচরণ, খাদ্যাভাস, আসবারপত্র, গৃহ নির্মাণে সকল ক্ষেত্রে এখন গ্রামীণ সভ্যতার অনুকরণের কৃত্রিমতার ছাপ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সাধক বাউলের পরিবর্তে গায়ক বাউলেরা সমাজে স্বীকৃতি পাচ্ছে। সভা সেমিনার বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে গবেষণায় লোকসাহিত্যের ব্যবহার করে নানা জনের জীবন চর্চার ব্যবস্থা হলেও ভারতবর্ষের গ্রামীণ উপজাতি সমাজে লোকসংস্কৃতির জীবনযাত্রায় বিশেষ প্রভাব তাতে পরছে না।

সুতরাং যে বাঙালিকে হাজার বছরের লোক চিকিৎসা প্রভাবিত করেছে আনুষ্ঠানিক চিকিৎসার সাথে তা সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কারণ ভারতের লোককাহিনি একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর সংস্কৃতি এবং মূল্যবোধকে কেন্দ্র করে বিকাশ লাভ করে। যে বিশেষ ধর্মে লোককাহিনি উপজাতি সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করে তা হল মানবতার ধর্ম। যার মানবিক বার্তা মানুষকে যোগায় প্রেরণাদায় শক্তি ভাবতে শেখায় এবং নিবিড়তার সাথে বাঁচতে শেখায়। উপজাতি সমাজের লোকসংস্কৃতি ভারতের ক্ষুদ্র পরিসরে সীমাবদ্ধ নেই যা অতীতের পথ ধরে এসে সমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে এবং হয়ে উঠেছে একটি অপরের সাথে সংযোগ করার প্রধান মাধ্যম। তাই ভারতের ভূখণ্ডে উপজাতি সমাজগুলির লোক সংস্কৃতি আমাদের সকলের উজ্জীবিত করা উচিত যাতে ভারতের হারিয়ে যাওয়া লোকসংগীত, পল্লী সংস্কৃতি আঁকর সম্পদকে পুনর্জীবিত করে তুলতে পারি। এই দীর্ঘ বিচ্যুতি আমাদের সংস্কৃতিতে যে ক্ষত সৃষ্টি করেছে তা লোকসংস্কৃতি ভিত্তিক এক নবজাগরণ বিশ্ব মানবতাকে জাগিয়ে তুলতে পারবে বলে আমরা আশাবাদী। পাশাপাশি শিক্ষার নানা ক্ষেত্রে উপজাতি সমাজের জীবনধারা, ইতিহাস, লোকসমাজ, সংস্কৃতিগত উন্মেষের স্রোতকে বয়ে নিয়ে যেতে একজন শিশুকে শৈশবকাল থেকেই তার মধ্যে লোকসংস্কৃতির সঞ্চর ঘটতে হবে। তবে ভারতবর্ষে প্রকৃত সংস্কৃতি সংরক্ষণ সম্ভব।

মূল্যায়ন:

ভারতবর্ষ একটি মিশ্র সংস্কৃতিতে পরিপূর্ণ এক বিশাল জাতিরাষ্ট্র। যুগে যুগে নানা জাতি, গোষ্ঠী, ভাষা ও ধর্মের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে এই দেশের বহুমাত্রিক সাংস্কৃতিক পরিচয়। ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যচর্চার ব্যাপ্তি ও পরিধি অত্যন্ত বিস্তৃত এবং গভীর। এই ঐতিহ্যের অন্যতম প্রধান ধারক ও বাহক হলো লোকসংস্কৃতি। ভারতের প্রতিটি রাজ্য এবং অঞ্চলের নিজস্ব লোকচিত্র, লোকসংগীত ও লোকনৃত্য রয়েছে, যা একদিকে যেমন সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের মানুষের জীবনযাপন, বিশ্বাস ও আবেগকে প্রকাশ করে, তেমনি অন্যদিকে সেই রাজ্যকে অপর রাজ্য থেকে পৃথক করে একটি স্বতন্ত্র পরিচিতি গড়ে তোলে।

সমন্বয়, সহাবস্থান ও সৌন্দর্যের এক অভূতপূর্ব নিদর্শন হিসেবে ভারতের লোকসংস্কৃতি আজও আমাদের সামনে উদ্ভাসিত। এই লোকসংস্কৃতিই ভারতের মূল সাংস্কৃতিক ভিত্তি, যার ওপর দাঁড়িয়ে গড়ে উঠেছে সাহিত্য, শিল্প, জীবনবোধ ও জীবনচরণের মৌলিক সুর। গ্রামীণ সমাজ, উপজাতি সমাজ এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দৈনন্দিন জীবনচর্চার মধ্যেই এই সংস্কৃতির প্রকৃত প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়।

একবিংশ শতাব্দীতে বিশ্বায়ন, ভোগবাদ ও একরৈখিক আধুনিকতার প্রভাবে ভারতের ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক চর্চা নানা সংকটের মুখে পড়েছে। এমন কিছু শক্তি সক্রিয় হয়েছে, যারা মানুষের মন থেকে নিজস্ব সংস্কৃতির স্মৃতি মুছে দিতে চায়। এই পরিস্থিতিতে আমাদের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটানো অত্যন্ত জরুরি। নব্য প্রজন্মের মধ্যে লোকসংস্কৃতির গুরুত্ব ও সৌন্দর্য ছড়িয়ে দিতে হবে।

সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে উপজাতি সমাজসহ সমগ্র ভারতের লোকসংস্কৃতিকে সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারলেই লোকসংস্কৃতির বিকাশ ঘটবে। তখনই এই লোকসংস্কৃতি সমাজের বুকে হয়ে উঠবে এক জীবন্ত দর্পণ, যা আমাদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে একসূত্রে বেঁধে রাখবে।

সহায়ক গ্রন্থ:

1. Jeyaraj, V. (2005). *Museology Heritage Management*. Chennai: Director of Museums Government Museum.
2. Lain, J. (1988) *The Crafts Museum*. New Delhi, Museum, Vol XL (No 157), Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
3. *International Dictionary of Regional European Ethnology and Folklore*. Vol-1, 1960, p. 126.
4. *Devid E Hunter and Phillip Whiten: Encyclopaedia of Anthropology*. U.S.A., 1976, P. 173.
5. Chatterjee, T. (1408). *Introduction to folklore lessons* (pp. 43-44). Calcutta, India: Day's.
6. Bagchi, J. (1996). Europe and the question of modernity. *Social Scientist*, 24(7-8), 1-13. <https://www.jstor.org/stable/3517765>
7. Barry, P. (2009). *Beginning theory: An introduction to literary and cultural theory* (3rd ed.). Manchester University Press.
8. <https://www.gapbodhitaru.org>
9. <https://egyankosh.ac.in>

নির্দেশনা:

প্রবন্ধ পাঠানোর জন্য প্রথমে ওয়েবসাইটে (<https://uttarsuri.com/uttarsuri>) অথবা উপরে দেওয়া Submit your Article এ ক্লিক করলেও হবে) লেখক হিসেবে নিবন্ধন (Registration) করতে হবে। নিবন্ধন করার পর স্বয়ংক্রিয়ভাবে (Automatic) আপনি লেখা জমা দেওয়ার জন্য পোর্টালে প্রবেশ (Login) করতে পারবেন, প্রবেশ করার পর লেখকের নিজস্ব ড্যাশবোর্ডের বামদিকে Articles এ চাপ দিলে Add New আসবে, তাতে ক্লিক করে প্রবন্ধ জমা করতে হবে। প্রবন্ধ সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য আপনি ইমেইল/পাসওয়ার্ড দিয়ে প্রবেশ করলে পেয়ে যাবেন এবং উত্তরসূরি থেকেও স্বয়ংক্রিয়ভাবে ইমেইলে আপনাকে জানিয়ে দেওয়া হবে।

গবেষণাপত্র রচনায় অনুসৃতব্য পদ্ধতি:

১. শিরোনাম (Title): শিরোনাম যথাযথ এবং স্পষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়।
৩. সারসংক্ষেপ (Abstract): ইংরেজিতে ৩০০ শব্দের মধ্যে।
৪. সূচক শব্দ (Keywords): ন্যূনতম ৫টি।
৫. মূল আলোচনা: গবেষণাপত্রে ন্যূনতম ২৫০০ শব্দ থাকতে হবে। শব্দ সংখ্যা ২৫০০ এর কম হলে তা রিভিউ করা হবে না।
৬. তথ্যসূত্র (Reference): লেখকের পদবি, লেখকের নাম। গ্রন্থের নাম। প্রকাশনীর নাম, প্রকাশকাল, প্রকাশস্থান, পৃষ্ঠাঙ্ক।
৭. গ্রন্থ ও পত্রিকাপঞ্জি (Bibliography): পৃষ্ঠাঙ্ক ব্যতিরেকে উল্লেখিত পদ্ধতি।

গবেষণাপত্র প্রেরণের নিয়মাবলী:

১. প্রবন্ধ হতে হবে সুচিন্তিত, মৌলিক ও গবেষণামূলক। প্রবন্ধে Plagiarism-এর মত ঘটনা ঘটলে তার দায় সম্পূর্ণভাবে লেখকের। পত্রিকা কোনোভাবেই দায়ী থাকবে না। প্রবন্ধ AI ব্যবহার করে লেখা হলে ছাপানোর জন্য গ্রহণযোগ্য হবে না।
২. অত্র কীবোর্ডে, যে কোনো ফন্টে টাইপ করে লেখা পাঠাতে পারেন (জার্নালে বেনসেন ১৩ ফন্ট ব্যবহার করা হয়)। ইংরেজির ক্ষেত্রে Times New Roman 12 ফন্ট ব্যবহার করতে হবে।
৩. বাক্যে ব্যবহৃত যতিচিহ্নের (দাড়ি, কমা, সেমিকোলন, প্রশ্নচিহ্ন, বিস্ময়সূচক চিহ্ন ইত্যাদি) আগে কখনোই স্পেস দেওয়া যাবে না। পরে একটি স্পেস দিতে হবে।
৪. গল্প, কবিতা, উপন্যাস, গল্পগ্রন্থ, প্রবন্ধ গ্রন্থ ইত্যাদির নাম ‘Single Quote’ এর মধ্যে রাখতে হবে।
৫. গদ্য, পদ্য বা যে কোনো টেক্সটের উদ্ধৃতি “Double Quote” এর মধ্যে রাখতে হবে।
৬. উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে তথ্যসূত্র ও গ্রন্থপঞ্জি দেওয়া বাধ্যতামূলক।
৭. আকাদেমি বানান অভিধান (পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি) অনুসরণ করে ভালোভাবে প্রুফ দেখে লেখা পাঠাতে হবে। আকাদেমি বানান অভিধান এর বিকল্প হিসেবে ব্যবহারিক বাংলা বানান অভিধান, পবিত্র সরকার দ্রষ্টব্য।
৮. সম্পাদকগণ প্রয়োজনে সংশোধন বা সামান্য পরিবর্তন করতে পারেন, যদি তিনি তা প্রকাশনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় মনে করেন।

তথ্যসূত্র যে ভাবে লিখতে হবে:

বই এর ক্ষেত্রে:

১. সেলিম, মুস্তাফা। বাহান্ন তাসের পর। সোনিক অর্কেস্ট্রা, ১৯৭৮, ধর্মনগর, পৃ. ৩।
২. একই গ্রন্থ পর পর হলে লিখতে হবে, তদেব, পৃ. ৫।
৩. দে, তমালশেখর। সেলিম মুস্তাফার কবিতা-জগৎ: সাক্ষাৎকার এবং। নীহারিকা পাবলিশার্স, ২০২২, কথামুখ, পৃ. ৬।
৪. দাশ বিশ্বাস, পীযুষকান্তি, সম্পাদনা। ছবি, পাখি সব করে রব, সংখ্যা ১২৫, মার্চ ২০২৪, পৃ. ৮।

সাহিত্যপত্র:

১. দাস বিশ্বাস, পীযুষকান্তি, সম্পাদনা। পাখি সব করে রব, দশম বর্ষ, সংখ্যা ১২০, অক্টোবর ২০২৩, ধর্মনগর, উত্তর ত্রিপুরা।
 ৪. নাথ, ঋষিকেশ, সম্পাদনা। শব্দনীল, সংখ্যা ২৫, একুশে মার্চ ২০২৩, পয়েন্টস ইউনিট, ধর্মনগর, উত্তর ত্রিপুরা।
- পর্ব-২, বিশেষ সংখ্যা

পত্রিকা:

১. দাস বিশ্বাস, পীযুষকান্তি, সম্পাদনা। পাখি সব করে রব, দশম বর্ষ, সংখ্যা ১২০, অক্টোবর ২০২৩, ধর্মনগর, উত্তর ত্রিপুরা।

২. —, সম্পাদনা। পাখি সব করে রব, সংখ্যা ১১৪, এপ্রিল ২০২৩, ধর্মনগর, উত্তর ত্রিপুরা। (একই পত্রিকার ক্ষেত্রে)

ওয়েবসাইট:

ভট্টাচার্য, ড. তমালশেখর। “নির্বাচিত বাংলা ছোটগল্পে পশুপ্রেম।” আত্মদীপ, www.atmadeep.in/nirbachito-bangla-chotogolpe-poshuprem.html। প্রবেশের তারিখ: ১৮ জুন ২০২৫।

ফুটনোট:

১ ড. তমালশেখর ভট্টাচার্য, “নির্বাচিত বাংলা ছোটগল্পে পশুপ্রেম,” আত্মদীপ

www.atmadeep.in/nirbachito-bangla-chotogolpe-poshuprem.html, প্রবেশের তারিখ: ১৮ জুন ২০২৫।

২ মুস্তাফা সেলিম, বাহান্ন তাসের পর, সোনিক অর্কেস্ট্রা, ধর্মনগর, ১৯৭৮, পৃ. ৩।

Plagiarism:

Authors are urged to avoid plagiarism. Any detected instances of plagiarism will be the sole responsibility of the authors.

Review Process

- All the manuscript will be preliminary examined by the Editor-in-Chief and then forwarded to the Reviewers & other Editors of the Journal.
- The papers shall only be published after recommendation of the Reviewers & Associate Editors.
- Information regarding the selection or rejection of articles/papers will be only through Email.
- The journal shall publish the article/papers only after completion of the formalities mentioned in selection letter.
- The journal will also not take the responsibility of returning the rejected articles.

At every stage preceding publication, the editors of the journal shall have the right to make corrections (if needed) in articles/papers to suit the requirement of the journal.

N.B.: Papers will be accepted only when accompanied with abstract (to be written in English only). Submission of papers without abstract (in English) or mere submission of an abstract without the paper would lead to non-acceptance of the same.

Publication Ethics

Publication ethics are the principles and guidelines that govern the conduct of authors, reviewers, editors, and publishers in scholarly publishing. Ensuring ethical practices is crucial for maintaining the integrity and credibility of academic research. Here are some key aspects of publication ethics of our journal:

- **Authorship:** All authors should have made significant contributions to the research and agree to be listed as authors. Misrepresentation of authorship, such as ghost authorship or gift authorship, should be avoided.
- **Originality and Plagiarism:** Authors should ensure that their work is original and properly cited. Plagiarism, including self-plagiarism, is unethical and undermines the integrity of scholarly publishing.

- **Data Integrity:** Authors are responsible for the accuracy and integrity of their research data. Fabrication, falsification, and manipulation of data are serious ethical violations.
- **Conflict of Interest:** Authors should disclose any potential conflicts of interest that could influence their research or its interpretation. These may include financial interests, affiliations, or personal relationships that could bias the work.
- **Peer Review:** Peer review plays a critical role in ensuring the quality and validity of published research. Reviewers should conduct their evaluations objectively and provide constructive feedback.
- **Editorial Independence:** Editors should make decisions based on the merits of the research and without influence from commercial interests, personal biases, or other undue pressures.
- **Publication Ethics Policies:** Journals should have clear and accessible policies on publication ethics, including instructions for authors, ethical guidelines for reviewers and editors, and procedures for handling ethical issues or misconduct.
- **Responsibility of Publishers:** Publishers have a responsibility to support and enforce ethical standards in scholarly publishing. This includes providing resources for editors and reviewers, promoting transparency, and addressing allegations of misconduct.

Publication Charge

The authors should note that there is no submission fee; however, there is a reasonable publication fee for each accepted article to meet the cost of manuscript handling, typesetting, office cum admin expenses, web-hosting charges, up-loading charges, internet expenses, website update and maintenance, electronic archiving and other recurring expenses. The publication fee is obligatory for publication.

- **Indian Authors:** The publication fee for single author per accepted paper is Rs. 1200.00 and Rs. 1500.00 for multiple authors.
- **Foreign Authors:** The publication fee of the accepted paper is \$25 for single authored paper and \$30 for multiple authored papers
- **Print copy:** Print Copy of the issue can be supplied on payment of Rs. 800.00 per copy (including postal charge). Annual subscription for the print copy is Rs. 3000.00 per Volume (inclusive of postal charges within India) Single print copy can be supplied outside India on payment of 25\$ (inclusive international shipping charge) per copy.

TWO-DAY INTERNATIONAL SEMINAR

On

Horizons of Literary Creation: Dialogues on Theory and Practice

(সাহিত্য সৃষ্টির নানা দিগন্ত: তত্ত্ব ও প্রয়োগের বিরলাপ)

Organized by

Department of Bengali & Department of English

Samsi College, Kandaran, Malda, W.B., India

In Collaboration with

Uttarsuri, Shribhumi, Assam

8th & 9th April, 2025 (Blended Mode) 10 am

Venue: Raktakarabi Kaksha



Key-Note Address 1

Prof. Tapadhir Bhattacharya

Former Vice-Chancellor & Emeritus

Professor, Assam University



Prof. Dipak Kumar Roy

Vice-Chancellor

Kajang University



Prof. Pabitra Chattopadhyay

Vice-Chancellor

University of Gour Banga



Professor Rajat Kishore Dey

Department of Bengali, UGB



Prof. Sauren Bandyopadhyay

Associate Professor

West State University Barasat,
North 24 Parganas, W.B.



Key-Note Address 2

Prof. Amit Bhattacharya

HOD, Department of English, UGB



Prof. Rajib Mandal

Department of Bengali

Malda College



Riajul Karim Boxi

President, G. B. Samsi
College



Prof. Pinaki Roy

Department of English

Raiganj University



Dr. Samipendra Banerjee

Associate Professor

Department of English, GG College



Dr. Salil Kr Mukherjee

Chairman & Principal

Samsi College, Malda, W.B.

Converers

Tapas Kumar Barman

Dr. Sk Mdazzul Hossain

Organizing Secretary

Dr. Manoj Kumar Bhaje

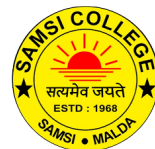


SAMSI COLLEGE

TWO-DAY INTERNATIONAL SEMINAR

On

Horizons of Literary Creation: Dialogues on Theory and Practice



সাহিত্য সৃষ্টির নানা দিগন্ত: তত্ত্ব ও প্রয়োগের দ্বিরালাপ

8 & 9 April, 2025

BLENDED MODE

Organized by:

DEPARTMENT OF BENGALI & ENGLISH

Samsi College, Samsi, Malda

In Collaboration with

UTTARSURI, SRIBHUMI, ASSAM

- **About Samsi College**

Samsi College, established on August 25, 1968, is the second-oldest higher education institution in Malda, West Bengal. Initially, classes began at Samsi Agril High School before relocating to its current site in Kandaran, a historically significant location. The college is recognized by the UGC under sections 2(f) and 12(B) of the UGC Act, 1956, and is affiliated with the University of Gour Banga. Accredited with a 'B' grade by NAAC in 2017, the college spans 13.69 acres in a peaceful, green environment. It has well-equipped facilities, including hostels, a playground, and a pond for pisciculture. Samsi College offers undergraduate **programs** in arts and commerce, with departments like Bengali, English, History, Sociology, Political Science, and Geography. The institution focuses on academic excellence, holistic student development, and fostering communal harmony. With over 8,000 students, it plays a crucial role in providing quality education to the region.

- **About Uttarsuri**

Uttarsuri is a registered society under the Societies Registration Act XXI of 1860 based in Sribhumi (Karimganj), Assam. Dedicated to eradicating illiteracy, Uttarsuri focuses on establishing pre-primary, adult education, and college courses. The society actively promotes socio-economic development in rural and urban areas by offering training programs for youth employment. Additionally, it organizes seminars, conferences, and public discussions to enhance educational awareness. Uttarsuri Publication, a branch of the society, is registered under the Ministry of MSME. Currently Uttarsuri published two journals namely Atmadeep & Novel Insights.

SUBTHEMES:

1. Various Trends in Poetry
কবিতার নানা প্রবণতা
2. Theoretical Perspectives on Poetic Forms and Techniques
কবিতার রীতি-পদ্ধতির তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট
3. Social Contexts of 20th-Century Bengali and English Literature
বিশ শতকের বাংলা ও ইংরেজি সাহিত্যের সামাজিক প্রেক্ষিত
4. Theoretical and Practical Importance of Political Ideologies
রাজনৈতিক মতাদর্শের তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক গুরুত্ব
5. Analytical Interpretations of Bengali/English Novels
বাংলা/ইংরেজি উপন্যাসের নিবিড় পাঠের প্রায়োগিক অভিব্যক্তি
6. Folk Culture & Oral Tradition
লোক সংস্কৃতি এবং মৌখিক পরম্পরা
7. Theatre and Performance Studies
থিয়েটার এবং কলা বিদ্যা
8. Sequential Evolution of Short Stories: A Critical Study
ছোটগল্পের ধারাবাহিক বিকাশের বিশ্লেষণী পাঠ
9. Comparative Studies on Contemporary Bengali/English Literature
তুলনামূলক সাহিত্য আলোচনার পটে সমকালীন বাংলা/ইংরেজি সাহিত্য
10. Socio-economic and Political Contexts in 20th-Century Drama
বিশ শতকের নাটকে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট
11. 20th-Century Political and Socio-economic Contexts in Indian Literature
সমকালীন সাহিত্যে সামাজিক নানা পট পরিবর্তনের ধারাভাষ্য
12. Narratives of Social Transformations in Indian Literature
বিশ শতকের রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিত ও ভারতীয় সাহিত্য

Participants may also present research papers on any relevant aspect of the sub-themes.

Papers can be presented in Bengali or English offline or online.

Selected papers will be published in peer-reviewed journals with ISSN and DOI:

Bengali articles in Atmadeep [<https://www.atmadeep.in>]

English articles in Novel Insights [<https://www.novelinsights.in>]

Special issues will be considered if the number of submissions exceeds the limit.

Key Deadlines:

- Submit abstracts by March 10, 2025 (in Bengali or English).
- Full papers must be submitted by March 31, 2025.
- Papers should be of at least 2,500 words.
- Proper citations are mandatory, and plagiarism is strictly prohibited.

Email: internationalseminarsc@gmail.com

Registration Fees (for paper presentation):

- Professors: ₹1,000 (offline), ₹800 (online)
- Researchers: ₹800 (offline), ₹500 (online)
- Students: ₹100

Offline participants presenting papers will receive a registration kit and a certificate. Online participants will receive certificates via email.

Registration fee may be paid through RTGS/NEFT/IMPS to:

Name: **Sudeb Sarkar**

UPI ID: 9064564093@axibank

UPI Number: 9064564093



ORGANIZING COMMITTEE:

CHIEF PATRON

Prof. Tapadhir Bhattacharya

Former Vice-Chancellor & Emeritus Professor, Assam University, Silchar, Assam

PATRON:

Mr. Riajul Karim Boxi

President, Governing Body, Samsi College

CHAIRPERSON:

Dr. Salil Kumar Mukherjee, Principal, Samsi College

CONVENORS:

Mr. Tapas Kumar Brman, HOD & Associate Professor, Dept. of English, Samsi College

Dr. SK. Mofazzal Hossain, HOD, TCS & Assistant Professor, Dept. of Bengali, Samsi College

ORGANISING SECRETARY:

Dr. Bishwajit Bhattacharjee

Associate. Professor, Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi, Assam

TREASURERS:

Dr. Md Anarul Islam, SACT, Dept. of Bengali

Mohidur Rahaman, SACT, Dept. of English

Ranjit Ghosh, Cashier

ORGANISING COMMITTEE:

Ranjit Sarkar & Dr. Kankan Datta, SACT, Dept. of Bengali

Sudeb Sarkar & Masiur Rahaman, SACT, Dept. of English

ADVISORY COMMITTEE:

Dr. M.K. Bhoje, Associate Professor, Dept. of Bengali
Dr. Medha Kumari, Assistant Professor, Dept. of Sanskrit
Kausik Biswas, Assistant Professor, Dept. of Economics
Dr. Waliullah, HOD & Assistant Professor, Dept. of Arabic
Dr. Sujit Majumdar, HOD & Assistant Professor, Dept. of Economics
Dr. Surajit Mandal, HOD & Assistant Professor, Dept. of Political Science
Nilima Sarkar, HOD & Assistant Professor, Dept. of Sanskrit
Mousumi Dutta, Assistant Professor, Dept. of History
Dr. Rameswar Mukherjee, HOD & Assistant Professor, Dept. of Geography
Neelanjana Chowdhury, Assistant Professor, Dept. of Philosophy
Goutam Kumar Das, Head Clerk
Jullur Rahaman, Clerk

Technical Committee:

Samadrita Das, Librarian, **Roquea Parvin**, **Mursedul Hassan & Sanjay Karmakar**, SACT

CONTACT DETAILS

Dr. SK. Mofazzal Hossain, Assistant Professor, Dept. of Bengali, Samsi College
Mobile No. +9196142 21481
Dr. Bishwajit Bhattacharjee, Associate Professor, Dept. of Bengali, Karimganj College,
Sribhumi, Assam, Mobile No. 9435750458
Sudeb Sarkar, Assistant Professor, Department of English, Samsi College



Two-Day International Seminar

On

Horizons of Literary Creation: Dialogues on Theory and Practice

Organized by

Dept. of Bengali & English, Samsi College and Uttarsuri, Assam

Date- 8th and 9th April, 2025



Programme Schedule

8th April, 2025

Venue- Raktakarabi Kaksha

- 10:00 AM: Registration
10:30 AM: Welcoming the Guests (Students)
10:35 AM: Lightening the Lamp by Prof. Pabitra Chattopadhyay, Vice-Chancellor, University of Gour Banga, Malda

10:40 AM to 11:15 AM: Welcome Address

- **Welcome Address:** Dr. Salil Kumar Mukherjee, Principal, Samsi College
- **Inaugural Speech:** Prof. Pabitra Chattopadhyay, Vice-Chancellor, University of Gour Banga
- **Speech:** Dr. Biswajit Das, Registrar (Additional Charge), University of Gour Banga
- **Address:** Mr. Riajul Karim Boxi, President of Governing Body
- **Address:** Dr. Bishwajit Bhattacharjee, Secretary, Uttarsuri, Shribhumi, Assam

11:15 AM – 12:15 AM: Keynote Address 1

Speaker: Prof. Tapadhir Bhattacharya, Former Vice-Chancellor & Emeritus Professor, Assam University

Tea-Break (5 Minutes)

12:20 AM to 2:20 PM: Special Plenary Session

Chair: Prof. Tapadhir Bhattacharya, Former Vice-Chancellor & Emeritus Professor, Assam University

Speakers:

- Prof. Dipak Kumar Roy, Vice-Chancellor, Raiganj University
- Prof. Rajat Kishore Dey, Professor of Bengali & Ex VC of University of Gour Banga
- Prof. Sadhan Kumar Saha, Dean of Arts, University of Gour Banga
- Prof. Rajib Mandal, Professor of Bengali, Jagannath University, Dhaka, Bangladesh
- Dr. Samipendra Banerjee, Associate Professor of English, University of Gour Banga

Vote of Thanks by Sudeb Sarkar, Department of English, SMC

Lunch Break (2:20 PM to 3:15 PM)

3:15 PM to 4:30 PM: Technical Sessions 1A, 1B, 1C & 1D (Parallel Sessions)

Session 1A: Raktakarabi Kaksha

- **Chair:** Prof. Sadhan Kumar Saha, Dean of Arts, University of Gour Banga
- **Assistant:** Dr. Anarul Islam, Department of Bengali, SMC

Sl. No.	Name of Presenters	Title of the Paper
1	Dr. Soumitra Mukhopadhyay Assistant Professor of Bengali Harishchandrapur College	মৌখিক পরম্পরা ও আদিবাসী লোকসংস্কৃতির আলোকে মহাশ্বেতা দেবীর উপন্যাস
2	RASARAJ ROY Assistant Professor of Bengali Chanchal College	বিশ শতকের বাংলা নাটকে বিবর্তন
3	Shanti Das Research Scholar of Bengali Raiganj University	বানী বসুর ছোট গল্পঃ মধ্যবিত্তের জীবন আলোচনা
4	Roquea Parvin Department of Bengali Samsi College	সাহিত্যে নারীমুক্তি ভাবনাঃ রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন
5	Dr. Kankan Dutta Department of Bengali Samsi College	হেঁড়াতার: শাস্ত্রের অন্তরালে ভিন্নভাষ্য
6	Aparajita Bhattacharjee Research Scholar of Bengali Assam University	রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে প্রতিবাদী নারী: এক বিশ্লেষণী পাঠ

Session 1B: Room No. 24

- **Chair:** Dr. Samipendra Banerjee, Associate Professor of English, University of Gour Banga
- **Assistant:** Masiur Rahaman, Department of English, SMC

Sl. No.	Name of Presenters	Title of the Paper
1	Neelanjana Chowdhury Assistant Professor of Philosophy Samsi College	From Literature to Philosophy: Exploring Sartre and the Path of Existentialism
2	Shrirupa Das Student of English University of Gour Banga	Beyond the Boundaries: Decoding the Representation of Femininity in The Final Solution and Meghe Dhaka Tara
3	Mondira Mondal Student of English Literature	Social Transformation in Mahesh Dattani's Dance Like a Man

	Malda College, UGB	
4	Prasenjit Sarkar Student of English University of Gour Banga	The Spirit of the Land: Folktales of Northeast India and their Ecological Wisdom
5	Asit Saren Student of English University of Gour Banga	Echoes of tradition and heritage: The ritualistic music and dance in Santal culture and festivals
6	Karimun Nisha UG Student of English Samsi College	Gender Equality and Sustainable Society through the Eyes of Kamala Das: A Critical Analysis of An Autobiography

Session 1C: Room No. 17

- **Chair:** **Dr. Amar Kumar Paul**, Assistant Professor of Bengali, Patuliputra University, Bihar
- **Assistant:** **Sanjoy Karmakar**, Department of Philosophy, SMC

Sl. No.	Name of Presenters	Title of the Paper
1	Parshuram Rajak Assistant Teacher Ashwintola Primary School	‘অশ্বযোনি’: নারীর জীবন সংগ্রামের উপাখ্যান
2	Nilima Sarkar Assistant Professor of Sanskrit Samsi College	সংস্কৃত নাট্যসাহিত্য: একটি সমীক্ষা
3	Ranjit Sarkar Department of Bengali Samsi College	নির্বাচিত সমকালীন সাহিত্যে সামাজিক নানা পট পরিবর্তনের ধারাভাষ্য
4	Apurba Roy Research Scholar of Bengali Kazi Najrul University	বিনতা রায়চৌধুরী-র গল্পে সামাজিক সংকট ও তার উত্তরণ
5	Sonali Gupta UG Student of English Samsi College	Present Day Educational System: An Overview

Session 1D: Library Room (Online)

- **Chair:** **Dr. Manoj Kumar Bhoje**, Coordinator of IQAC, Samsi College
- **Rapporteur:** **Sudeb Sarkar**, Department of English, SMC

Sl. No.	Name of Presenters	Title of the Paper
1	Dr. Jagannath Barua Associate Professor of Pali National University, Bangladesh	‘বৌদ্ধদের লোকসংস্কৃতি ও মৌখিক পরম্পরাঃ চট্টগ্রাম অঞ্চলের উপর একটি সমীক্ষা

2	REPON SAHA Research Scholar of Bengali Kalyani University	মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের কবিতাঃ কল্পনার এক নতুন মাত্রা
3	Monoranjan Urao Research Scholar of Bengali Kalyani University	তরাপদ রায়ের কবিতাঃ স্বতন্ত্র স্বর
4	Dr. Syed Hadiuzzaman Associate Professor of Islamic History and Culture National University, Bangladesh	যশোরের লোকসংস্কৃতি ও প্রবাদ-প্রবচন : একটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ
5	Tamal Adak Independent Researcher of Political Science Kalyani University	লোকসংস্কৃতি এবং উপজাতি সমাজঃ একটি জীবন দর্পণ
6	Dr. Munshi Mahammad Saiful Ahamed Assistant Professor of Bengali Gauhati University	ফ্যাসিবাদ বিরোধীতা ও অরুণ মিত্রের একটি শক্তিশালী কবিতা
7	Ashit Mandal Research Scholar of Bengali RKDF UNIVERSITY,RANCHI	বাংলা লোকসাহিত্যের ছড়া চর্চা
8	MOUMITA HALDAR Research Scholar of Bengali Kalyani University	সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়ের সাহিত্যকৃতিতে আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার অনুধ্যানঃ আলোচ্য সোনাডাঙ্গার বিল
9	Atowar Hossain Researcher Assam University	হামির উদ্দিন মিদ্যার ছোটগল্পঃ প্রান্তিকতার এক নব দলিল

End of the Day 1

Day 2

9th April, 2025

Venue- Raktakarabi Kaksha

10:30 AM: Welcoming the Guests (Students)

Welcome Address by:

- **Welcome Address:** Sri Tapas Kumar Barman, HoD of English, SMC, Convenor, Seminar Committee
- **Address:** Dr. Salil Kumar Mukherjee, Principal, SMC, after formal inauguration of the seminar

11:00 AM – 12:00 PM: Keynote Address 2

- **Chair:** Prof. Tapadhir Bhattacharya, Former Vice-Chancellor & Emeritus Professor, Assam University
- **Speaker:** Prof. Amit Bhattacharya, Professor & Head, Department of English, University of Gour Banga

Tea-Break (5 Minutes)

12:05 PM to 1:35 PM: Special Plenary Session

Chair: Prof. Amit Bhattacharya, Head, Department of English, UGB

Speakers:

- Professor Sauren Bandyopadhyay, Vice Chancellor, West Bengal State University
- Professor Pinaki Roy, Department of English, Raiganj University
- Professor Achinta Kumar Banerjee, Department of Bengali, University of Gour Banga
- Dr. Md Abdul Wahab, Principal, Dewan Abdul Gani College
- Dr. Amar Kumar Paul, Assistant Professor of Bengali, Patuliputra University, Bihar

Vote of Thanks by

Dr. Sk Mofazzal Haossain, TCS, HoD of Bengali, Convenor of the Seminar Committee

1:35 PM to 2:35 PM: Technical Session 1A, 1B, & 1C (Parallel Sessions)

Session 1A: Raktakarabi Kaksha

- **Chair:** Prof. Pinaki Roy, Professor, Department of English, University of Raiganj
- **Assistant:** Samadrita Das, Librarian, Samsi College

Sl. No.	Name of Presenters	Title of the Paper
1	Dr. Shiba Prasad Behera Faculty of Sanskrit Samsi College	Social Transformation in Sanskrit Literature

2	Bratati Misra Retd. Associate Professor of English Malda College	In Search of Rabindranath and Victoria Ocampo
3	Mirajul Islam State Aided College Teacher Department of English Chanchal College, UGB	War on Peace: Understanding Israel-Palestine Conflict through Rashid Khalidi's "The Hundred Years War on Palestine"
4	Mini Khatun Student of English Literature University of Gour Banga	Subaltern Voices; Sashi Deshpande's The Dark Holds No Terror and That Long Silence as Representations of women Labour and Economic Empowerment
5	Masiur Rahaman Department of English Samsi College	Negotiating Muslim Women's Identity in Postcolonial India: A Sociocultural Investigation of Anees Salim's Works
6	Madhumita Mandal UG Student of English Samsi College	Environment and Literature: A Critical Review of Henry David Thoreau's Walden (1854)

Session 1B: Room No: 17

Chair: Sri Sabuj Sarkar, Assistant Professor, Department of English, University of Gour Banga

Assistant: Winee John Tamang, Assistant Professor of Pol. Sc. Samsi College

Sl. No.	Name of Presenters	Title of the Paper
1	Ankita Sarkar PhD Research Scholar of English Raiganj University	Urban Modernism and the Search for Meaning: Fragmentation and Existential Crisis in T.S. Eliot's The Waste Land and Buddhadeb Basu's Raat Bhore Brishti
2	Sathi Mandal PhD Scholar of English Raiganj University	An Ecocritical Analysis of Hudum Deo: Indigenous Environmental Ethics and Ritualistic Agrarian Practices
3	Labani Sarkar Research Scholar of English Raiganj University	Decolonizing the Mind and Indianization of English: A Critical analysis of the selected novels of Shashi Deshpande, Arundhati Roy and Amitav Ghosh
4	Tamanna Rahman UG Student of English Samsi College	Importance of English Language
5	Mohidur Rahman Department of English Samsi College	Gender Dynamics in the Select Novels of Kamala Markandaya
6	Dr. Sujit Majumdar Assistant Professor of Economics Samsi College	Understanding Socio-Economic and Cultural Transition of Rural-Urban Migration in West Bengal: An Empirical Study

Session 1C: Room No: 24 (Online)

- **Chair:** **Tapas Kumar Barman**, Department of English, Samsi College
- **Rapporteur:** **Sudeb Sarkar**, Department of English, Samsi College

Sl. No.	Name of Presenters	Title of the Paper
1	Md Masihur Rahman Assistant Professor of English Sukanta Mahavidyalaya Dhupguri, Jalpaiguri	Quest for a new Identity in Rohinton Mistry's A Fine Balance
2	Dr. Suchitra Das Associate Professor of Economics Karimganj College, Sribhumi Dr. Ritumani Haloi, Assistant Professor of Economics Karimganj College, Sribhumi Mr. Gadapani Sarma Assistant Professor of Economics Karimganj College, Sribhumi Ms. Hema Hazarika Assistant Professor of Economics, Karimganj College, Sribhumi	A Study on Economic Significance of Moving Theatre of Assam
3	Rabi Kanta Roy Assistant Professor of English Kabi Nazrul College	Trauma of Partition in Mulk Raj Anand's Story "The Parrot in the Cage"
4	Dr. Masoom Islam Research Scholar of English L N Mithila University	Robin S Ngangom's Poetry: Repletion (Reflection) of Personal and Political Elements with Probing into the Problems of North-East India
5	Ilius Mondal Research Scholar of English and Modern European Languages University of Allahabad	'Pathogenic Vulnerability' and 'Slow Violence': A Study of Resistance in Indra Sinha's Animal's People
6	Myvizhi. A. Doctoral Scholar of English, Sri G. V. G Visalakshi College for Women Dr. K. Sathyapriya Assistant Professor of English Sri G. V. G Visalakshi College for Women	The Living Page: Biophilia and the Written World
7	NITYANANDA KODALIA Assistant Professor of Philosophy KABI NAZRUL COLLEGE	A CALL FROM LAST LEAF: ECOLOGICAL CONCERNS
8	Shonmirin P. A Research Scholar of English Vels Inst. of Science, Technology, and Advn. Std.	The Fabric of Culture: Significance of Material Culture in Tangkhul Folklore

Lunch Break (2:35 PM to 3:20PM)

3:20 PM to 4:30 PM: Technical Session 1A & 1B (Parallel Sessions)

Session 1A: Room No. 24 (Online)

- **Chair:** Prof. Achinta Kumar Banerjee, Department of Bengali, UGB
- **Rapporteur:** Dr. Surajit Mandal, Assistant Professor of Pol. Sc. Samsi College

Sl. No.	Name of Presenters	Title of the Paper
1	Dr. Surjyasen Deb Assistant Professor of Bengali Radhamadhab College	লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার 'বুঢ়ী আইর সাধু': তুলনামূলক পদ্ধতির আলোয়
2	Dr. Supendra Nath Roy Assistant Professor of Bengali Rabindrasadan Girls' College	সুচিত্রা ভট্টাচার্যের উপন্যাস : বিশ শতকের শেষার্ধের সময়-সমাজের আলোয়
3	Baby Parvin Student of Bengali University of North Bengal	মহানদী: প্রবাহমান উপাখ্যান
4	Abu Asim Research Scholar of Modern Indian Language Aligarh Muslim University	অপরাধ ও অপরাধী মনস্তত্ত্বঃ প্রসঙ্গ সায়াস্তনী পুতুভুভের গোয়েন্দা উপন্যাস 'সর্বনাশিনী'
5	Pricila Sultana PhD Researcher of Folklore Rajshahi University, Bangladesh	রবীন্দ্র নৃত্যনাট্য, প্রেম বনাম ন্যায়ঃ একটি পর্যবেক্ষণ
6	Sukanya Bera Research Scholar of Bengali Burdwan University	শিশু সাহিত্যিক বিমল ঘোষের নির্বাচিত ছোট গল্পঃ বিশ শতকের বাংলা শিশুসাহিত্যে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের রূপরেখা
7	Dr. Abhijit Bandopadhyay Assistant Professor of Bengali Women's College, Calcutta	বিশ শতকের বাংলা ছোট গল্পে যথাস্থিতবাদী বাস্তবতার প্রসার
8	Dr. Md. Sadekul Islam Assistant Professor of Bengali Manikchak College	চরিত্রের যাপন-দর্শন ও ক্ষেত্র-জরীপঃ প্রসঙ্গ আঞ্চলিক উপন্যাস
9	NIPON DAS Assistant Professor of Bengali ANANDARAM DHEKIAL PHOOKAN COLLEGE	অসমের বাংলা গল্পে অসমবাসী বাঙালিসত্তার আত্মপরিচয়ঃ একটি বিশ্লেষণী পাঠ (দেবব্রত চৌধুরীর 'আক্সাজানের হাড়- একটি প্রামাণ্য দলিল' ও জ্যোতির্ময় সেনগুপ্তের 'শিকড়ের নথিপত্র'-র- বিশেষ উল্লেখসহ)
10	Suman Ghosh Research Scholar of Bengali Ram Krishna Dharmarth Foundation University, Ranchi, Jharkhand	বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাট্যে আধুনিক জীবনবোধ ও পুরাণচেতনা

Session 1B: Library Room (Online)

- **Chair:** Dr. Md Abdul Wahab, Principal, Dewan Abdul Gani College, Harirampur
- **Rapporteur:** Dr. Indrajit Biswas, Assistant Professor of History, SMC

Sl. No.	Name of Presenters	Title of the Paper
1	DAVID DAS Assistant Professor of English KABI NAZRUL COLLEGE	Exploring chain communities' folk culture and oral tradition
2	RAVINDRA REDDY M. Department of Linguistics Osmania University	PANCHATANTRA & CHANDAMAMA STORIES: NARRATIVES ACROSS TIME, SPACE, AND CULTURES
3	Shampa Chakrabarty Research Scholar of English Adamas University	Exploring Cultural Heritage of the Marginalized Communities of Malda District through Gambhira, Gajan and Charak Festivals
4	Antik Kumar Das Research Scholar of Sociology Adamas University	The Role of Folk Religion in Shaping Sports Practices at Malda District: A Sociological Enquiry
5	Aman Pal Researcher of English Kalyani University	The Hypothetical Categorization of Women in the Early Twentieth Century English Literature: The Socio-Political Issues of Gender, Identity and the Institution of Marriage
6	Brinda Samanta Assistant Professor of English St.Xavier's College Burdwan	Delineation of women in Bengali Household: A brief foray into Sailabala Ghosh Jaya's Janma Aparadhi
7	Arkanil Das Assistant Professor of English Malda Women's College	Bengal's long invisibilisation of caste-based oppression: A study of Dalit Literature in Bengali

Valedictory Session: 4:30 PM

Vote of Thanks

-----END-----



ABOUT UTTARSURI

Uttarsuri is a registered society under the Societies Registration Act XXI of 1860, bearing registration number RS/KARIM/258/L/09 OF 2022-23 dated 30.04.2022, located in Sribhumi, Assam, India. The society is also registered with NGO Darpan, bearing the unique ID VO/NGO AS/2022/0314757. Uttarsuri Publication is a branch of the registered society Uttarsuri. It is registered with the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises under registration number UDYAM-AS-18-0012611.